স্বপনবুড়ো রচনাবলী

স্বপনবুড়ো রচনাবলী

(২য় খণ্ড)

স্বপনবুড়ো রচনাবলী

২য় খণ্ড

সম্পাদনা

অসিতাভ দাশ

পরিবেশনায়
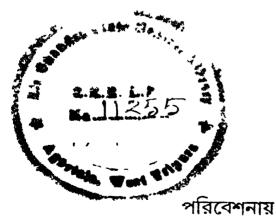
প্রিয়া বুক হাউস

৬০, রাই মোহন ব্যানার্জী রোড,

কোলকাতা - ৭০০ ১০৮
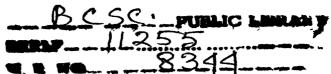
প্রকাশক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া • নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর • উঃ ২৪ পরগণা

প্রচ্ছদ :
কুমারঅজিত

লেজার টাইপ সেটিং
ঝর্ণা প্রিন্টার্স
১৬, বিন্দাবন মল্লিক ফাস্ট লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

ISBN-81-86964-12-16

ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১এ, গড়পার রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯
দূরভাষ-৩৫৪-৫১৪৮

মূল্য : আশি টাকা

ভূমিকা

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বপনবুড়ো রচনাবলী ২য় খণ্ড প্রকাশিত হল। বাংলা সাহিত্যে যে কয়জন সাহিত্যিক সারা জীবন শিশু সাহিত্যের সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে স্বপনবুড়ো অন্যতম শিশুদের মধ্যে তিনি অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। শিশুদের মনস্তত্ব বুঝতেন বলেই নির্দ্দিষ্ট কোন কিছুর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন শাখার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেছিলেন। সব্যসাচীর মতই উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, গান শিশুদেরজন্য রচনা করেছিলেন। তাঁর সেই অমূল্য ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করেই প্রকাশ করা হচ্ছে রচনাবলী। প্রত্যাশামতোই স্বপনবুড়ো রচনাবলীর ১ম খণ্ড শিশু, কিশোর, যুবক-যুবতী, বয়স্ক-বয়স্কা সকলস্তরের মানুষের কাজেই সমাদৃত হয়েছে। শুধুমাত্র শিশু-কিশোরদের জন্য নিজেকে সাহিত্য সাধনায় যিনি ব্যাপৃত রেখেছিলেন তিনি যে সকলের মনে জেগে থাকবেন সেটাই স্বাভাবিক। তবুও প্রকৃত শিশুসাহিত্যের যখন আকাল চলেছে তখন আবার নূতন করে শিশুদের মনের মতই স্বচ্ছ, নির্মল ও সুন্দর শিশুসাহিত্যের প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে প্রকৃত দায়িত্ব পালন করে চলেছেন প্রভা প্রকাশনীর কর্ণধার অসীমকুমার মণ্ডল। 'বাবুইবাসা বোর্ডিং' উপন্যাসটির প্রথম অংশটি এই খণ্ড স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অংশটি আগামী খণ্ডে স্থান পাবে। আশা করি, যাঁদের কিশোর বয়সে স্বপনবুড়োর লেখাগুলি পড়ার সুযোগ হয়েছিল, তাঁরা আবার নূতন করে সেই লেখাগুলোর পড়ার স্বাদ পাবেন, আর যারা এই প্রজন্মের কিশোর-কিশোরী তারা সন্ধান পাবে অমূল্য মণি-মুক্তার। অনেকের কাজে এই লেখাগুলোর সন্ধান থাকলেও হয়তো বা অধরা ছিল। যে সমস্ত গ্রন্থাগার বা ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে স্বপনবুড়োর লেখাগুলি সংগ্রহ করেছি তাঁদের আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেখা শেষ করতে চাই না, কেননা পরবর্তী খণ্ডগুলোর জন্য তাঁদের কাছে আরো অনেকবার সাহায্য প্রার্থী হতে হবে। যতক্ষণ না এই কাজ শেষ হচ্ছে আমাদের সকলের ও প্রকাশকের কারোরই অবকাশ নেবার সময় নেই।

অসিতাভ দাশ
প্রেসিডেন্সী কলেজ,
কলিকাতা

সুচীপত্র

বাবুইবাসা বোডিং

(কিশোর উপন্যাস)

ইস্কুল বিল্ডিংটা একেবারে নদীর পারেই।

তাই যে কেউ নতুন ছাত্র এসে বোর্ডিং-এ ভর্তি হোক না কেন, সনাতনবাবুর ছিল সনাতন প্রশ্ন—'বেডিং-বাক্স নিয়ে ত বোর্ডিং-এ এসে উঠলে, কিন্তু সাঁতার জানো ত'? এ বোর্ডিং-এ থাকতে হলে ঠিক হাঁসের মতো সাঁতার জানা চাই।'

যে ছেলে সাঁতার জানে, সে বুক উঁচিয়ে জবাব দেয়—'জানি স্যার। সেবার আমাদের জেলার সন্তরণ-প্রতিযোগিতায়—'

—'ব্যস্, ব্যস্ ! আর বলতে হবে না।' .... মাঝপথেই ছেলেটিকে থামিয়ে দেন সনাতনবাবু, —'আমি শুধু জানতে চাই সাঁতারটা জানা আছে কিনা ! তারপর নদীর সঙ্গে মিতালি পাতালে আর সব কিছুই ধীরে ধীরে। ভাবনার কিছু নেই।'

আপন মনে গড়গড়াটা টানতে থাকেন সনাতনবাবু।

সনাতনবাবুর বয়েস কত কেউ ভালো করে বলতে পারে না। বছরের পর বছর চলে যায়—এই সনাতনবাবু আদি অকৃত্রিম চিরকেলে সনাতন। তার বয়েস বাড়ে কি কমে কেউ বুঝতে পারে না। সনাতনবাবু এই বোর্ডিং-এর সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট। ছেলেরা আড়ালে নতুন নামকরণ করেছে—'সুপারী-লণ্ঠন'। কেউ যদি তার মানে জানতে চায়— যে কেউ একজন এগিয়ে এসে হাত উঁচিয়ে বলে—'এই সোজা মানেটা বুঝতে পারলে না? সুপারীর মতোই তিনি শক্ত। আর অন্ধকারে লণ্ঠনের আলো ফেলে, সকলের দোষ-ত্রুটি এক মুহূর্তে বের করে দিতে পারেন। এই ত' আমাদের সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট—তার মানেই 'সুপারি-লণ্ঠন'!'

সনাতনবাবুর বয়েস ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কিসের জোরে—এ নিয়েও ছেলেদের মধ্যে গবেষণার অন্ত নেই।

শিক্‌কাবাব বলে—'অতি সোজা কথা। তোমরা রোজ রুই মাছ খাও। কিন্তু সেই রুই মাছের মুড়ো থাকে —সে হদিস রাখো কি কেউ?'

ট্যামটেমী ফোড়ন কাটলে—'বোর্ডিং-এর ছেলেদের মুড়ো খাবার নিয়ম নেই। কেন না, তাই নিয়ে কলহ শুরু হতে পারে।'

শিক্‌কাবাব বললে—'অতি ঠিক কথা। কিন্তু মাছের ত' মুড়ো থাকে। সেগুলো তারা জলে জমা রেখে আসে না। সেই মুড়ো আর মুড়োর ভেতরকার ঘিলু যদি প্রত্যহ পেটে যায়, তবে বয়েস বাড়বার সুযোগ পায় কি?'

শিক্‌কাবাবের সুন্দর ব্যাখ্যায় খুশী হয়ে সবাই এক বাক্যে চিৎকার করে ওঠে—'সাবাস! সাবাস!!'

বোর্ডিংটির নাম কিন্তু এখনো বলা হয় নি।

বোর্ডাররাই ওর একটি সুন্দর নামকরণ করেছে—

"বাবুইবাসা বোর্ডিং!"

সামনে অজস্র ঝাউগাছে বাবুইপাখী বাসা বেঁধেছে। আর বাবুইবাসা বলা হয়েছে এই জন্য যে ছেলেরা এ-বছর আসছে, ও-বছর চলে যাচ্ছে—কেউ এখানে স্থায়ী বাসিন্দা নয়। তাই অনেক ভেবে-চিন্তেই এই নাম দেওয়া হয়েছে। আর আনন্দের কথা—সকলেই খুশীমনে এই নামটি মেনে নিয়েছে।

বোর্ডিং-এর সামনেই এক ঝাঁক ঝাউগাছ। তার কোল ঘেঁষে লম্বা রাস্তা নদীর পাশ দিয়ে চলে গেছে একেবারে দিগন্তের দিকে। এই রাস্তার পরেই নদী। সন্ধ্যের পরে ছেলেদের জটলা বসে এখানে ওখানে, ঘাসের গালিচার ওপর কিংবা একেবারে নদীর কোল ঘেঁষে—যেখানে ছলাৎ-ছল করে নদীর জল কেবলই পারের ওপর মাথা খুঁড়ে মরছে।

পল্লী অঞ্চল, কিন্তু এই নদীই ওদের প্রাণবন্যা। বোর্ডারদের বিলাস হচ্ছে দুই বেলা এই নদীর জলে সাঁতার কাটা।

অনেকে রটিয়ে বেড়ায় এই নদীতে মাঝে মাঝে কুমীর আসে। কিন্তু দস্যিছেলের দল সে-কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না; বলে—'অমনিতেই আমদের গায়ে হলুদ মাখা আছে। কুমীর আমাদের কি করবে?'

শিক্‌কাবাব হাসতে হাসতে টিপ্পনী কাটে—'একবার আমার হাতের আওতায় আসুক না! একেবারে শিক্‌কাবাব করে ছেড়ে দেবো।'

নদীতে বাঁধা থাকে ছোট ছোট কতকগুলো ডিঙি আর বাচের নৌকো। তাই নিয়ে বিকেলবেলা একদল ছেলে নদীর ওপর পাড়ি জমায়। সেই সঙ্গে কণ্ঠে তাদের গান জেগে উঠে—

"আমি ভয় করবো না—
দু'বেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না!
তরীখানি বাইতে গেলে—
মাঝে মাঝে তুফান মেলে—
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে—কান্নাকাটি করবো না।"

আকাশে তখন অস্তগামী সূর্যের সোনালী আভায় এখানে-ওখানে-ছিটানো মেঘদল নানা রঙের পোশাক পরে যেন ছেলেদের সেই গানের আসরে যোগ দিতে ধেয়ে আসে। নীড়ের পানে ফেরা পাখীর দলও যেন খানিকক্ষণ নীল আকাশে থমকে থাকে—এই জলসার সুরে সুর মেলাতে। সবার রঙে রঙ মিশিয়ে রঙীন আকাশ যে মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করে, তারই ছায়া যেন টল্‌টলে নদীর জলে স্নান করতে নেমে আসে। ওপারের নারকেল গাছগুলো মাথা দুলিয়ে তাল দিতে থাকে। আরো কিছুক্ষণ বাদে যখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসে, তখন কোনো দূরের পল্লী থেকে মঙ্গল-শঙ্খের শব্দ শোনা যায়। কোনো কোনো কুটিরে জ্বলে ওঠে মাটির প্রদীপ।

ছেলের দল এই সময়ে নৌকোর মুখ বোর্ডিং-এর দিকে ঘুরিয়ে নেয়। ওদের গলায় তখন নতুন গান জেগে ওঠে—

"ওরে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে—
দিনের শেষের শেষ খেয়ায় !"

এই নৌকো ভ্রমণ যেদিন বাদ পড়ে যায় সেদিন সন্ধ্যেবেলা বোর্ডিং-এর ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে ওরা পড়তে বসে বটে, কিন্তু পড়াশোনায় কারো মন লাগে না, সবাই উসখুস করতে থাকে।

বোর্ডিং-এর সুপারিনটেণ্ডেন্ট সনাতনবাবু তাই ঢালাও আদেশ দিয়েছেন—বিকেলের দিকে নৌকো করে বেড়ানো খুব ভালো। এতে শরীর আর মন দুই-ই আনন্দে থাকে। তাই পড়াশোনাতেও মন বসে।

* * *

সেদিন একটি নতুন ছেলে এসে হাজির হল, এই বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসে। একটি অচেনা ছেলে ভর্তি হতে এলে বোর্ডারদের মধ্যে পুলকের প্রবাহ বয়ে যায়।

নয়া খোরাক কিছু মিলবে, তাই উৎসাহের আধিক্যে তারা বোকা-বোকা নতুন মানুষটিকে একেবারে সুপারী-লণ্ঠন সনাতনবাবুর কামরায় এনে হাজির করলে।

সনাতনবাবু সন্ধ্যেবেলা টেবিলের ওপর ল্যাম্পটি জ্বালিয়ে সেই দিনের কাগজটি খুলে নানা জাতীয় সংবাদ সংগ্রহে তৎপর ছিলেন, এমন সময় ছেলের দল গিয়ে সেখানে হাজির হল।

নিকেলের চশমাটা কপালের ওপর তুলে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'কি নাম ?'

মাথা চুলকে, মুখ কাঁচুমাচু করে নতুন ছেলেটি জবাব দিলে—'আমার নাম গঙ্গারাম।'

ছেলেরা সবাই নাম শুনে হো-হো করে হেসে উঠলো। সনাতনবাবুও কাগজ পড়ায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় মনে মনে চটে গিয়েছিলেন। তাই ভুরু কুঁচকে মন্তব্য করলেন—'একেবারে ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো যে এসে হাজির হলে, তা সাঁতার জানো ত' ?'

গঙ্গারাম এবার সত্যি হক্‌চকিয়ে গেল। বোর্ডিং-এ ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করবে, তার সঙ্গে সাঁতারের কি সম্পর্ক ?

আসল কারণটা না বুঝলেও ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিলে নতুন ছেলেটি—'আজ্ঞে না, সাঁতার ত' জানি নে—'

চোখের সামনে যেন একটা বড় বেলুন ফেটে গেল ! সনাতনবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—হুঁ, সাঁতার জানো না ! আমাকে একেবারে কৃতার্থ করেছ আর কি। তবে বেছে বেছে এই বোর্ডিং-এ নাম লেখাতে এসেছ কেন ?'

খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে রইলেন সনাতনবাবু। তারপর চিৎকার করে উঠলেন—'শিক্‌কাবাব—'

—'আজ্ঞে ?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো শিক্‌কাবাবের শান-দেওয়া গলা থেকে।

—'কালকেই নদীতে নিয়ে ওকে সাঁতার শিখিয়ে দেবে।'

শিক্‌কাবাব ত তাই চায়। উত্তর দিলে—'আচ্ছা স্যার, কালকেই ভ্যাবা গঙ্গারামকে সাঁতার শিখিয়ে দেবো।'

গম্ভীর গলায় নতুন ছেলেটি উত্তর দিলে—'আমার নাম ভ্যাবা গঙ্গারাম নয়, শুধু গঙ্গারাম গায়েন।'

সনাতনবাবু আবার ফোঁস্ করে উঠলেন—'ওই হল—ওই হল। আগে সাঁতারটা শিখে নাও। তখন 'ভ্যাবাকে' বাতিল করে দিলেই হবে।'

সনাতনবাবু আবার খবরের কাগজটা চোখের ওপর তুলে ধরলেন। নিকেলের চশমাটাও আপনা থেকেই কপালের ওপরটা ছেড়ে চোখের ওপর নেমে এলো।

সবাই যে যার ঘরে এলো। সে-রাতে কিন্তু গঙ্গারামের চোখে আর ঘুম নেই।

এত বিপদেও মানুষে পড়ে ! শিখতে এসেছে লেখাপড়া—তা বলে কিনা নদীতে গিয়ে সাঁতার কাটতে হবে ! মানুষটা পাগল নাকি ?

ওর দূর-সম্পর্কের পিসেমশাই ত' তাকে বোর্ডিং-এ পৌঁছে দিয়েই চলে গেছে। পাশের গাঁয়ে নাকি কোন আত্মীয়-বাড়ি আছে। সেইখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালবেলা দেশে ফিরে যাবেন। এদিকে গঙ্গারামের যে গলাজল, সে খবর আর কে রাখছে ?

সারারাত ধরে গঙ্গারাম গোলমেলে সব স্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠতে লাগল !

একবার দেখলে নদীর জল সব উথাল-পাথাল করছে, আর একটা হাঙর এসে তার ডান পা-টা কামড়ে ধরেছে। তাকিয়ে দেখলে হাঙরের মুখটা ঠিক বোর্ডিং-এর সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট সনাতনবাবুর মুখের মতো !

আচম্‌কা ঘুমটা ভেঙে যেতে গঙ্গারাম বিছানার ওপর উঠে বসলো। দেখলো, ঘামে তার গা একেবারে ভিজে যাচ্ছে ! গেঞ্জিটা খুলে ফেলে দিয়ে ক্রমাগত হাতপাখাটা চালাতে লাগল।

খানিকক্ষণ বাদেই সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

আর একবার সে স্বপ্ন দেখলে, এক ঝাঁক কৈ মাছ তাকে তাড়া করেছে। এই কৈ মাছগুলো একেবারে মানুষের মতো লম্বা হয়ে গেছে।

গঙ্গারাম যত হাত-পা ছুঁড়ে পালাতে যাচ্ছে ততই সে জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে জল ঢুকছে—তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে কৈ মাছগুলো আরো অনেকটা এগিয়ে আসছে, প্রায় তাকে ধরে ফেলেছে ! আরো অবাক কাণ্ড , কৈ মাছের মুখগুলো এই বোর্ডিং-এর ছেলেদের মুখের মতো।

গঙ্গারামের হাত-পা আর কিছুতেই চলছে না। এইবার সে সত্যি ডুবে যাবে অগাধ জলে—

এমন সময় আর এক বিপত্তি !

ঝাউগাছের ডালে যে বাবুইপাখীর বাসাগুলো এতক্ষণ হাওয়ায় দুলছিল, এইবার সেগুলো বোমা হয়ে শাঁ করে তার দিকে ছুটে আসতে লাগলো।

আতঙ্কে গঙ্গারাম দুই চোখ বন্ধ করে ফেললো ! কিন্তু বোমার শব্দ আরো জোরালো হয়ে উঠলো।

মনে হল, তার পিঠের ওপর এসে বোমাগুলো সব ফেটে যাচ্ছে ! আর বাঁচবার কোনো আশা নেই।

গঙ্গরাম প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোলো না।

হঠাৎ একটা কৈ মাছের কাঁটার ধাক্কা খেয়ে সে অনেক দূর ছিট্‌কে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখলে, সে তক্তপোষ থেকে নীচে পড়ে গেছে। প্রাণপণে নিজের বালিশটা শুধু আঁকড়ে ধরেছে।

ভাগ্যিস্ তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হয় নি। নইলে গোটা বোর্ডিং-এর ছেলেরা এসে সেখানে জুটতো। লজ্জা ঢাকবার আর ঠাঁই থাকতো না।

* * *

শিক্‌কাবাব কিন্তু তার দায়িত্ব ভোলে নি। সকাল সকাল তেল মেখে, কোমরে গামছা জড়িয়ে একেবারে গঙ্গারামের ঘরে এসে হাজির।

গঙ্গারাম তখন মন দিয়ে অঙ্ক কষছে।

শিক্‌কাবাব বললে—'অঙ্ক এখন রাখো। সনাতনবাবুর হুকুম মনে নেই ? আজ তোমায় সাঁতার শেখাতে হবে।'

গঙ্গারাম অত্যন্ত বিরক্তভাবে শিক্‌কাবাবের মুখের দিকে তাকালো।

রাত্তিরের সেই এলোমেলো স্বপ্নগুলো তখনো তার মগজে কিলবিল করছে।

সেই কৈ মাছের কাঁটা নিয়ে তেড়ে আসা।

গঙ্গারাম কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। আস্তে আস্তে বললে—'আজ আমার শরীরটা ভালো নেই। আজ থাক্—'

কিন্তু শিক্‌কাবাব শোনবার পাত্রই নয়। হ্যাঁচ্‌কা টানে ওকে বিছানা থেকে তুলে নিলে। উত্তর দিল—'সে সব আপিল পরে করবে। সুপারী-লণ্ঠনের কড়া হুকুম, সাঁতার তোমায় শেখাতেই হবে। তারপর যদি শরীর খারাপ হয়, তবে আমাদের বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর স্বাস্থ্যের জন্য রয়েছে ডাক্তারবাবু। দু'টো পিল খেলে গায়ের ব্যথা আর থাকবে না !'

গঙ্গারাম মনে মনে বললে—
"পড়েছি শয়তানের হাতে,
চলে যেতে হবে সাথে।"

গামছাটা কাঁধের ওপর ফেলবারও ফুরসৎ দিতে চায় না শিক্‌কাবাব। হাত ধরে টানতে টানতে ওকে নিয়ে হাজির করলে নদীর ধারে।

গঙ্গারামের মনে হল—রাশি রাশি কাঁটাওয়ালা মাছ লুকিয়ে আছে নদীর জলের তলায় ; আমাদের তাড়া করতে কতক্ষণ ? আর তা ছাড়া ঝক্‌ঝকে দাঁতওয়ালা হাঙর আছে। যে হাঙরের মুখটা ঠিক সুপারী-লণ্ঠনবাবুর মুখের মতো।

রাত্তিরের সেই বিভীষিকাময় স্বপ্ন আবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

শিক্‌কাবাবের হ্যাঁচ্‌কা টানে গঙ্গারাম একেবারে নদীর ঘাটে এসে হাজির হল।

হাজির ত হল। কিন্তু জলে নামতেই রাজ্যের ভয় ওর মগজে এসে বাসা বাঁধলে।

শিক্‌কাবাব আড়চোখে ওর কাণ্ড-কারখানা দেখছিল ; এইবার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে আবৃত্তি করলে—

"জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার—
হাঁটিতে শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড় !"

তারপর মুখ টিপে টিপে সে হাসতে লাগল।

কবিতাটা কি গঙ্গারাম জানে না ? না কি, সে ভালোভাবে আবৃত্তি করতে পারে না ? সবই গঙ্গারামের জানা আছে। কিন্তু সে ভাবছে, মানুষ বেমক্কা এমন বেরসিক হয় কেন ? এই সুন্দর সকালবেলা, নদীর ধাব........ঝিরঝির করে দিব্যি হাওয়া বইছে। কেউ হয়ত এসে এই নদীর ধারে বসে সুন্দর গান ধরলে, শুনতে কি মধুরই না লাগবে ? তা নয়, কি না বলে—ওই নদীর জলে নেমে সাঁতার কাটতে হবে ! নদীর তলায় কি আছে কে জানে ? হাঙর থাকতে পারে, কুমীর থাকতে পারে, আরো কত কাঁটাওয়ালা মাছ থাকতে পারে ! হুট করে নামো বললেই কি নামা যায় ? তার

চাইতে নদীর ধারে বসে নানারকম মজার মজার দৃশ্য দেখ, কত আরামের! ওই ত' সুন্দর একটি ডিঙি নৌকো হেলতে-দুলতে এই দিকেই আসছে। নদীর ঢেউয়ের মাথায় চেপে ছোট্ট ডিঙি-নৌকোটাও মাথা দোলাচ্ছে। ছইয়ের ভেতর থেকে একটি রাঙা টুকটুকে মুখের ছোট্ট দু'টি হরিণ-চোখ নদীর দু'ধার দেখে নিচ্ছে। নিশ্চয়ই বিয়ের কনে। শ্বশুরবাড়ি চলেছে, কত দূরে কে জানে!

হঠাৎ এ কি কাণ্ড !

একটি লঞ্চ যেন তীরবেগে ওই ডিঙি-নৌকোটার পাশ দিয়ে চলে গেল। ঢেউ উথাল-পাথাল হয়ে উঠলো।

একটা 'গেল-'গেল চিৎকার উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। সেই ডিঙ্গি-নৌকোটা মুহূর্তের মধ্যে উল্টে গেছে ! কনে-বৌটা যে জলের মধ্যে ডুবে গেল !

সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর সুপারী-লণ্ঠনবাবুর আর এক মূর্তি দেখা গেল।

তিনি কাছা-কোঁচা সামলাতে সামলাতে ক্রমাগত বাঁশী বাজিয়ে নদীর ধারের দিকে ছুটতে ছুটতে আসছেন।

এক মুহূর্তে সিনেমার দ্রুতগতি ছবির মতো দৃশ্যপটের পরিবর্তন হল। বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসের ছেলের দল চোখের পলক ফেলতে না-ফেলতে সাঁতারের পোশাক পরে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কে আগে সাঁতার কেটে গিয়ে ওই ডুবন্ত ডিঙি-নৌকোর মানুষগুলোকে উদ্ধার করবে, তারই যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছে !

গঙ্গারাম রাত্তিরে যে কৈ মাছের সাঁতার কাটার স্বপ্ন দেখেছিল, তাই যেন নতুন করে সকালবেলা জীবন্ত হয়ে উঠেছে ! তর্‌তর্ করে জল কেটে এগিয়ে চলেছে ছেলের দল, আর তীরে দাঁড়িয়ে সুপারী-লণ্ঠনবাবু বাঁশী বাজিয়ে চলেছেন।

অবশেষে ছেলেদের প্রাণপাত পরিশ্রম সার্থক হল। শিক্‌কাবাব ত গঙ্গারামের পাশে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি করছিল। সে যে কখন জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, গোটা দৃশ্যটা দেখতে গিয়ে গঙ্গরাম সেদিকে আদৌ খেয়াল করেনি।

সেই শিক্‌কাবাবই বৌটিকে বাঁচিয়েছে।

আর একটি নৌকো ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সবাই ধরাধরি করে সেই নৌকোর ওপর কনে- বৌটিকে তুলে দিয়েছে।

ততক্ষণে আর সব ছেলে গিয়ে নৌকোর অন্যান্য লোককে জল থেকে টেনে তুলেছে।

একটি বুড়ো নৌকোর ওপরে বসে তামাক টানছিল। সে বোধকরি কনে-বৌয়ের শ্বশুর। সেই বুড়ো অনেকটা জল খেয়েছিল। প্রাণ যাক্ সেও ভালো, তবু সে হাতের

হুঁকোটি ছেড়ে দেবে না ! ছেলেরা জোর করে সেটি ফেলে দিতে তবে বুড়োর জীবন রক্ষা হয়।

ততক্ষণে নৌকোটাকে ঘিরে ছেলের দল একেবারে ঘাটের কিনারায় এসে পৌঁছেছে। আর সুপারী-লণ্ঠনবাবু তাঁর বাঁশী বাজানো থামিয়ে দিয়ে একেবারে জলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন।

গঙ্গারাম শ্বাস বন্ধ করে পরম বিস্ময়ে এই সব কাণ্ড দেখছিল, আর মনে মনে বুঝতে পারছিল, কেন এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সুপারী-লণ্ঠনবাবু সাঁতার জানার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

নিজেকে ভারী ছোট মনে হতে লাগল গঙ্গারামের। তাই ত' ! সে যে এখানে একেবারে অকেজো মানুষ তা একটু আগেও বিন্দুমাত্র বুঝতে পারে নি !

নৌকো থেকে ঘাটে নামানো হয়েছে কনে-বৌটিকে ! সুপারী লণ্ঠনবাবু—মানে সনাতনবাবু এগিয়ে এসে ওকে একবার বসিয়ে আবার শুইয়ে দিয়ে এই ভাবে খানিকক্ষণ কসরৎ চালিয়ে ওর পেটের জল সব বের করে ফেললেন।

তারপরেই মজার কাণ্ড !

জ্ঞান ফিরে পেয়েই বৌটি চারদিকে পাগলের মতো তাকাতে লাগল।

সনাতনবাবু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'ভয় নেই মা ! ছেলেরা তোমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে তুলেছে। এইবার চলো আমাদের বোর্ডিং-এ। একটু গরম দুধ খেলেই বেশ খানিকটা বল পাবে।'

সনাতনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—'কিছু বলতে চাও মা ? বলো না, লজ্জা কি ? আমরা সব ব্যবস্থা করে দেবো। বোর্ডিং-এ শুকনো কাপড় আছে। ভিজে শাড়ী ছেড়ে ফেলে তাই এখন পরবে চলো'—

হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে কনে-বৌটি। বুকফাটা চিৎকার করে উঠলো—'আমার গয়নার বাক্স !'

ওকে অমনভাবে কাঁদতে দেখে ছেলের দল হো-হো করে হেসে উঠলো।

শিক্‌কাবাব ফোড়ন কাটলে—'হুঁ ! প্রাণটাই ত' চলে যাচ্ছিল ! সেই প্রাণ ফিরে পেয়েছে কিনা, তাই সকলের আগে গয়নার বাক্সের খোঁজ পড়েছে। আমরা যে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জান্ দিয়ে দিচ্ছিলুম সেটা বুঝি কিছু নয় ?'

সনাতনবাবু ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—'ওরে চুপ কর্। গয়নার বাক্স যে মেয়েদের কতখানি তা তোরা বুঝবি কি করে ?'

তারপর বৌটির দিকে তাকিয়ে বললেন—'আগে তোমরা একটু সুস্থ হও। তারপর ওরা আবার খোঁজ-খবর করে দেখবে'খন।'

শিক্‌কাবাব এক অদ্ভুত ধরনের ছেলে। এক মুহূর্ত আগে যে নিজের জীবনের

মায়া ছেড়ে দিয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এখন সে বৌটির গয়নার লোভ দেখে রসিকতা করতে ছাড়লে না ! বললে— ' সে গয়না পরে এতক্ষণ জলদেবী নদীর অতল তলে বসে মুক্তোর আয়নায় নিজের মুখ দেখছে।'

ছেলের দল এই টিপ্পনী শুনে ভারী খুশী হয়ে উঠলো। অতি পরিশ্রমের পরও তারা সবাই প্রাণখোলা হাসি হাসতে লাগল।

সবাই দল বেঁধে বোর্ডিং-এ ফেরবার সময় শিক্‌কাবাব এক সময় গঙ্গারামকে একান্তে পেয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে—'বেমক্কা নৌকোডুবি হল বলে আজ খুব বেঁচে গেলি কিন্তু কাল তোকে কে বাঁচাবে শুনি ?'

গঙ্গারাম উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে—'আমি সাঁতার শিখবো। তুমি আমায় শিখিয়ে দাও।'

শিক্‌কাবাব ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে—'ব্যস্‌ ব্যস্‌ ! এই ত' মরদের মতো কথা !'

হাতি কা দাঁত
মরদ কা বাত্‌ !

সেদিন গভীর রাতে গঙ্গারাম আবার স্বপ্ন দেখলে। এ আবার অন্য রকম স্বপ্ন ! গঙ্গারাম যেন বোর্ডিং থেকে বেরিয়ে নিরালা নদীর তীরে বেড়াতে এসেছে।

একটা মিঠে ঝিরঝিরে হাওয়া দেহ-মনকে দোল দিয়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যেবেলা।

আকাশের দিকে চোখ পড়তে দেখা গেল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী নিজেদের বাসার দিকে ফিরে যাচ্ছে।

পশ্চিম আকাশে মেঘের বুকে রঙের খেলা। মনে হল—অদেখা বিধাতাপুরুষ অনেকগুলো রঙের বাটি নিয়ে ছবি আঁকতে বসেছিলেন। হঠাৎ হাত লেগে সেই রঙের বাটিগুলো সব উল্টে পড়ে গেছে। তাই মেঘের বুকে নানা রঙের মাখামাখি। আবার চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে রঙের সুষমা সব পাল্‌টে যাচ্ছে।

গঙ্গারাম অবাক হয়ে এই রঙের খেলা দেখছিল। আস্তে আস্তে সব রঙ মিলিয়ে গেল আকাশে। একটা বাদুড় তার কালো ডানা মেলে আকাশটাকে যেন ক্ষণকালের জন্য ঢেকে ফেললে।

আবার একটু বাদেই দেখা গেল—চাঁদ উঠেছে আকাশের গায়। সেই চাঁদের আলো খেলা করছে নদীর জলের ঢেউয়ের সঙ্গে।

অবাক হয়ে চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখছে গঙ্গারাম। হঠাৎ ওর চোখে পড়লো—একটি শিশু নদীর বুকে ভেসে যাচ্ছে। শিশুটি দু'হাত তুলে যেন গঙ্গারামকে ডাকলে, তাকে নদীর জল থেকে তুলে নেবার জন্য । গঙ্গারামের প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলে।

সে একবারও চিন্তা করে দেখলে না যে, সে সাঁতার জানে না। এক মুহূর্তও ভাববার সময় নেই তার। চাঁদের আলোতে সে পরিষ্কার দেখতে পেলে—সেই শিশুটি একবার ভাসছে, আবার পরক্ষণেই ঢেউয়ের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। কোমরের কাপড় ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে গঙ্গারাম নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দিব্যি তর্‌তর্‌ করে ঢেউ কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল সে।

এমন সময় হঠাৎ তার মনে হল, তাই ত'। সে ত'! একটুও সাঁতার জানে না ! নদীর ঢেউয়ের ওপর দিয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে কি করে ? ....এই কথা মগজে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গারামের সাঁতার দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তার হাত-পা আর ওঠে না। সে নদীর জলে তলিয়ে যেতে লাগল, প্রাণপণ চিৎকার করে উঠলো,—'কে আছ, আমাকে বাঁচাও !'

কেউ জানতে পারলে না, কেউ বুঝতে পারলে না যে, গঙ্গারাম এইভাবে নদীর তলায় তলিয়ে যাচ্ছে ! ডুবতে ডুবতেও সে একবার চোখ তুলে দেখলে, শিশুটি ঢেউয়ের ধাক্কায় অনেক দূর ভেসে চলে গেছে। এখনো তার সেই কচি কচি হাতের মুঠি চকিতে চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

একটা আচমকা ধাক্কা খেয়ে গঙ্গারামের ঘুম ভেঙে গেল। সেই সঙ্গে স্বপ্নটাও গেল ছিঁড়ে।

যাক—বাঁচা গেল !

তা'হলে সত্যি সে নদীর জলে ডুবে যাচ্ছিল না। কিন্তু নদীতে ডুবে যাওয়ার যে আতঙ্ক, তাতে সে তখনো শিউরে শিউরে উঠছিল।

কুল-কুল করে ঘাম বইছে তার সারা শরীরে। বিছানাটা ঘামে একেবারে ভিজে জব্‌জবে হয়ে গেছে।

কিন্তু সেই বাচ্চা ছেলেটা ? সেও তা'হলে স্বপ্ন ? গঙ্গারামের মনে হল, তেষ্টায় তার গলা কাঠ হয়ে গেছে। জলের জন্য সে চিৎকার করে উঠলো ! কিন্তু গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুলো না।

হঠাৎ চোখ কচ্‌লে তাকিয়ে দেখে, ওর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আছে শিক্‌কাবাব। ঘরে কোনো আলো নেই, কিন্তু জানালা দিয়ে যে ক্ষীণ চাঁদের আলো এসে ঢুকেছে—তাতেই চেনা গেল দাঁড়ানো লোকটি শিক্‌কাবাব।

নাঃ, শিক্‌কাবাব—স্বপ্ন নয়। ও ঠিক গঙ্গারামের বিছানার কাছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

একটা টিক্‌টিকি ডেকে উঠলো—টিক্—টিক্—টিক্ ! শিক্‌কাবাব যেন এরই প্রতীক্ষা করছিল।

সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে—'এ—ই, উঠে আয় শীগ্‌গির!'

গঙ্গারামের যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। যদি বা স্বপ্নটা কোনোরকমে ভেঙেছে—আবার শেষ-রাত্তিরে শিক্‌কাবাবের এ কি অজানা খেলা? এই অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে নদীতে সাঁতার শিখতে হবে নাকি?

শিক্‌কাবাব আবার ওকে সচেতন করে দিয়ে বললে—এই, উঠে আয় তাড়াতাড়ি, সনাতনবাবু ডাকছেন।'

একে ত' অজানা জায়গা, তার ওপর অজানা আশঙ্কায় ওর বুক এখনো কাঁপছে!

তবু সনাতনবাবুর নাম শুনে ওকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হল।

কোনোরকমে চোখে-মুখে জল দিয়ে একটা অবাক-করা কৌতূহল নিয়ে সে শিক্‌কাবাবের পেছন পেছন রওনা হল। শিক্‌কাবাব চলেছে আগে আগে, আর গঙ্গারাম চলেছে তার পেছন পেছন—একেবারে গাধাবোটের মতো। দু'জনের কারো মুখে কোনো কথা নেই।

একটা ছোট প্রদীপ রয়েছে শিক্‌কাবাবের হাতে, তাতে কতটুকু আলো দেয় ? যত না আলো দেয়, তার চাইতে বেশী ছড়ায় ধোঁয়া। সেই কাঁপা-কাঁপা আলোর কাঁপা-কাঁপা ছায়া ফেলে দু'জনে লম্বা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলে। গোটা বাবুইবাসা বোর্ডিং একেবারে নিঝুম অসাড় হয়ে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে কোনো মায়াদানব যেন তাকে যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। দূরে অন্ধকারে নদীর কলকল্লোল শোনা যাচ্ছে, কিন্তু চোখে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। মনে হচ্ছে, সেই মায়াদানবটা সবাইকে অজ্ঞান করে রেখে এখন নিজে মনের আনন্দে ঘুম লাগিয়েছে। দূর থেকে ভেসে আসা নদীর ফোঁস্-ফোঁসানি যেন সেই দানবটারই নাকের ডাক।

ততক্ষণে সামনের বারান্দাটা ছেড়ে ওরা পেছনের আরো নির্জন অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছলো।

যে ঘরের সামনে গিয়ে শিক্‌কাবাব দাঁড়ালো—সেখানে কেউ থাকে বলে গঙ্গারামের কোনো ধারণা ছিল না। ওদিকটায় কেউ বড় একটা আসেও না।

এদিকে কেন নিয়ে এলো ওকে ?

গঙ্গারামের বিস্ময় আরো বেড়ে যেতে লাগল।

শিক্‌কাবাব এগিয়ে গিয়ে একটা বন্ধ ঘরের দরজায় শব্দ করলে, ঠক্—ঠক্ ঠক্! ঠিক সেই রকম শব্দ শোনা গেল—ঘরের ভেতর থেকে। তারপর আস্তে আস্তে ভেজানো দরজাটা একটুখানি খুলে গেল।

কোনো কথা না বলে শিক্‌কাবাব গঙ্গারামকে টেনে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা আবার ঘরের ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

কামরাটায় ঢুকে গঙ্গারামের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রইলো না। ঘরের মধ্যে মা কালীর মূর্তি। মূর্তির দুই পাশে দুটি মাটির প্রদীপ জ্বলছে। সেই মূর্তির সামনে ওদের দিকে পেছন ফিরে বসে আছেন একটি পুরোহিত—তাঁর মুখেও কোনো কথা নেই।

কিন্তু ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি যখন মুখ ফেরালেন তখন গঙ্গারামের আরো অবাক হবার পালা !

কী আশ্চর্য ! সনাতনবাবু লাল চেলি পরে মা কালীর সামনে পুরোহিত হয়ে বসে আছেন।

গঙ্গারাম হঠাৎ নিজের গায়ে একটা চিম্‌টি কেটে বসলো। সে এখনো স্বপ্ন দেখছে না ত' ?

উঁহুঁ ! চিম্‌টিতে বেশ লাগে ! তা'হলে এ ত' আর স্বপ্ন নয় ! গঙ্গারামের চোখ দু'টি বড় হয়ে উঠলো।

আবার ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখলে—এ যেন তাদের সেই সুপারী-লণ্ঠনবাবু নয়—যেন আর কোনো মানুষ।

হ্যাঁ, সনাতনবাবু। চিরকাল যেন তিনি এই আসনে বসে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন ! মা কালীর সামনে তপস্যা করা ছাড়া জীবনে আর তাঁর অন্য কোনো কাজ নেই !

একটা গম্ভীর গলা শোনা গেল—"মাকে প্রণাম করো !"

গঙ্গারাম ভয়ে ভয়ে মা কালীর মূর্তির সামনে ঢিপ্ করে একটা প্রণাম ঠুকে দিল।

সনাতনবাবু আবার কথা বললেন—'আজ অমাবস্যা রাত্রি ; বড় সুসময়। আজ মায়ের সামনে তোমাকে আমি দীক্ষা দেবো।'

গঙ্গারামের আবার যেন সব গুলিয়ে যায়।

সে এসেছে এই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা করবার জন্য। দীক্ষার ব্যাপার সে ত' কিছুই বুঝতে পারছে না।

গঙ্গারাম জেগে আছে—না আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিছুই ঠাহর করতে পারছে না !

সনাতনবাবুর গম্ভীর গলা আবার শোনা গেল—'আজ তোমায় দীক্ষা দিচ্ছি। তোমার কপালে পরিয়ে দিচ্ছি রক্ততিলক। দেশের সেবা ছাড়া তোমার আর কোনো ব্রত থাকবে না। তুমি আজ থেকে মায়ের নির্মাল্য হয়ে চিহ্নিত হয়ে থাকলে। আর কেউ যেন জানতে না পারে। বাইরে তুমি থাকবে হাসিখুশি বালক, খেলাধুলায় মত্ত। আনন্দের ফল্গুধারা। এই বোর্ডিং-এ প্রত্যেকটি ছেলের একটি করে হাল্‌কা নাম আছে। এই যেমন ধরো—শিক্‌কাবাব। আজ তোমার নাম হল, দরবেশ। কিন্তু অন্তরে তুমি থাকবে নির্মাল্যের মতোই পবিত্র। মায়ের ডাক যখন আসবে, তখন তুমি অগ্রপশ্চাৎ

বিবেচনা না করে, দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই নাও লেখনী, আর এই নাও ছুরি। বুকের রক্ত দিয়ে এইখানে, তোমার নাম স্বাক্ষর করো।'

গঙ্গারাম কি বুঝলে, কিছুই জানা গেল না। শুধু সম্মোহিত প্রাণীর মতো সে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে নাম স্বাক্ষর করে দিলে।

তিন

তারপর দু'মাস কেটে গেছে।

গঙ্গারাম এখন বাবুইবাসা বোর্ডিংকে সত্যি ভালোবেসে ফেলেছে। এই বোর্ডিং-এর সকলের সঙ্গে তার মিতালি।

যে গঙ্গারাম একদিন জলকে ভয় পেতো, সে-ই এখন জলের পোকা হয়ে উঠেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে যে সে এত ভালো সাঁতার শিখলো সেইটেই সকলের বিস্ময়। গঙ্গারাম যখন কোমরে শক্ত করে গামছা জড়িয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন ছেলের দল তাকে 'পাঁকাল মাছ' বলে ডাকে।

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ ওর এখন তিনটে নাম চলতি হয়েছে। একটা হচ্ছে বাপ-মার দেওয়া নাম—গঙ্গারাম, দ্বিতীয়টি হচ্ছে সুপারী-লণ্ঠনের দেওয়া নাম—দরবেশ, আর তৃতীয়টি ছেলেদের আদরের ডাকনাম—পাঁকাল মাছ। স্নানের ঘাটে প্রতিদিন যে হুল্লোড় শুরু হয়, সেখানে সে পাঁকাল মাছ নামেই বিশেষ পরিচিত। তর্‌তর্‌ করে সে জল কেটে যখন অবলীলাক্রমে এগিয়ে যায়, তখন তাকে জলের মাছ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা সত্যি শক্ত।

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর সর্বত্রই একটা আলাদা আবহাওয়া। সুপারী-লণ্ঠনবাবুর মুখে একটি কথা সব সময়ই শোনা যায়—

"One thing at a time
And that done well,
Is a very good rule
As many can tell."

সেইজন্য এই বোর্ডিং-এর ছেলেরা যখন যে কাজটি করে, একেবারে সারা মন ঢেলে দিয়ে সেই কাজ সম্পাদন করে থাকে।

এখানে খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার নিয়ম। হাত-মুখ ধুয়েই নদীর ধারে বেড়াতে হবে। অধিকাংশ ছেলেই হাফ্‌প্যান্ট পরে এই সময় সোজা রাস্তা ধরে ছুটতে থাকে। সনাতনবাবুও ওদের সঙ্গে ছোটেন। ফিরে এসেই সকলকে এক কাপ করে গরম দুধ খেতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো আপত্তিই টিকবে না। ছেলেদের মধ্যে অনেকেরই দুধ

সম্পর্কে প্রবল আপত্তি থাকে। কেউ কেউ বলে—'এখনও কি আমরা ছোট আছি নাকি, যে মায়ের কোলে বসে ঝিনুক-বাটি করে দুধ খাবো ?'

সনাতনবাবু হাসতে হাসতে উত্তর দেন—' রোজ দুধ না খেলে সব কাজে লড়বি কি করে রে?'

যারা আপত্তি জানায় কিংবা দুধের বাটি সরিয়ে রাখে তাদের কিন্তু সমূহ বিপদ !

সনাতনবাবু নিজে গিয়ে নাক টিপে ধরে সেই ছেলেটিকে দুধ গিলিয়ে দেন। পরদিন থেকে সে একেবারে শায়েস্তা হয়ে যায়।

পড়াশোনার সময় কিন্তু কেউ কোনো কথা নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনে ঋষি বালকেরা একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যেভাবে বিদ্যা অর্জন করতো—এই বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসে সনাতনবাবুর প্রখর দৃষ্টির সামনে ছেলের দলকে তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের নিজের পড়া তৈরি করতে হতো। সেইজন্য এই বোর্ডিং-এর কোনো ছেলে পরীক্ষায় ফেল করতো না। যে ঘরের একটি ছেলে পরীক্ষার ফল খারাপ করতো, সনাতনবাবু সেই ঘরের প্রত্যেকটি ছেলেকে শাস্তি দিতেন। তাই সব ঘরে সব বোর্ডার কড়া দৃষ্টি রাখতো যাতে কারো পড়াশোনায় এতটুকু ফাঁকি না থাকে ! যদি কেউ কোনো বিষয়ে কাঁচা থাকতো, তাহলে সবাই মিলে দিনরাত পরিশ্রম করে তাকে ভালোরকম তৈরি করে দিত।

অথচ মজা এই যে, প্রতিদিন নদীতে স্নানের সময়ে ছেলের দল যেভাবে মেতে উঠতো, তা দেখলে মনে হতো না যে, এই ছাত্রদলই আবার গভীর মনোযোগের সঙ্গে লেখাপড়া করতে পারে।

ইস্কুলের কয়েক ঘন্টা যে যার ক্লাসে ছড়িয়ে থাকতো। তারপর আবার বিকেলে বোর্ডিং-এ ফিরে জলখাবার খেয়ে নিয়ে খেলার মাঠে গিয়ে জমা হতো। সেখানে দেশী-বিদেশী সব রকম খেলারই ব্যবস্থা ছিল। কেউ খেলতো হাডু-ডু-ডু, কেউ গোল্লাছুট, কেউ দাঁড়ি বাঁধা আবার কেউ বা খেলতো গাদি।

কিন্তু সব চাইতে বেশী উত্তেজনা দেখা যেতো ফুটবল খেলায়। হেড্ করে কে গোল দিতে পারে, তাই নিয়ে প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না। আবার সন্ধ্যার পরে হাত-মুখ ধুয়ে, সমবেতভাবে প্রার্থনা করে যে যার পাঠ্য-পুঁথি নিয়ে পড়া তৈরি করতে বসে যেতো। ওরা দুলে দুলে পাঠ মুখস্থ করতো, আর দেয়ালে ওদের লম্বা লম্বা ছায়াগুলো দুলতো।

তারপর গভীর রাতে বোর্ডিং-এর বড় ছেলেদের সঙ্গে সুপারী-লণ্ঠনবাবুর গোপন ঘরে যে কি আলোচনা হতো, বাইরের লোকেরা তার কিছুমাত্র সন্ধান পেতো না। তবু অভিভাবকদের দল এই ভেবে খুশী ছিলেন যে, বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসের ছেলেরা সব সময় হুল্লোড়ে মেতে থাকে বটে, কিন্তু আসল কাজ তারা কেউই ভোলে না।

পড়াশোনায় সবাই তারা চৌকস। আর বিদ্যালয়ের সবগুলো পুরস্কার তারা ঝেঁটিয়ে বোর্ডিং-এ নিয়ে আসতো—তা সে পড়া-শোনার পারিতোষিকই হোক, আর খেলাধুলার শীল্ডই হোক।

সব দিকেই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর জয় জয়কার। আশে-পাশের গাঁয়ের ছেলেরা কখনো ভয়ে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর টিমকে খেলায় চ্যালেঞ্জ করতে সাহস করতো না।

* * *

কিছুদিন বাদেই সনাতনবাবু এই বোর্ডিং-এর পক্ষ থেকে এক সন্তরণ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বসলেন। ঘোষণায় এই কথা পরিষ্কারভাবে জানানো হল—যে কোনো বিদ্যালয়ের ছাত্রদল এই সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবে।

প্রতিযোগীদের দুইটি বিভাগে ভাগ করা হবে। আট বছর থেকে বার বছরের ছেলেদের একটি বিভাগ, আর তের বছর থেকে ষোল বছর পর্যন্ত আর একটি বিভাগ। এই প্রতিযোগিতার জন্য প্রচুর পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করা হবে।

এই খবর প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের ইস্কুলে বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হল।

বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা যে যেখানে আছে এমনভাবে সাঁতার অভ্যাস করতে লাগল যে, অনেকের অসময়ে জ্বরই হয়ে গেল। এ ব্যাপারে সনাতনবাবুর প্রখর দৃষ্টি। তিনি হুঙ্কার দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন—'সাঁতারে জিততে গেলে দমই হচ্ছে আসল মূলধন। ঝোঁকের মাথায় খানিকটা বেশ এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু সাঁতার দিতে গিয়ে যার দম ফুরিয়ে যায়, সে প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করবে কি করে ?'

তাই প্রতিদিন প্রত্যুষে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছেলেদের নদীর ধার দিয়ে দু-তিন মাইল ছুটতে হতো। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তাদের আবার নদীর জলে সাঁতার কাটতে হতো। সনাতনবাবু সর্বদা একটি বাঁশী নিয়ে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর সবাইকার ক্ষিপ্রগতি লক্ষ্য করতেন।

এইভাবে সন্তরণ প্রতিযোগিতার উদ্যোগ-পর্ব সমাধা হল।

যথাসময়ে সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি এসে গেল। ছেলের দলের মনে হল, সেদিনকার সূর্য বোধকরি তাদের মাথায় আশীর্বাদ বর্ষণ করবার জন্যই একটু আগে আগে পূব আকাশে উদিত হয়েছে।

আসল আয়োজন সনাতনবাবু ভেতরে ভেতরে সমাধা করে রেখেছেন।

সকাল থেকেই নদীর ধারে যেন মেলা বসে গেল। ছোট ছোট নৌকো প্রতিযোগিতার সময় পাশে পাশে থাকবে—ছোটদের পাহারা দেবার জন্য। কি জানি হঠাৎ কেউ যদি

জলে ডুবে যায় ! অভিজ্ঞ সাঁতারুরা তখনি লাফিয়ে পড়ে তাদের জল থেকে টেনে তুলবে।

কয়েকজন ডাক্তারকে নিযুক্ত করেছেন সনাতনবাবু। তাঁরাও ছোট ছোট নৌকোতে প্রাথমিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নিয়ে তৈরি হয়ে থাকবেন। কি জানি, বিপদ-আপদের কথা ত' বলা যায় না। দরকার হলেই তাঁরা কাজে লেগে পড়বেন !

যত বেলা বাড়তে লাগল, ততই নানা গ্রাম থেকে মানুষ এসে ভিড় জমাতে লাগল। অনেকে দলবল মিলে একেবারে সোজা নৌকো করেই এসেছে। নৌকোতে বসেই সাঁতারের খেলা দেখবে। তারপর সব কিছু শেষ হয়ে গেলে সেই নৌকোতে করেই নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যাবে। এরা মাটির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখে নি। নৌকোতেই রান্না-বাড়া চলতে থাকবে। যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ফেলবে। কিন্তু দৃষ্টি থাকবে তাদের নদীর দিকে। ছেলের দল কি ভাবে সাঁতার কাটে সেটা প্রাণ ভরে উপভোগ করতে হবে বৈ কি !

আর একদল আছে, যারা এই সাঁতারকে উপলক্ষ করে কিছু কামিয়ে নিতে চায়। তারাও মাথায় করে জিনিসপত্র নিয়ে এসে হাজির হয়েছে যথাসময়ে। নদীর ধারে তারা দোকান বসাবে।

কেউ বসিয়েছে পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান, কেউ সাজিয়ে নিয়েছে মিঠা পানি—মানে, সোডা আর লেমনেডের দোকান। পান-বিড়ি-সিগারেটের অবশ্য বিক্রি সব চাইতে বেশি। সময় কাটাতে হলে এই জিনিসগুলো অবশ্যই চাই। নৌকোতে বসে আছেন যে সব বুড়ো, তাঁদের হাতে হাতে থেলো হুঁকো সব সময়েই ধোঁয়া ছাড়ছে।

নদীর পাড়ে তেলে-ভাজার দোকানেরও অভাব নেই। গরম গরম ভাজা হচ্ছে, আর লোকের হাতে হাতে উঠে যাচ্ছে। তেলে-ভাজার মতো মুখরোচক খাবার আর কিছু নেই। আবার তেলে-ভাজার দোকানের পাশেই গরম মুড়ির দোকান। বুড়ীরা ভেজে শেষ করতে পারছে না। আজ একদিনের মরসুমে তারা বেশ কিছু কামাই করে নিতে চায়। জিলিপির দোকানও বসেছে এখানে-ওখানে। গাঁয়ের লোকের কাছে এ পদার্থটিও উপেক্ষার নয়। তাছাড়া বসেছে ফলের দোকান। কচি শশা, তরমুজ, ফুটি, বেল, কালোজাম—যার গাছে যা ফলেছে ঝুড়ি করে নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। রথ দেখা আর কলা বেচা দুই-ই হবে। মনোহারী দোকানও এ সুযোগ ছাড়তে রাজী নয়। কাঁচের চুড়ি, মেয়েদের চুলের ফিতে, তরল আলতা, ঝুটো মুক্তোর মালা, আয়না, চিরুণি, স্নো, পাউডার—সব কিছুই সাজিয়ে নিয়ে বসেছে। কিছু কিছু রঙীন জামা-কাপড়ের ছিট্‌ও আছে বৈ কি সঙ্গে। কে কি পছন্দ করবে, আগে থেকে ত' কিছু বলা যায় না। গাঁয়ের মানুষ, চট্ করে মন ভোলে।

এই মরসুমে জেলের দলও তৎপর হয়ে উঠেছে। নদীর ধারের মানুষ, নদীকে

নিয়েই যখন কাজ-কারবার—তখন ওরাই বা পেছিয়ে থাকবে কেন ? তাছাড়া বাড়ি ফেরবার মুখে মাছ সবাইকারই চাই। যারা সাঁতারে জয়লাভ করে পুরস্কার পাবে, তাদের দল ফিরে গিয়ে বিরাট ভোজ লাগাবে। কাজেই বড় বড় রুই-কাতলা, চিতোল-বোয়াল চাই বৈ কি ! আগে থেকে জাল ফেলে মাছ না ধরলে চাহিদা মেটানো কি চারটিখানি কথা ?

বড় বড় গুড়ের হাঁড়ি নিয়ে আবার একদল বসে গেছে এক কোণে, সাঁতারের ব্যাপারে গুড় কোন্ কাজে লাগবে ?

কিছুই বলা যায় না ! কোনো দল সাঁতারে জিতে যদি পরমান্ন পরিবেশন করতে চায়, তবে ওই গুড়ের হাঁড়ি নিয়ে টানাটানি হবে বৈ কি !

এতক্ষণে বিচারকের দল এসে পড়েছেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ব্যায়াম-শিক্ষক ও সাঁতারুর দল এই সন্তরণ-প্রতিযোগিতার বিচারকার্য সমাধা করবেন।

এইবার নদীর ধারে যে দিকে তাকানো যায়, শুধু কালো কালো মাথা। কত লোকে যে গাছের ওপর উঠে বাদুড়ের মতো ঝুলছে, তার আর সীমা-সংখ্যা নেই !

দূর থেকে কিন্তু চমৎকার লাগছে দেখতে। একেবারে ছবি তুলে নেবার মতো।, তবু এখনো নানা গ্রাম থেকে মানুষের মিছিল আসছে। বোর্ডিং-এর ছাদে উঠে দেখলে মনে হবে, দূর দূর অঞ্চলের মাঠ দিয়ে যেন পিঁপড়ের সারি নদীর দিকে রওনা হয়েছে।

প্রতিযোগীদের যিনি রওনা করিয়ে দেবেন, তাঁকে বলা হয় 'ষ্টার্টার'। তিনি বাঁশী নিয়ে এসে নদীর ধারে দাঁড়িয়েছেন। অনেক সময় বন্দুকের শব্দ করেও প্রতিযোগিতা শুরু করা হয়।

প্রতিযোগীরা কেউ হাফ্‌প্যান্ট পরে, কেউ মালকোঁচা মেরে তৈরি হয়ে নিয়েছে। সারা গায়ে ভালো করে সরষের তেল মালিশ করে নিয়েছে সবাই। বড় ছেলেরা এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

প্রথমে ছোটদের দলের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে ছাত্রদল। তার ভেতর আমাদের পাঁকাল মাছও দিব্যি বুক চিতিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

বেজে উঠলো বাঁশী। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে।

মেয়েরা তীরে দাঁড়িয়ে শঙ্খধ্বনি করে উঠলো। একদল বৌ-ঝি নানা রঙের ফুল ছিটিয়ে দিলে নদীর জলে। সেগুলো ভেসে যেতে লাগল ঢেউয়ের ধাক্কায়। আবার আর একদল ছেলে নদীর জলে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে মজা দেখতে লাগল। সেই কাগজের নৌকোগুলোর মধ্যে প্রতিযোগীদের নাম লেখা ! তাই নিয়ে সবাইকার উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই।

ক্ষুদে প্রতিযোগীরা এরই সঙ্গে জলের মধ্যে হাত টেনে টেনে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। কখনো তাদের মাথা দেখা যাচ্ছে, কখনো তলিয়ে যাচ্ছে জলের তলে।

প্রতিযোগীদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ডিঙি-নৌকোগুলো। ডাক্তারেরা তটস্থ হয়ে নৌকোর ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। জীবনরক্ষী-বাহিনী দলের কারো চোখের পলক পড়ে না। কোন্ মুহূর্তে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে—তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে বৈ কি !

যেখানটায় সন্তরণের সমাপ্তি-রেখা, সেই জায়গাটা দড়ি দিয়ে ভালো করে ঘিরে রাখা আছে। আর একদল বিচারক সেইখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন। তাঁদের হাতে কি সব খাতা-পত্র রয়েছে।

মাঝামাঝি পথ অতিক্রম করে কয়েকটি ছেলে অবসন্ন হয়ে পড়লো। আর তাদের হাত চলে না। হয়ত ওরা ডুবেই যেতো। ওদের তাড়াতাড়ি নৌকোতে তুলে নিলে জীবনরক্ষী-বাহিনী।

চূড়ান্ত উত্তেজনা শেষ হবার মুখে কয়েকটি ছেলে টর্পেডোর মতো দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। উল্লাসধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে গেল নদীর তীর। আবার এখানেও ধ্বনিত হয়ে উঠলো মঙ্গল-শঙ্খ।

হঠাৎ চোখের নিমেষে পাঁকাল মাছ সবাইকে অতিক্রম করে তীরবেগে ছুটে এসে নির্দিষ্ট দড়ি স্পর্শ করলো।

আবার জয়ধ্বনি উঠলো চারদিক থেকে। সনাতনবাবু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ছুটে এসে পাঁকাল মাছের গলায় একটি সুন্দর ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে হাসতে লাগলেন।

চার

সবাই বললে—'পাঁকাল মাছ জলে পালিয়ে যায়। কিন্তু ডাঙায় ?'

সেখানে [illegible] ছাড়[illegible] নেই।

পাঁকাল—মানে [illegible]রাম ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়—' কেন ? কি হল ? আমার পালিয়ে যাবার কি দে[illegible] তোমরা?'

—পালিয়ে যাবার ম[illegible]ব নয়? এতবড় একটা যুদ্ধ জেতা ! সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া, মানেই ত' একটা বিরাট যুদ্ধে জয়লাভ করা। সেই সম্মুখ-সমরে সাফল্য লাভ করে খাওয়ানোর নামগন্ধ নেই?'

—'খাওয়ানো মানে ?'

—'খাওয়ানো মানে খ্যাঁট ! যাকে শুদ্ধ ভাষায় বলে ভবি-ভোজন।'

পাঁকাল মাছ যেমন জলে কিল্‌বিল্‌ করে ওঠে ! তারপর ফোড়ন কাটে— "আমি এত কষ্ট করে প্রথম হয়েছি, সেজন্য তোমাদেরই উচিত আমায় খাইয়ে দেওয়া। তা নয় কিনা, একেবারে উল্টো চাপ ! আমি কেন মিছিমিছি ভূত-ভোজন করাতে যাবো ?'

গঙ্গারামের এই ফোড়নে সবাই যেন তপ্ত বালিতে খৈয়ের মতো লাফাতে থাকে — "কী ! আমরা ভূত ? আমাদের খাওয়ানো মানে, ভূত-ভোজন ? বেশ ! তুই যদি না খাওয়াস ত' আমরাই চাঁদা করে তোকে খাইয়ে দেবো।'

গঙ্গারাম যেন আনন্দে নৃত্য করতে থাকে ; বলে—'এই ত' সত্যিকারের 'মানুষের' মতো কথা ! আচ্ছা, তোমরাই ভেবে দেখ,—আমি কত দিন ধরে কসরৎ করে সাঁতার শিখেছি ! তারপর দিনের পর দিন অনুশীলন করে আমার গতি বাড়িয়েছি। রোজ সকালে ছুটে ছুটে দম বাড়িয়েছি। জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে সাঁতারের কলাকৌশল আয়ত্ত করেছি। এই সাঁতার শেখার ব্যাপারে কত জল খেয়েছি।, সে সব কথা তোমরা হিসেব করে দেখেছ কেউ ? আজ বেড়ালের ভাগ্যে যখন শিকে ছিঁড়েছে, তখন তোমরাই ত' ডেকে নিয়ে গিয়ে আমায় ভরপেট খাইয়ে দেবে ! আমি মুক্তকণ্ঠে তোমাদের সবাইকার জয়ধ্বনি দেবো।'

—'খুব যে বক্তৃতা দিচ্ছিস্‌ পাঁকাল মাছ !' একজন দাঁড়িয়ে উঠে ওকে ধমক দেয়।

—'এই ত' সেদিন এলি এই বোর্ডিং-এ। তখন মুখ দিয়ে কথাও বেরোতো না ! এরই মধ্যে তোর ডানা গজিয়েছে, একেবারে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে উড়তে শিখেছিস্‌ !'

পাঁকাল মাছের মুখে আর হাসি ধরে না ! উত্তর দিলে, 'আরে এই জন্যেই তোদের উচিত চাঁদা করে আমাকে ভালো করে খাইয়ে দেওয়া।'

সকলে বললে, 'সাবাস্‌ ! সাবাস্‌ ! তাই হবে। তোর মনোবাসনাই পূর্ণ করবো আমরা। কিন্তু কি খাবি তুই ? মাংস ? মাছ ? না—নিরামিষ ?'

গঙ্গারাম শুধু একবার ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো মুখ করে বললে, ' কোনো রান্নাতেই আমার আপত্তি নেই, শুধু দেখতে হবে ঝালটা বেশী না হয়। তা হলেই কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাবো।'

ছেলের দল হুল্লোড় করে ওঠে, 'আচ্ছা তোকে তাই খাওয়াবো। জলের নৌকো, আর আকাশের ঘুড়ি—এছাড়া যে তুই সব খাস তা কি করে জানবো ?'

এমন সময় সনাতনবাবু এসে হাজির হলেন সেখানে। জিজ্ঞেস করলেন, 'খাওয়া-দাওয়ার কথা এখানে কি হচ্ছে শুনি ?'

ছেলেরা উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে, 'একটি ভূতকে ভোজন করাতে হবে।'

সনাতনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'সেজন্যে তোমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই, বাবুইবাসা বোর্ডিং-এই 'ফিস্টি' লাগিয়ে দিচ্ছি। একেবারে যাকে বলে—দিয়তাং ভুজ্যতাং ! আনো, ঢালো আর খাও। তোমরা সব জলের পোকা হয়ে উঠছ, তাই নানারকম মাছের রান্নাই খাওয়াবো তোমাদের।'

এই মধুর সন্দেশে ছেলের দলের মধ্যে একটা হুল্লোড় জেগে উঠলো—সেই ভালো, সেই ভালো।

সবার তরেই জমবে ভোজ,
কেই বা রাখে কাহার খোঁজ।

পরদিন থেকে বোর্ডিং-এর ছেলেরা এক নতুন আনন্দে মেতে উঠলো।

কি কি মাছ জালে ধরা পড়বে, কোন্ মাছ দিয়ে ঝোল, কোন্ মাছ দিয়ে পাতুরী, কোন্ মাছ দিয়ে ঝাল-হলুদ, আর কি মাছ দিয়ে মালাইকারী তৈরি হবে ছেলে-মহলে শুধু তারই আলোচনা চললো।

সনাতনবাবু রসিক মানুষ। মাঝে মাঝে সব কিছু দিয়েই রসান দিতে লাগলেন। বললেন, 'সাঁতারের ব্যাপার বলেই কি শুধু মাছের কথা ভাবতে হবে ? বড় বড় রসগোল্লার কথা ভাবো, চিনিপাতা দৈয়ের কথা চিন্তা করো, আর খাম্‌চা মেরে নেবার ক্ষীরের কথাও আন্দাজ করতে থাকো সবাই'—

পাঁকাল বলে, 'অমন করে বলবেন না স্যার ! আমার জিভে একেবারে জল এসে যাচ্ছে!'

এমনি আনন্দের হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে চলেছে যখন সারা বোর্ডিং-এর ছেলের দল, তখন একদিন হঠাৎ গভীর রাত্রে সনাতনবাবু মৃদু পায়ে গঙ্গারামের ঘরে গিয়ে হাজির হলেন ; চাপা গলায় ডাক দিলেন, 'দরবেশ !'

গঙ্গারাম তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে ! সনাতনবাবুর চাপা গলার ডাক তার কানে পৌঁছলো না।

পাঁকাল মাছ তখন স্বপ্ন দেখছে—সে যেন ক্ষীর-সমুদ্রে সাঁতার কাটছে আর এক দল কৈ মাছ আবার তাকে তাড়া করেছে। সে যতই প্রাণপণে এগোতে যাচ্ছে ততই যেন ক্ষীরের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাই সনাতনবাবুর গম্ভীর গলার ডাকও সে শুনতে পেলে না !

সনাতনবাবু ওর খাটের কাছে এসে আর একটু চিৎকার করে ডাকলেন, 'পাঁকাল মাছ !'

এইবার গঙ্গারামের ঘুম ভেঙে গেল। আচমকা স্বপ্নটা ভেঙে যেতে সে ধড়মড় করে খাটের ওপর উঠে বসলো।

—'অ্যাঁ ! আপনি স্যার ! এত রাত্তিরে !

গঙ্গারাম বুঝতে পারলো না—সে এখনো স্বপ্ন দেখছে, না জেগে উঠছে !

সনাতনবাবু তেমনি চাপা গলায় উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ আমি। ওঠো দরবেশ। তোমার ডাক পড়েছে। তোমায় আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম, সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। কখন আহ্বান আসবে কেউ জানে না।'

গঙ্গারামের ঘুমের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। বললে, 'হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে স্যার ! কি আমায় করতে হবে বলুন—'

সনাতনবাবু চুপি চুপি বললেন, 'এখন আর তুমি গঙ্গারাম নও, পাঁকাল মাছও নও, তুমি দীক্ষা লাভ করে হয়েছো দরবেশ ! দেশ-জননীর আহ্বানে এই তোমার প্রথম কাজ। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।'

গঙ্গারামের দু'চোখের পাতা থেকে তখন ঘুম পালিয়ে গেছে ; বললে, 'গুরুদেব, আপনি আদেশ করুন কি আমায় করতে হবে? আমি প্রস্তুত। আমার মনে আর কোনো দ্বিধা নেই।'

সনাতনবাবু ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'সাবাস্ ! এই ত' কর্মীর মতো কথা। এইবার মন দিয়ে শোনো তোমার কাজের কথা !'

—'বলুন।'

—'একটি পুঁটলি আমি তোমার হাতে তুলে দেবো। তার ভেতর কি আছে—সে কথা জানবার জন্য যেন তোমার মনে কোনো কৌতূহল না জাগে।'

—'জাগবে না গুরুদেব !'

—'এই পুঁটলি নিয়ে তুমি নিঃশব্দে নদী সাঁতরে ওপারের খেয়াঘাটে গিয়ে উঠবে। সেই খেয়াঘাটের কাছেই একটা বিরাট বটগাছ আছে। সেই বটগাছের তলায় একটি পাগল আপাদ-মস্তক সাদা কাপড়ে ঢেকে শুয়ে থাকবে।'

—' কে সে পাগল প্রভু ?'

—'কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। আগেই বলেছি, তোমার মনে যেন কোনো কৌতূহল না জাগে।'

—'বুঝেছি প্রভু ! এইবার বলুন আমায় কি করতে হবে।'

— 'সেই পাগলের শিয়রে দাঁড়িয়ে তুমি শুধু তিনবার উচ্চারণ করবে—নির্মাল্য—নির্মাল্য—নির্মাল্য ! অমনি দেখবে সেই পাগল উঠে বসেছে। তার মুখ দেখবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করো না। পাগলও তার মুখ সেই সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখবে। তুমি শুধু সেই পাগলটার হাতে এই পুঁটলিটা তুলে দিয়ে আবার নিঃশব্দে চলে আসবে। আসবার সময় খেয়া নৌকোয় পার হয়ে আসবে। কিন্তু যাবার সময় সাঁতরে নদী পার হবে। সব মনে থাকবে ত ?'

—'সব মনে থাকবে গুরুদেব ! দিন আপনি পুঁটলি।'

—'তার আগে তুমি একটি হাফ্‌প্যান্ট পরে নাও। সুইমিং কষ্টিউম্ হলে আরো ভালো। সঙ্গে ধুতি নিতে ভুলো না। আসবার সময় সেই ধুতি পরে আসবে। এক হাতে সাঁতরে যেতে পারবে না ?'

দরবেশ ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বললে, 'পারবো, এক মিনিটের মধ্যে আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।'

পাছে ঘুম-ঘুম ভাবটা আবার ফিরে আসে, এজন্য মুখ-চোখ ভালো করে ধুয়ে ফেললো দরবেশ। হাফ্‌প্যান্টটা পরে নিলে। ইচ্ছে করেই গায়ে কোনো জামা রাখলো না ! সাঁতার দেবার পক্ষে সুবিধে হবে।

এইবার এগিয়ে এলেন সনাতনবাবু। দরবেশের মাথায় হাত রেখে—বিড়-বিড় করে কি যেন মন্ত্র পড়লেন। তারপর সে পুঁটলিটা ওর হাতে তুলে দিলেন।

দরবেশ বেশ বুঝতে পারলো যে, পুঁটলিটা ভারী। কিন্তু জলে নামলে এ ভার আর থাকবে না,—সে খবর সে রাখে।

সনাতনবাবুর পায়ের ধূলো নিয়ে আর একটি কথাও না বলে সে সোজা বাইরে বেরিয়ে এলো।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশে ক্ষীণ চাঁদ—অজস্র তারার মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে আছে।

দরবেশ নদীর ঘাটের দিকে দ্রুত পা চালিয়ে দিল। যেখান থেকে ওরা রোজ সাঁতার দিতে শুরু করে ঠিক সেইখানে গিয়ে সে হাজির হল।

ওপারের খেয়াঘাটের মৃদু আলো চোখে পড়লো। মাথার ওপর সে আর একবার তাকালো।

কৃষ্ণপক্ষের ঘন কালো আকাশে একটু একটু করে মেঘ জমেছে।

কিন্তু দরবেশ তাতে ভয় পাবে না। গামছা দিয়ে পুঁটলিটা ভালো করে কোমরের সঙ্গে জড়িয়ে নিলে। তাতে সাঁতার দেবার কোনো অসুবিধে হবে না।

একটু বাদেই 'জয় মা কালী' বলে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে।

সে শুধু একবার পেছন ফিরে দেখলে, গোটা বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসটা ঘুমের অতল তলে তলিয়ে আছে। শুধু সনাতনবাবুর ঘরে একটি মৃদু আলো জ্বলছে। ঠিক সেই সময় সনাতনবাবু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দূরবীনের ভেতর দিয়ে মসী-কালো নদীর জলের দিকে তাকিয়েছিলেন।

বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে চলেছে দরবেশ। নদী তার পরিচিত।

এই ত' কয়েক দিন আগেই এই নদীতে সাঁতার কেটে সে সবাইকে হারিয়ে দিয়ে প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে। নদীকে তার আদৌ ভয় নেই। তার ভয় হচ্ছে মসী-কৃষ্ণ অন্ধকারকে।

এই আঁধারের ভেতর সাঁতার কাটতে গিয়ে কোনো রকমে দিক-ভ্রম না হয় !

নদীর ওপারের খেয়াঘাটে যে মৃদু দীপটি জ্বলছিল, দরবেশ তাকে ধ্রুবতারার মতো মনে করে জোরে জোরে হাত চালাতে লাগল। সনাতনবাবু তখনো তাঁর জানালায় ঠায় দাঁড়িয়ে।

আরো দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে দরবেশ। নদীর মাঝামাঝি এসে সে উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু ওদিক থেকে আসছে কে ? এই অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে আড়াল করে একটি ছোট্ট লঞ্চ ধীরে ধীরে জল কেটে এগিয়ে আসছে।

দরবেশ দুই চোখ থেকে জল মুছে নিয়ে ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলো।

হুঁ ! আর ভুল নয়। সে ঠিক বুঝতে পেরেছে !

ওটা জল-পুলিশের লঞ্চ । দরবেশ আরও সাবধান হয়। তাহলে গুরুদেব ওর হাতে এমন জিনিস তুলে দিয়েছেন—যার সন্ধান করে ফিরছে জল-পুলিশের দল !

পরাধীন ভারতে যে একদল তরুণ—জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য মনে করে বিপদ-সঙ্কুল পথে এগিয়ে চলেছে, সে খবর দরবেশ রাখে।

আর সেই পথে পা বাড়াবার জন্যই ত' সেদিন গভীর রজনীতে মা কালীর সামনে দীক্ষা দিয়েছেন গুরুদেব।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন ! সে কিছুতেই কর্তব্যচ্যুত হবে না।

জল-পুলিশের দল কি তাকে দেখতে পেয়েছে ?

পুলিশের লঞ্চ এত আস্তে আস্তে আসছে যে, তার কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। লঞ্চ থেকে কোনো ভেঁপুও বাজছে না।

এক মুহূর্তে দরবেশ তার কর্তব্য স্থির করে ফেললে। তার পাশেই যাচ্ছিল একটি খড়-বোঝাই নৌকো।

দরবেশ দ্রুতবেগে হাত চালিয়ে সেই খড়ের নৌকোর আড়ালে আত্মগোপন করলো।

জল-পুলিশের লঞ্চ আর তাকে দেখতে পাবে না !

ওর ভাগ্যি ভালো বলতে হবে। খড়ের নৌকোটা ওপারের খেয়াঘাটের দিকেই চলেছে। এতে ওর ভালোই হল। কষ্ট করে সাঁতার কাটতে কিংবা হাত-পা চালনা করতে হল না। সে নৌকোর একটা আংটা ধরে চুপচাপ নিজেকে ভাসিয়ে রাখলো। নৌকোর সঙ্গে সঙ্গেই সে এগিয়ে চলতে লাগল খেয়াঘাটের দিকে।

খড়ের নৌকো ওর সহায়, বাতাসও তার অনুকূল। বিশেষ আর কোনো কষ্টই করতে হল না তাকে।

নৌকো যখন এসে খেয়াঘাটের কাছে নোঙর করলো, তখন সে অতি সহজেই পারের দিকে উঠে গেল। পেছনে তাকিয়ে দেখলে, জল-পুলিশের লঞ্চটা মাঝ নদীতেই কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে !

দরবেশের পা দু'টো উত্তেজনায় কেমন যেন কাঁপছিল। তবু সে একটুকু বিশ্রাম করলে না। নদীর ধারের কাদা ভেঙে এক রকম ছুট্ লাগাল—সেই বটগাছের উদ্দেশ্যে।

হ্যাঁ, তাই ত' ! একটা লোক আপাদ-মস্তক নিজেকে ঢেকে শুয়ে আছে !

সে মন্ত্র উচ্চারণের মতো মৃদু কণ্ঠে বললে....নির্মাল্য—নির্মাল্য—নির্মাল্য !!!

পাঁচ

সঙ্গে সঙ্গে যেন মন্ত্রের মতোই কাজ হল। পা থেকে মাথা অবধি ঢাকা দেওয়া সেই পাগলটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। তারপর ওর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল দরবেশের দিকে।

সনাতনবাবুর কথা বেশ মনে ছিল—কোনো কৌতূহল যেন মনে না জাগে।

তাই দরবেশ সেই অচেনা পাগলটার মুখের দিকে তাকাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলো না। অবশ্য চাইলেই কিছু দেখা যেতো না ! কেননা পাগলটা উঠে দাঁড়িয়েও চাদর দিয়ে তার মুখ ঢেকে রেখেছিল।

দরবেশও তাড়াতাড়ি তার কাজটা শেষ করে যেতে চায়। এতক্ষণ ধরে জলে সাঁতার কেটে আর খড়ের নৌকোর সঙ্গে ভেসে এসে ওর রীতিমত কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। কাজটা হয়ে গেলেই বোর্ডিং-এ ফিরে যেতে পারে।

তাই কোনো রকম কথা না বলে সে কোমর থেকে পুঁটলিটা খুলে নিয়ে পাগলের হাতে দিয়ে দিলে। পাগল এরই জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। পুঁটলিটা নিয়ে দ্রুতপদে দূরে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুঁটলিটা বেশ ভারীই ছিল। ওর ভেতর কি আছে কে জানে !

কিন্তু সনাতনবাবুর আদেশ—দরবেশ সেকথা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

সে এখন যা নিয়ে মাথা ঘামাবে—তা হচ্ছে ভিজে প্যাণ্টটা ছেড়ে ফেলে শুক্‌নো ধুতিটা পরা ! শুক্‌নো ধুতিটা সে বরাবর তার মাথায় পাগড়ীর মতো বেঁধে রেখেছিল। কাজেই একটু-আধটু জলের ছিটে লাগা ছাড়া সেটা ভিজতে পারে নি।

বটগাছটার আড়ালে গিয়ে সে শুকনো ধুতিটা পরে নিলে। তারপর ধীরে ধীরে খেয়াঘাটের দিকে রওনা হল।

এবার আর নদী সাঁতার নয়, খেয়া পার হয়েই সে বোর্ডিং-এ গিয়ে হাজির হতে পারবে।

পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে, ভোর হয়ে এসেছে—এখুনি সূর্যোদয় হবে। একটা মিষ্টি ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বইছে। সারারাত হৈ-চৈ করার পর ওর ভালোই লাগছিল।

যদিও ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল, তবু নদীর ধারের এই সুন্দর ভোর, এই শীতল সমীরণ, এই জবাফুলের মতো টকটকে লাল তরুণ তপনের আবির্ভাব—নতুন করে যেন তার মনে বিস্ময় জাগালো।

সে যুক্ত করে নবোদিত সূর্যকে নমস্কার করলো।

খেয়ার মাঝি তখনো খেয়া নৌকোয় গিয়ে ওঠেনি—নদীর ধারের একটি ছোট্ট খড়ো ঘরে বসে হুঁকোতে সুখটান দিচ্ছে। নৌকো ছাড়বার আগে ভালো করে একটু তামাক টেনে না নিলে দেহে মনে জোর পাবে কেন ?

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন ওপারের যাত্রী এসে খেয়াঘাটে জড় হয়েছে। তাদের এতটুকু সবুর সইছে না। ওরা মাঝিকে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে।

মাঝি এইবার হুঁকোতে শেষ টান দিয়ে ছোট ছেলেটার হাতে ওটা চালান করে দুর্গা-দুর্গা বলে নৌকো ছেড়ে দিলে।

সত্যি, সকালবেলাকার এই সুন্দর পরিবেশটি দরবেশকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। নদীর এই চলমান স্রোতধারা আর তার ওপর সকালবেলার রবির কিরণ এসে খেলা করছে....অবাক হয়ে সেই দিকেই সে তাকিয়েছিল। মনে হচ্ছিল বুঝি এর তুলনা নেই।

হঠাৎ তাদের খেয়া নৌকোর পাশেই একটি ষ্টীম লঞ্চের ভোঁ শুনে ওর মধুর স্বপ্নটা যেন আচমকা ভেঙে গেল।

চেয়ে দেখলে সেই জল-পুলিশের লঞ্চ। লঞ্চের ভেতর থেকেই একজন পুলিশের লোক মাঝিকে জিজ্ঞেস করলে, 'ওগো মাঝির পো, একটি লোককে পুঁটলি নিয়ে নদী সাঁতরে পার হতে দেখেছ ?'

মাঝি ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, 'না দারোগা সাহেব, দেখি নি ত' ! কেন, ডাকাতি-টাকাতি হয়েছে নাকি কোথায়ও ?'

পুলিশের লোক বললে, 'হয় নি। তবে হতে কতক্ষণ ? এ আবার যে-সে ডাকাত নয়, একেবারে স্বদেশী ডাকাত।'

শুনে দরবেশ চুপচাপ 'ষ্ট্যাচুর' মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো ; জল-পুলিশের দিকে তাকালো না পর্যন্ত।

লঞ্চ নিয়ে পুলিশের দল চলেই যাচ্ছিল—হঠাৎ ফিরে এসে হুমকি দিলে, 'মাঝি, তোমার নৌকো থামাও। আমরা খানাতল্লাসী করবো।'

মাঝি ভয়ে ভয়ে নৌকো থামিয়ে হাত জোড় করে বললে—এ আপনাদেরই রাজত্ব হুজুর। যা খুশী তাই করুন, আমি নৌকো থামিয়ে দিয়েছি।

একটি পুলিশ লাফিয়ে নৌকোর ওপর উঠে এলো। সে সবাইকার জামা-পকেট সব খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগল।

নৌকোর ওপর যারা ছিল অনেকেই ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিল। কেউ কেউ আবার পুলিশের ভয়ে ভ্যাক করে কেঁদেই ফেললো। এক বুড়ো বামুন ভিন্ গাঁয়ে যাচ্ছিলেন মেয়ের জন্যে পাত্র দেখতে। তিনি চোখ দু'টি কপালের উপর তুলে ক্রমাগত দুর্গানাম জপ করছিলেন ; বিড়-বিড় করে একবার শুধু বললেন, 'আজ না জানি কার মুখ দেখে সকালবেলা যাত্রা করেছিলাম। শেষকালে পুলিশের হাতে পড়ে হাজতবাস হবে নাকি ? ব্রাহ্মণের জাত-ধর্ম কিছুই আর রইলো না দেখছি।'

পুলিশের লোকটি রসিকতা করে টিপ্পনী কেটে বললে, 'ঠাকুর, তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি মিছামিছি কেঁদে মরছো কেন ? চুপচাপ নিজের জায়গায় বসে থাকো।

আরো খানিকক্ষণ খানাতল্লাসী করে, নৌকোর পাটাতনের তলাটা ভালো করে দেখে নিয়ে পুলিশের লোক লঞ্চ নিয়ে দূরে চলে গেল।

এবার সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বিক্রম দেখে কে ? তিনি সতেজে দাঁড়িয়ে উঠে হুমকি দিয়ে বললেন, 'হুঁ ! বিপদ অমনি হলেই হল ! আমি সব সময় গায়ত্রী জপ করছিলাম না ? এই ব্রাহ্মণ থাকতে কারো কোনো ভর-ডরের কারণ নেই !'

ব্রাহ্মণের আস্ফালন দেখে নৌকোসুদ্ধ লোক হেসে গড়িয়ে পড়লো।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তখন পৈতে বের করে সবাইকে অভিশাপ দিলেন, 'উচ্ছন্ন যাও সব— উচ্ছন্ন যাও ! কোথায় আমি সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম, তা এতটুকু কৃতজ্ঞতা-বোধ নেই !'

আবার আর এক পালা হাসির শব্দ শোনা গেল।

অবশেষে নৌকো এসে ঘাটে ভিড়লো।

দরবেশ তাকিয়ে দেখলে, সনাতনবাবু এসে খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন।

ওখান থেকে বাবুইবাসা বোর্ডিং অবশ্য বেশী দূর নয়।

নিঃশব্দে দরবেশ গিয়ে ঘাটে নামলো।

সনাতনবাবুর পেছন পেছন দরবেশ বোর্ডিং-এর দিকে রওনা হল।

পথে সনাতনবাবু কোনো কথাই জিজ্ঞেস করলেন না। এমন কি ওর মুখের দিকে পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলেন না। তবে ওইটুকু বুঝতে পারলেন, ওর ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল—সে কাজ সে নির্বিঘ্নে সমাধা করেছে।

সনাতনবাবু চুপচাপ গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন। দরবেশও নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করলো।

এইবার সনাতনবাবু বললেন, 'দুশ্চিন্তায় সারারাত ঘুমুতে পারি নি। কোনো বিপদ হয় নি ত' পথে ?'

দরবেশ যাওয়া-আসার সব কিছু ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলো। শুনে সনাতনবাবু খুব খুশী হলেন ; স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাও এইবার কিছু খেয়ে নিয়ে একটা লম্বা ঘুম লাগাও গে। আজ আর স্কুলে যেতে হবে না। আমি তোমার ক্লাসে খবর দিয়ে দেবো'খন।

তারপর হঠাৎ কি ভেবে বললেন, 'দাঁড়াও এক মিনিট, কাল সারারাত জলে কেটেছে—এই ওষুধটা এক ডোজ খেয়ে নাও।

ওষুধ খেয়ে দরবেশ নিজের ঘরে এসে লম্বা ঘুম লাগাল।

বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙতেই উঠে দেখে তার শরীরটা বেশ ঝর্‌ঝরে লাগছে। রাত্রি জাগরণের আর দীর্ঘক্ষণ সাঁতার কাটার কোনো গ্লানি নেই।

এই ঘটনার দিন সাতেক পরের কথা। সে রাত্রে যেমন ঝড়-বৃষ্টি, তেমনি মেঘ-গর্জন।

বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসের বোর্ডাররা মনে করেছিল—বুঝি গোটা আকাশটাই ফুটো হয়ে তোড়ে জল পড়ছে। সারা পৃথিবীটাকে বুঝি একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বাঁচবার আর কোনো আশা নেই !

এই দুর্যোগ মাথায় করে একটি মানুষ ছুটতে ছুটতে এসে বোর্ডিং হাউসের সদর দরজায় গিয়ে ঘন ঘন কড়া নাড়ছিল।

প্রথমে সবাই মনে করেছিল, বুঝি ঝড়ের দাপাদাপি। কিন্তু একই ভাবে যখন দীর্ঘকাল ধরে কড়া নাড়ার শব্দ সবাইকে সচকিত করে তুললো তখন একটি ছেলে দরজা খুলে দিলে।

ঝড়ের ঝাপটা ও বৃষ্টির তোড়ের সঙ্গে একটি মানুষ হুম্‌ড়ি খেয়ে ভেতরে এসে পড়লো।

সবাই শিউরে উঠে দেখলে, মানুষটি রক্তে একেবারে মাখামাখি।

ছেলেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালে; একটি ছেলে ছুটে গিয়ে তক্ষুণি সনাতনবাবুকে ডেকে নিয়ে এলো।

সনাতনবাবু এসেই সবাইকে সরিয়ে দিলেন। ওঁর নিজের শরীরে অসীম শক্তি। তাড়াতাড়ি আহত মানুষটিকে পাঁজাকোলো করে নিজের ঘরের ভেতর সেঁধিয়ে গেলেন। ছেলেদের ডেকে বললেন,' তোমরা যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। বোর্ডিং-এর সব আলো নিবিয়ে দাও।'

তারপর একটু থেমে খাটো গলায় বললেন, 'এই রাত্তিরে পুলিশ আসতে পারে। আমি না ডাকলে তোমরা কেউ ঘর থেকে বেরিও না।'

ছেলেরা যুদ্ধের সৈনিকের মতো যে যার ঘরের ভেতর ঢুকে, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু মন তাদের আতঙ্কে ও উত্তেজনায় ঘন ঘন আন্দোলিত হতে থাকলো।

ঝড়ের দাপট তখনো সমানভাবেই চলেছে। মনে হচ্ছে, বীর প্রভঞ্জন বুঝি গোটা বোর্ডিং হাউসটাকে দু'হাতে তুলে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে !

সনাতনবাবুর আদেশে সবাই বিছানায় শুয়ে পড়লো বটে, কিন্তু প্রবল উত্তেজনায় তাদের কারো চোখে ঘুম আসছিল না। ওরা কেবল বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছিল। মনে হচ্ছিল, বুঝি তাদের সবাইকার শয্যাকন্টক হয়েছে।

ইতিমধ্যে দরবেশও জেগে উঠেছিল। সে এই অশান্ত রাত্রে অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এই দাপাদাপিতে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু সনাতনবাবু ডেকে না পাঠালে ত' সে নিজে থেকে যেতে পারে না। তাই নিজের ঘরে অসহিষ্ণু হয়ে কেবলি পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল।

এমন সময় টক্-টক্ করে তার ঘরের দরজায় একটা শব্দ হল।

দরবেশ বুঝি এরই জন্যে উৎকীর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলে।

ওর অনুমান সত্যি।

স্বয়ং সনাতনবাবুই ওর দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে। ব্যস্তভাবে বললেন, ' সেবা করার অভ্যেস আছে ? তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে একবার এসো ত' দরবেশ !'

কোন কথা না বলে সে সনাতনবাবুর পেছনে পেছনে চলে গেল।

দরবেশ সনাতনবাবুর ঘরে ঢুকে দেখলে, শিক্‌কাবাব ইতিমধ্যেই সেখানে হাজির আছে। সেই মানুষটি রক্তে মাখামাখি হয়ে একটা খাটের ওপর পড়ে আছে।

সনাতনবাবু খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন বলে মনে হল।

দরবেশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ' শোনো দরবেশ, তুমি আর শিক্‌কাবাব আমাকে সাহায্য করবে। এই মানুষটিকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। ওঁর পায়ে পুলিশের গুলি লেগেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি নদী সাঁতরে পালিয়ে এসেছেন, আশ্রয়ের জন্য। বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসে আশ্রয় মিলবে, সে-কথা ওঁর অজানা নয়। কিন্তু শুধু আশ্রয় দিলেই ত' হবে না। পা থেকে ওই গুলি বের করে ওর প্রাণ বাঁচাতে হবে। তারপর ওঁর নিরাপত্তার কথাও আমাদের ভাবতে হবে। শিকারী কুকুরের মতো পুলিশ ওঁর পিছু নিয়েছে। আর এক মুহূর্তও আমাদের নষ্ট করবার উপায় নেই।

ক্ষিপ্রগতিতে সনাতনবাবু আলমারী থেকে অপারেশনের যন্ত্রপাতি বের করে ফেললেন।

তবে কি সনাতনবাবু আসলে ডাক্তার ! বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের মুখোশ পরে এইখানে সজাগ প্রহরীর মতো দিনযাপন করছেন ?

দরবেশের মনে এই কথাগুলো জাগলো। শিক্‌কাবাবকে দেখেও মনে হল —এই

জাতীয় কাজ সে এর আগে বহুবার করেছে। সে শিক্ষিত নার্সের মতো সনাতনবাবুকে সাহায্য করতে লাগলো।

লোকটির ডান পা থেকে দু'টি গুলি অতি কৌশলে সনাতনবাবু বের করে ফেললেন। এই কাটা-ছেঁড়ার সময় মানুষটি এতটুকু উঃ-আঃ শব্দ করলেন না ! শুধু চোখ বুজে মরার মতো পড়ে রইলেন।

অপারেশন হয়ে গেলে শুধু অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, 'আমার বুক-পকেটে কতকগুলো জরুরী কাগজ-পত্র আছে, আর কোমরে বাধা আছে 'বন্ধু'। দু'টোই শীগ্‌গির সরিয়ে ফেলো'—

সনাতনবাবু পকেট থেকে কাগজ-পত্র আর কোমর থেকে একটি রিভলভার বের করে চোখের নিমেষে কোথায় যেন লুকিয়ে ফেললেন।

একটু পরেই সদর দরজায় সোরগোল ও করাঘাতের শব্দ শোনা গেল।

ইতিমধ্যে সনাতনবাবু নিপুণ হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে ফেলেছেন।

শিক্‌কাবাব ও দরবেশের দিকে তাকিয়ে তিনি খাটো গলায় বললেন, 'হুঁশিয়ার !—দরজায় পুলিশ !'

ছয়

কোনো বিপদের সম্ভাবনা হলে সনাতনবাবু একেবারে ক্ষিপ্রগতি। তখন দেখে মনেও হয় না—এই মানুষটি আবার আরাম করে চক্ষু মুদে গড়গড়ায় সুখটান দিতে থাকেন !

এক পলকের মধ্যে তিনি চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন ; তারপর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছেলেকে ডেকে কাজ ভাগ করে দিলেন।

একজন মেঝেতে-পড়া ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত মুছে ফেলবে। একজন অপারেশনের যন্ত্রপাতি লুকিয়ে ফেলবে, আর চারজন তাঁকে সাহায্য করবে—আহত সেই ভদ্রলোককে চট্ করে কোনো জায়গায় লুকিয়ে ফেলবে।

এই কাজটি বড় সহজসাধ্য ছিল না। একটি জলজ্যান্ত মানুষকে কি করে লুকিয়ে ফেলা যায় ? তাছাড়া এটি হচ্ছে ছেলেদের বোর্ডিং।

একটি বয়স্ক মানুষকে কিভাবে সাময়িকভাবে লুকিয়ে রাখা যায় ? তাছাড়া এই মাত্র সেই ভদ্রলোকের অপারেশন হয়ে গেল। পুলিশ যখন এসে পৌঁছেছে তখন খানাতল্লাসী নিশ্চয়ই হবে। মানুষটিকে দেখলে তার অপারেশনও চোখে পড়বে। তখন উপায় ?

সনাতনবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, 'হুঁ' ! উপায় একটা বের করেছি। তোমরা খুব সাবধানে ওঁকে তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।

দরবেশরা সবাই দুরু-দুরু বক্ষে আহত ভদ্রলোককে নিয়ে নিঃশব্দে সনাতনবাবুর অনুসরণ করলো।

কি উপায় তিনি আবিষ্কার করেছেন, সে-কথা ছেলেরা কেউ বুঝতে পারলো না ; তাই হতচকিত হয়ে ওরই মধ্যে বিভ্রান্তভাবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

অবশেষে সনাতনবাবু সবাইকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন বোর্ডিং হাউসের একেবারে পেছন দিকে। সেখানে একটি গোয়ালঘর আছে। কয়েকটি গাই সেই গোয়ালঘরে আশ্রয় লাভ করে দিব্যি জাবর কাটছিল। এরাই ছেলেদের খাঁটি দুধ সরবরাহ করে স্বাস্থ্যলাভে সাহায্য করে।

সেই গোয়ালঘরের মাথার ওপরে দেড়তলা মত একটি মাচান আছে। সেখানে গাদা করে খড় রাখা হয়। পাছে গরুর খাদ্য এই খড়গুলো বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে যায়—তাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেড়তলাতে ওঠার জন্য একটি বাঁশের মই ছিল। সনাতনবাবু নিজেই আগে তর্‌তর্‌ করে ওপরে উঠে গেলেন। তারপর ছেলেদের সাহায্যে আহত মানুষটিকে সেই মাচানের ওপর তুলে—খড় দিয়ে এমনভাবে ঢাকা দিয়ে দিলেন যে, বাইরে থেকে বিন্দুমাত্র টের পাওয়া না যায়। ওখানে একটি ঘুলঘুলি ছিল। তাই হাওয়া চলাচলেরও কিছুমাত্র অসুবিধে ছিল না। কিছু খড় এমনভাবে ভদ্রলোকের মুখের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল—যাতে তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো কষ্ট না হয়।

খুব তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থা করে সনাতনবাবু মই দিয়ে নীচে নেমে এলেন। তারপর শিক্কাবাবকে বললেন, 'তুই এক কাজ কর। গোয়ালঘরের পেছনেই মানকচুর জঙ্গল আছে। এই মইটা সেখানে লুকিয়ে রেখে, চট্‌পট্‌ সবাইকে নিয়ে নিজ নিজ ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। ওদিকটা আমি দেখছি।

এই বলে সনাতনবাবু সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে রাতের অনাহূত অতিথি পুলিশের করাঘাত তখনো শোনা যাচ্ছিল।

সদর দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই একদল পুলিশ আর তার পেছনে দারোগা সাহেব হুড়মুড় করে বোর্ডিং-এর ভেতর ঢুকে পড়লেন।

দারোগা সাহেব চটে আগুন।

সনাতনবাবুকে সামনে দেখতে পেয়ে চোখ গরম করে বললেন, 'আপনার ত' মশাই আচ্ছা ঘুম ! এত দরজা ধাক্কাচ্ছি আর হাঁকডাক করছি। আপনি কি কিছুই শুনতে পান নি ?'

সনাতনবাবু যেন এই মাত্র আরামের ঘুম থেকে উঠেছেন—সেই রকম ভাব দেখিয়ে প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে, চোখ দু'টো কচলে, উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে মশাই, সেইটেই ত স্বাভাবিক। সারাদিন খাটুনির পর ঘুমিয়ে পড়লে আমায় ডেকে তোলাও যা আর ওই আপনাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করাও তা !'

দারোগা সাহেব ঠিক আগের মতোই গরম মেজাজে জবাব দিলেন, ' দেখুন মশাই, দুপুর রাতে আপনার সঙ্গে রসিকতা করতে আসিনি।'

সনাতনবাবু যেন বোকা মানুষ—ঠিক এমনভাবে খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে, আর একটা লম্বা হাই তুলে বললেন, 'আজ্ঞে আপনি যে আমার শ্বশুরবাড়ির কেউ নন, তা' ত আপনার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি ! রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে রসিকতা করতে পারে একমাত্র শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই।'

'থামুন !' হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন দারোগা সাহেব, 'এই বোর্ডিং এক্ষুণি খানাতল্লাসী করা হবে।'

সামনে যেন বাঘ দেখেছেন—ঠিক এমনিভাবে লাফিয়ে উঠলেন বোর্ডিং হাউসের সুপারী-লণ্ঠনবাবু, 'কি ব্যাপার বলুন ত'? ছেলেরা সব ঘুমোচ্ছে। এই সময়ে তাদের ডেকে তোলা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক সন্দেহ নেই।'

একান্ত অসহায়ের মতো মুখভঙ্গী করে নিতান্ত নিরুপায় ছেলেদের অভিভাবক সনাতনবাবু বললেন, 'আচ্ছা, সকাল হলে খানাতল্লাসী করা চলে না ?'

দারোগা সাহেব আবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'না না, এক্ষুণি খানাতল্লাসী করতে হবে। আমার সঙ্গে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। দেখতে চান ?'

সনাতনবাবু আবার অসহায়ের ভঙ্গী করে উত্তর দিলেন, 'না না, দেখে আর কি হবে ? আপনি মুখে যখন বলেছেন, সেই কথাই যথেষ্ট।'

তারপর হঠাৎ হাঁকডাক দিতে শুরু করলেন, 'ওরে লেণ্ডী—ভেণ্ডী—গেণ্ডী—তোরা সব ওঠ, আজ বোর্ডিং-এ কুটুম এসে গেছে। কত ঘুমুবি তোরা ?'

দারোগা সাহেব ধমক দিয়ে উঠলেন, 'থামুন ! ওই রকম ষাঁড়ের মতো চিৎকার করে সবাইকে আপনি সাবধান করে দিচ্ছেন। এইটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার ঘটে আছে। একটি কথাও কইবেন না। আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন। আগে কোনো ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করবেন না।'

দারোগা সাহেব ভারী বুটের শব্দ করে সদলবলে ঘরে ঢুকে পড়লেন। তারপর যেভাবে খানাতল্লাসী শুরু করলেন, তা দেখে মনে হল না যে, ওঁর নিজের বাড়িতে কোনো ছেলেপুলে বাস করে—তারা লেখাপড়া করে কিংবা নিজেদের জিনিস-পত্র গুছিয়ে রাখে।

বই-পত্তর ছড়িয়ে, জামাকাপড় লাট করে, তোষক বালিশ ছিঁড়ে যেন মুহূর্ত মধ্যে

এক দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার শুরু হয়ে গেল ! কিন্তু কোনো ঘরেই আপত্তিজনক কিছু পাওয়া গেল না। কোনো হদিসই মিললো না সেই ভদ্রলোকের।

দারোগা সাহেব সব কিছু অনুসন্ধান করে একবার গোয়াল-ঘরেও ঢুকেছিলেন ; কিন্তু মই নেই—তাই ওপরে ওঠার কথা মনে জাগে নি। তাছাড়া হয়ত ভাবলেন, একগাদা গরুর খাদ্য খড় ঠাসা। ওখানে আর কি থাকতে পারে ?

দারোগা সাহেব যখন গোয়ালঘরে ঢুকলেন, তখন ছেলেদের বুক দুরুদুরু করে কাঁপতে লাগলো। কিন্তু সনাতনবাবু একেবারে নির্বিকার। তাঁর মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হল—তিনি আশেপাশের কথা কিছুই ভাবছেন না !

গম্ভীর গলায় দারোগা সাহেব মন্তব্য করলেন, 'নাঃ, এখানে দেখবার কিছু নেই।'

তখন ছেলের দল হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

অবশেষে রান্নাঘর, খাবার ঘর, পায়খানা দেখার পর্বও মিটলো। তাতেও খুশী হলেন না দারোগা সাহেব। দু'টি পাহারাওয়ালাকে কুয়োর মধ্যে নামিয়ে দিলেন। সেখানে যদি কেউ ঘাপটি মেরে থাকে !

নাঃ, ওখানেও কোনো মানুষের সন্ধান পাওয়া গেল না।

তখন হতাশ হৃদয়ে দারোগা সাহেব দলবল নিয়ে একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে প্রস্থান করলেন। যাবার আগে একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, 'আমি আবার আসবো।'

সনাতনবাবু ঘাড় কাত করে, হাত দু'টি কচলে উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয় স্যার—নিশ্চয়। তবে আগে থেকে একটু খবর দিয়ে এলে ভালো হয়।'

দারোগা সাহেব চটে উঠে বললেন, 'কেন? কেন? খবর দিয়ে আসবো কেন ?'

বিনয়ে বিগলিত হয়ে সনাতনবাবু উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে, সময়মতো সংবাদ পেলে হুজুরের জন্য ঠিকমতো জলখাবারের ব্যবস্থা করে রাখতে পারি। দুপুর রাতে সে জিনিসটি কোথায় পাওয়া যাবে বলুন ?'

'হুম!'

বাঘের মতো একটা শব্দ করে দারোগা সাহেব বোর্ডিং হাউস থেকে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গের দলও তাঁকে অনুসরণ করল।

এইবার সনাতনবাবু নিজের দেহটা একটা চেয়ারের ওপর এলিয়ে দিয়ে পুলকিতকণ্ঠে বললেন, 'ওরে দরবেশ, ওরে শিক্‌কাবাব, এই সময় কয়েক কাপ চা তৈরি কর দেখি। শেষ রাত্তিরের ঠাণ্ডা আমেজে গরম চা বেশ ভালোই লাগবে। কি বলিস্‌ তোরা ?'

আরাম করে সকলে চা খাওয়ার পর সেই আহত মানুষটির কথা মনে পড়লো সবাইকার।

সনাতনবাবু বললেন, 'ইচ্ছে করেই আমি এতক্ষণ ওদিক পানে তাকাই নি। কি জানি কিছু ত' বলা যায় না ! নন্দী-ভৃঙ্গীর দলের কেউ উঁকি মেরে দেখছে কি না ! দরবেশ, তুই একবার বাইরেটা ঘুরে দেখে আয়। আমাদের কুটুমদের কেউ ঘাপটি মেরে নেই ত' কোথাও ? তারপর নিশ্চিন্তমনে মানকচুর জঙ্গল থেকে মইটা উদ্ধার করা যাবে।'

সেই আহত মানুষটি দুই দিনের মধ্যেই সারা বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর অন্তর জয় করে নিলেন। তাঁর আসল নাম জানবার উপায় ছিল না। সনাতনবাবু আসল নাম জানান নি। কারো জিজ্ঞেস করবার কিংবা কৌতূহলী হবার নিয়ম নয়। কিন্তু তিনি হয়ে উঠলেন সবারকার 'জীবনদা'। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে তিনি জীবন ফিরে পেয়েছেন বলেই হয়ত তাঁর নতুন নামকরণ হল 'জীবন'।

এই জীবনদার মধ্যেই বোর্ডিং-এর ছেলেরা যেন জীবনের স্ফুলিঙ্গ খুঁজে পেলো !

এত কঠোর....কিন্তু এত কোমল ! কয়েকজন বাছাই-করা ছেলের ওপর সেবা-শুশ্রূষার ভার পড়েছিল। তার ভেতর শিক্‌কাবাব আর দরবেশও ছিল। বয়সে খুব ছোট বলে দরবেশ জীবনদার খুব প্রিয়পাত্র হতে পেরেছিল।

সবাইকার জন্য সন্ধ্যেবেলাটা জীবনদার ঘর একেবারে অবারিত ছিল। এই সময় প্রতিদিন ছেলেদের কাছে তিনি নানা গল্প বলতেন। সেই গল্প বলার ধরন ছিল একেবারে আলাদা।

কথকের সঙ্গে এতগুলো শিশুচিত্ত যেন সারা দুনিয়ায় ভ্রমণ করে বেড়াতো।

ছেলেদের কাছে জীবনদা ছিলেন একটি জ্যান্ত-বিশ্বকোষ অথবা 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' ! কত বিষয়ে যে তিনি গল্প করতেন, তার কোনো বাঁধাধরা হিসেব ছিল না। কখনো দেশ-বিদেশের ইতিহাস, কখনো আবিষ্কারের গল্প, কখনো স্বাধীনতার যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা, আবার ভূতের গল্প, জন্তু-জানোয়ারের গল্প, শিকারের গল্প, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের কাহিনী—জীবনদা যেন এতগুলো ছেলের মন নিয়ে একেবারে ছিনিমিনি খেলতেন।

কখনো তাদের নিয়ে উধাও হতেন অসীম আকাশে—কখনো চলে যেতেন একেবারে সমুদ্রের তলায় ! আবার কখনো গভীর জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারের পেছনে পেছনে চলতো নৈশ অভিযান ! নানা দেশের পতন ও অভ্যুত্থানের কাহিনী, বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কার, আবার নানা রকম লোক-সঙ্গীত সব যেন ছিল তাঁর একেবারে কণ্ঠস্থ।

ছেলেদের মনে অনেক সময় প্রশ্ন জাগতো—একটি মানুষ এত কথা জানলেন কি করে ? ছোটদের পরীক্ষার পড়া তিনি মুখে মুখে শিখিয়ে দিতেন। যে যে বিষয়ে

কাঁচা তাকে সেই সম্পর্কে তালিম দিয়ে এমনভাবে তৈরি করে দিতেন যে, সেরা নম্বর পেয়ে সে সকলকে অবাক করে দিত !

এরই মধ্যে ছেলেদের অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষায় জীবনদা একেবারে ভালো হয়ে গেলেন।

ছেলেদের মধ্যে কানাকানি শোনা গেল যে, জীবনদা এইবার বাবুইবাসা বোর্ডিং থেকে ছুটি নিয়ে অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়িয়ে দেবেন।

শুনে সবাইকার মন খারাপ হয়ে গেল—জীবনদা না হলে তাদের সন্ধ্যেবেলাটা কাটবে কি করে ?

সেদিন গল্পের আসরে তখনো কেউ এসে হাজির হয় নি। এক পা, দু'পা করে দরবেশ শুকনো মুখে এসে জীবনদার ঘরে উপস্থিত হল।

দরবেশ কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে, 'জীবনদা, তুমি নাকি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে ? এ জানলে তোমাকে এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই ভালো করে তুলতাম না।'

শুনে জীবনদা হো-হো করে হেসে উঠলেন ; বললেন, 'শোন্ দরবেশ, আমি যাবার আগে তোকে একটি জিনিস শিখিয়ে দেবো। সনাতনদার অনুমতি পাওয়া গেছে।'

আকুল আগ্রহ দরবেশের মুখে-চোখে। জিজ্ঞেস করলে, 'কি আমায় শেখাবে জীবনদা ?'

জীবনদা তার কানে কানে বললেন, 'কাউকে বলিস্ নি যেন। কাল জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তোকে রিভলবার ছোঁড়া শিখিয়ে দেবো।'

—অ্যাঁ ! রিভলবার !'

দরবেশের সমস্ত দেহে-মনে যেন বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। যা একবার সাঁতরে বয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ হয়েছিল তার, সেই রিভলবার হাতে তুলে নিতে পারবে। কি করে ছুঁড়তে হয় শিখিয়ে দেবেন জীবনদা !

দরবেশের মনে হল—সে যেন এক নতুন জীবনের সন্ধান পাচ্ছে! জিজ্ঞেস করলে, 'কাল কখন শেখাবে জীবনদা ?'

দেখা গেল জীবনদা মিটিমিটি হাসছেন। চুপিচুপি বললেন, 'কাউকে আবার বলে ফেলিস্ নি যেন। কাল তুই ইস্কুলে যাসনে। দুপুরবেলা জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে শিখিয়ে দেবো।'

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই। কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সে স্বপ্ন দেখছে, মহাদেবের পাশুপত অস্ত্র যেন সে হাতে পেয়েছে।

সে এখন বিশ্বজয় করতে পারে।

সাত

দরবেশ নদীর ধারে ঘাসের গালিচার ওপর বসে গালে হাত রেখে চুপচাপ কত কি ভাবছিল।

আজ কয়েক মাস হয়ে গেল, জীবনদা তাকে ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান দিয়ে সেই যে গা-ঢাকা দিয়েছিল, আর তাঁর কোনো খোঁজ-খবর নেই।

যাঁরা মাতৃভূমির মুক্তির কথা ভেবে নিজের আরামের শয্যা ছেড়েছেন, তাঁরা বুঝি এমনিই হন। স্নেহ-মায়া-মমতা দিয়ে তাঁরা নিজেকে কোথাও বেঁধে রাখতে পারেন না। দেশের কোন্ অঞ্চলে জীবনদা আত্মগোপন করে আছেন, তা তাদের জানবার কোনো উপায় নেই।

জীবনদা এখান থেকে গিয়ে অবধি তাদের কাছে কোনো চিঠি-পত্রও লেখেন নি। হয়ত এই-ই নিয়ম। চিঠি-পত্র লেখা একেবারে বারণ। পাছে এই চিঠির সূত্র ধরে পুলিশ কোনো সন্ধান পায়—তাই বোধ করি সকল দিক ভেবে-চিন্তে এই সাবধানতা!

যাবার আগে জীবনদা দরবেশকে আগ্নেয়াস্ত্র দীক্ষা দেবার সময় বলেছিলেন, একটা বিদ্যা তোকে শিক্ষা দিয়ে গেলাম ; কিন্তু অকারণে যেন কোনো মতেই এর ব্যবহার না হয়। যখন সত্যিকারের নেতার কাছ থেকে নির্দেশ আসবে, তখনই এর প্রয়োজন হবে। আমি কামনা করি, তোর জীবনে তার প্রয়োজন যেন কোনো দিনই না হয়।

নদীর জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল দরবেশ। জলধারা কেবলি বয়ে চলেছিল। তাঁর যেমন বিরাম ছিল না, তেমনি দরবেশের ছোট্ট মগজে নানারকম ভাবনার ঢেউ কেবলি ওঠা-পড়া করছিল।

হঠাৎ তার সামনে একটি ভিখারীকে দাঁড়াতে দেখে সে মুখ ফেরাল। পকেটে কি আছে তাই খুঁজতে যাচ্ছিল। তারপর আচম্‌কা ভিখারীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে আর আনন্দের সে চিৎকার করে উঠলো, 'এ কি ! জীবনদা ?'

সঙ্গে সঙ্গে জীবনদা তাঁর ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে বললেন, 'চুপ ! আয় আমার সঙ্গে।'

দু'জনে নিরিবিলি একটা গাছতলায় গিয়ে বসলো। সেখানে লোকজন কেউ নেই।

দরবেশের মনভরা রাশি রাশি কথা। কোন্‌টা আগে আর কোন্‌টা পরে জিজ্ঞেস করবে—সে ভেবে ঠাওর করতে পারে না। শুধু মৃদুস্বরে শুধোলে, 'এতদিন কোথায় ছিলে জীবনদা ?'

জীবনদা মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, 'এক জায়গায় কি আর ছিলাম রে বোক্‌চন্দর ! সাত ঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে হয় আমাদের। আজকে একটা খুব

জরুরী কাজে তোর কাছে এসেছি। ভেবে-চিন্তে জবাব দিস্ ! তুই যদি রাজী থাকিস্ তবেই সনাতনদার কাছে অনুমতি নেবো।'

দরবেশ এইবার হেসে ফেললে ; বললে, 'আচ্ছা জীবনদা, তোমার কি মনে হয় আমি সত্যি কাজের লোক ? আমার কথা তোমার মনে ছিল ? এই খানিকক্ষণ আগেই আমি ভাবছিলাম, তুমি হয়ত আমাদের কথা একেবারে ভুলেই গেছ !'

জীবনদা ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে উত্তর করলেন, 'না রে, কিছুই আমি ভুলি নি। কারো মুখ আমার মন থেকে মুছে যায় না। নইলে এতদিন বাদে আবার ভিখিরী সেজে তোর কাছে আসবো কেন ? দরবেশকে কি কেউ কখনো ভুলতে পারে ? ভারী মজার খাবার এই দরবেশ !'

জীবনদার কথা শুনে দরবেশ যেন একেবারে গলে গেল। তা'হলে সেও একটা কাজের মানুষ হয়ে উঠেছে ! তারই জন্য জীবনদা ছদ্মবেশে এতদূর ছুটে এসেছেন ?

জীবনদা দরবেশের মাথায় একবার শুধু হাতটা বুলিয়ে দিলেন।

দরবেশ একটুখানি চুপচাপ থেকে জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা জীবনদা, কাজটা কি, এখনো ত' তুমি বললে না ?'

জীবনদা জবাব দিলেন, 'কাজটা সত্যিই একটু শক্ত। তাই বলতে আমি ইতস্ততঃ করছি।'

দরবেশ বললে, ' তোমার কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ নেই। সত্যিকারের দেশের স্বাধীনতার জন্য যে কাজ, তা যত শক্তই হোক—আমি করবো।'

জীবনদার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি দরবেশকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোর কাছ থেকে আমি এই জাতীয় উত্তরই আশা করেছিলাম রে দরবেশ !'

তারপর গলা আর একটু খাটো করে বললেন, ' দেখ, তুই ছোট্টটি আছিস্। তোকে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। এক পুলিশ অফিসারের বাড়িতে তোকে ছোক্‌রা চাকর হয়ে থাকতে হবে ! তারপর সুযোগ বুঝে কতকগুলো জরুরী কাগজ-পত্র সরিয়ে নিয়ে পালাতে হবে। সে সব আমি তোকে সময় মতো শিখিয়ে দেবো। এখন আগে বল, তুই এই কাজটা করতে পারবি কি না ?'

লাফিয়ে উঠে দরবেশ বললে, 'পারবো না মানে ? ছোটবেলায় ত' আমি যাত্রা দলে কেষ্ট সেজেছি। আর এই সহজ কাজটা পারবো না ? যে কেষ্ট সাজতে পারে, চাকর সাজতেও তার আটকায় না।'

জীবনদা ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'সাবাস্ ! আমি জানতাম তুই রাজী হবি। তাই ভিখারী সেজে এতদূর চলে এসেছি। এখন তুই বোর্ডিং-এ চলে যা। আমার কথা কিছু বলিস্ না। আমি একটু বেশী রাত্তিরে গিয়ে সনাতনদার অনুমতি চেয়ে নেবো।'

জীবনদার কথা শুনে দরবেশ মহা খুশী। সে হাসিমুখে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ চলে এলো।

অনেক রাত্তিরে দরজার খটখট আওয়াজ পেয়ে দরবেশের ঘুম ভেঙে গেল। শোনা গেল, সবাইকে সনাতনবাবু তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন।

চোখে মুখে জল দিয়ে সব ছাত্র গিয়ে চুপিচুপি সনাতনবাবুর ঘরে হাজির হল। এ রকম ডাক তাদের হামেশাই পড়ে। তাই কেউ অবাক হল না। কিন্তু দরবেশের মনে নানা চিন্তা। সনাতনবাবু সবাইকে ডাকছেন কেন ? তবে কি তাকে তিনি অনুমতি দেন নি ? জীবনদার কাছে বড় গলায় সে বলে এসেছিল যে চাকর হয়ে থাকতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই ! তা'হলে কি সব ভেস্তে গেল ?

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সেও এক কোণে গিয়ে বসে পড়লো।

জীবনদাকে দেখে বোর্ডিংসুদ্ধ ছাত্র খুশী হয়ে উঠলো। কিন্তু উল্লাস প্রকাশ করবার সুযোগ তারা পেলে না। সোজা দাঁড়িয়ে উঠে সনাতনবাবু বললেন, ' কেউ একটা কথাও বলবে না। এখন আমাদের জরুরী আলোচনা আছে।'

ছেলেদের মুখগুলো প্রদীপের মতোই জ্বলে উঠেছিল। কে যেন ফুঁ দিয়ে সেই আলোগুলো নিবিয়ে দিলে !

সনাতনবাবু বললেন, ' তোমাদের মধ্যে কে কষ্ট স্বীকার করতে রাজী আছ হাত তোলো।

সবগুলো হাত একসঙ্গে উঠে এলো।

তারপর সনাতনবাবু আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, ' কে চাকর হয়ে একটা বাড়ির কাজ করতে রাজী আছ ? দরকার হলে লাথি-ঝাঁটা সহ্য করতে হবে।'

এইবার কারো মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় না। সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকায়।

ডানপিটে ছেলে এখানে অনেক আছে। আবার ভালো অভিনয় করতে পারে এমন ছেলেরও অভাব নেই। কিন্তু বোর্ডিং ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে চাকর হয়ে থাকতে হবে—এ কাজটা মোটেই সুবিধের নয়। একদিনের অভিনয় হলে অনেকেই আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে যেত। কিন্তু একেবারে চাকর হয়ে থাকা,—কত দিনের জন্য কে জানে ! তা ছাড়া বাড়ির ভয় সকলেরই আছে !

সনাতনবাবু তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে তোমরা কেউ রাজী নও ? তোমাদের জীবনদা বড় মুখ করে এসেছেন। তাঁকে কি তোমরা ফিরিয়ে দেবে ?'

এইবার দরবেশ উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলে, 'আমি রাজী আছি !'

সনাতনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি অনেক দিন চাকর হয়ে থাকতে হয়—তা হলে ?'

দরবেশ বললে, 'তাতেও আমার কোনোরকম আপত্তি নেই।'

সব চাইতে মজার ব্যাপার জীবনদা আর একটি কথাও জিজ্ঞেস করলেন না। দরবেশের হাত ধরে সেই নিশীথ রাত্রে—সূচীভেদ্য অন্ধকারে বোর্ডিং থেকে যেন হারিয়ে গেলেন। দরবেশ তার ঘরে গিয়ে আর একটি জিনিসও গুছিয়ে আনবার সুযোগ পেল না।

নীরবে জীবনদা ওর হাত ধরে পথ চলতে লাগলেন। মনে হল—সারা পৃথিবীতে কেউ কোথাও জেগে নেই। মাথার ওপর তারায় ভরা আকাশ, আর নীচে ঘন কালো অন্ধকার। এ-পথেরও বুঝি আর শেষ নেই !

জীবনদা শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন, ' তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, না রে ?

দরবেশ তাড়াতাড়ি জবাব দিলে, 'না না, তোমার সঙ্গে যাচ্ছি তার আবার কষ্ট কি ?'

আরো অনেকটা পথ চলবার পর, জীবনদা ওর হাত ধরে ঢালু নদীর পথে নেমে গেলেন। সেখানে একটি ঝোপের ভেতর একটি ছৈ-ওয়ালা নৌকো অপেক্ষা করছে।

জীবনদা দরবেশের হাত ধরে চুপিচুপি সেই নৌকোয় গিয়ে উঠলেন।

নৌকোর মাঝি বললে, 'কর্তা, আপনার কথামতো সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

নৌকোর ভেতর গরম গরম খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা তৈরি। দরবেশ তাই খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো, তারপর একবারে অঘোরে ঘুমোতে লাগলো।

যখন ওর ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। কিন্তু নৌকো চলার এতটুকু বিরাম নেই। চোখ কচলে উঠে বসলো দরবেশ।

কিন্তু জীবনদা কোথায় ? তার বদলে ওর শিয়রের কাছে বসে একটি হিন্দুস্থানী লোক হাতের তালুতে খৈনী টিপছে। লোকটি বল্‌লে, 'উঠ গিয়া বেটা ? আভি তোম্‌কো কাম্‌মে লৌটা দেঙ্গে'—

দরবেশ অবাক হয়ে দেখলে জীবনদা ভিখিরীর কাপড় ছেড়ে হিন্দুস্থানীর ভেক্ ধরে বসে আছেন !

একটু বাদেই নৌকো গিয়ে একটি ঘাটে ভিড়লো। জীবনদা তাকে সরাসরি একটি বাড়িতে নিয়ে হাঁক দিলেন, 'মাইজি, আপ্‌কা একঠো বাঙালী লেড়কাকো জরুরৎ থা, হাম উস্‌কো লে আয়া !'

হাঁক শুনে একটি মহিলা উঠোনে বেরিয়ে এলেন ; বললেন, 'এনেছিস্ বাবা ? বাঁচিয়েছিস্। তা ওর নাম কি রে ?'

মহিলার কথা শুনে, দরবেশ হক্‌চকিয়ে হিন্দুস্থানী-রূপী জীবনদার মুখের দিকে তাকালো।

জীবনদা হো-হো করে হেসে উঠে জবাব দিলেন, 'মাইজি, উস্‌কো নাম হ্যায় রতন।'

আট

বাড়ির গিন্নী আদর করেই রতনকে ঘরে ডেকে নিলেন। বললেন, 'মন লাগিয়ে যদি থাকিস্ তবে সব পাবি। নতুন ধুতি কিনে দেবো, গেঞ্জি দেবো, গামছা পাবি। চুল ছাঁটাইয়ের পয়সা পাবি। তা ছাড়া চাকরের শোবার আলাদা কম্বল বালিশ ত' আমাদের রয়েছেই। খেতে দেবো সমানে-সমানে। আমরা যা খাবো, তোকেও তাই খেতে দেবো। কোনো তফাৎ করবো না আমি। তবে একটা কথা আছে রতন'—

এইসব বলে গিন্নিমা একটু থামলেন। চারিদিকে তাকিয়ে বেশ একটু খাটো গলায় বললেন, 'আমাদের কর্তা একটু রাগী মানুষ কি না, চড়-চাপড়টা হয়ত দিয়ে বসবেন কখনো কখনো। তা কিছু মনে করিস্ নে বাবা রতন। মনে করিস্ তোর বাবা যেন একটু শাসন করছে।'

তারপর আর একটা ঢোক গিলে গিন্নী বললেন, 'সেজন্য তুই দুঃখ করিস্ নে রতন। আমি তোকে ঠিক পুষিয়ে দেবো।'

গিন্নীর কথা শুনে রতন অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আরো একটু গলাটাকে খাটো করে গিন্নীমা ওর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'যেদিন চড়-চাপড় মারবে, আমি তোকে একটি আধুলি দেবো। আর যেদিন তোর দিকে কাপ কি গেলাস ছুঁড়ে মেরে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে বসবে, আমি পুরো একটা টাকাই তোর হাতে তুলে দেবো। আমি তোর মায়ের মতো। এই আমি তোর গা ছুঁয়ে বলছি—একটু ক্ষমা-ঘেন্না করে সয়ে যাস্ রতন। নইলে আমার আর কোনো উপায় নেই।'

অসহায়ের মতো বাড়ির গিন্নী রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাড়ির গিন্নীর মুখে মনিবের বিবরণ শুনে রতন হাসবে কি কাঁদবে ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না। এই যদি তার রোজকার কাজের নমুনা হয়, তাহলে সে কত দিন ধৈর্য ধরে এখানে টিকে থাকতে পারবে সে-কথা জোর করে বলা শক্ত !

কিন্তু জীবনদাকে সে কথা দিয়ে এসেছে। চট্ করে চলে যেতেও ত' পারবে না। যে উদ্দেশ্যে জীবনদা তাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সেই কাজ হাসিল না করতে পারলে যে জীবনদার কাছে, সনাতনবাবুর কাছে, আর বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছেলেদের কাছে একেবারে ছোট হয়ে যাবে।

তাই কষ্ট স্বীকার করেও তাকে লেগে থাকতে হবে। একবার এগিয়ে এসে পেছু হটলে চলবে না।'

সে শুধু গিন্নীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'না না, আমি কাজ করতেই এসেছি। লেগে থাকতেই চাই। আপনি শুধু আমায় কাজকর্ম সব বুঝিয়ে দিন।'

এইবার গিন্নীর দুই চোখ জলে ভরে এলো। রতনের হাতটা ধরে বললেন, 'তুই আমায় বাঁচালি রতন, বাঁচালি।'

চাকরদের থাকবার জন্য একটা আলাদা ছোট ঘর। সেখানে কম্বল আর একটা ময়লা বালিশ পড়ে রয়েছে। ঐ বিছানা যে কত লোকের ব্যবহার করা বিছানা, কে জানে !

রতন মনে মনে ঠিক করলে, 'ওই নোংরা বিছানায় সে কিছুতেই শোবে না। তার চাইতে একটা বারান্দায় খাটিয়াতে পড়ে থাকবে, সেও ভালো।'

গিন্নীমা বললেন, 'এতটা দূর থেকে নৌকো করে এসেছিস্। নিশ্চয়ই তোর খিদে পেয়েছে। আগে জলখাবার খেয়ে নে। তারপর আমি তোর সব কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

গরম মুড়ি, জিলিপি আর চা—খিদের মুখে বেশ ভালোই লাগলো।

গিন্নী বললেন, 'এক-এক দিন এক-এক রকম জলখাবার খেতে দেবো তোকে। সেজন্য কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু কর্তার কাজগুলো হাতে হাতে করে তাঁকে ঠাণ্ডা রাখবি।

রতন জবাব দিলে, 'তা আমি চেষ্টা করবো। কিন্তু বেশী যদি মার-ধর করেন—'

এইবার আঁতকে উঠলেন গিন্নীমা, 'না না, সব সময়ই কি আর মার-ধর করবে ? মন খুশী থাকলে বকশিসও পাবি। এমনি মানুষটা দিলদরিয়া, কিন্তু হঠাৎ রেগে গেলে একেবারে বাপের কুপুত্তুর !'

রতন মুচকি হেসে বললে, 'কিন্তু কি কি ব্যাপারে তিনি রাগ করেন, সেটা আমায় আগে থাকতে জানিয়ে রাখবেন। একটু তা' থেকে আমি দূরে দূরে থাকবার চেষ্টা করবো। নইলে বেঘোরে প্রাণটা যাবে আর কি !'

গিন্নীর মুখেও এইবার হাসি ফুটলো ; জবাব দিলেন, 'না রে, না। রাগ চণ্ডাল, সেটা ত' আমি জানি। সব সময় আমি তোকে আড়াল করে রাখবো। তা' ছাড়া দু'দিনেই ওর ধাতটা তুই বুঝে নিবি। তখন আর অত ভয় থাকবে না।'

রতনও এইবার দু'পাটি দাঁত বিকশিত করে ফেললো। বললে, 'আমারও ক্রিকেট খেলা অভ্যেস আছে। বলগুলো ঠিক ক্যাচ্ করে নিতে পারবো। তা'হলেই এই প্রাণটা বেঁচে যাবে।'

গিন্নীমাও অবাক হয়ে গেলেন ওর কথা শুনে। বললেন, 'তুই আবার ক্রিকেট খেলা শিখলি কোথায় ? ভদ্রলোকের ছেলে নাকি তুই ? বাড়ি থেকে কি পালিয়ে এসেছিস্।'

এই বলে সন্দেহের চোখে তাকালেন গিন্নীমা।

রতন তাড়াতাড়ি গিন্নীর কথার উত্তর দিলে, 'না মা, না। আমি ভদ্রলোকের ছেলে

হলে চাকরের কাজ করতে আসবো কেন ? আগে যে বাড়িতে ছিলাম সেখানকার ছেলেরা ক্রিকেট খেলতো কি না ! তাই তাদের সঙ্গে খেলে খেলে একটু-আধটু শিখে নিয়েছি।'

ওর কথা শুনে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো গিন্নীর। বললেন, 'তাই বল ! আমার কিন্তু তোর চেহারাটা দেখেই কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল।'

রতন গিন্নীমার কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললো, 'না না, বড়লোকের বাড়ি ছিলাম কি না। বেশ ভাল-মন্দ খেতে দিত। তাই আমার চেহারায় একটু চেকনাই দিয়েছে। নইলে চিরকাল ত' খেটেই খেতে হবে আমাকে।'

রতনের কথা শুনে গিন্নী এইবার বেশ খুশী হলেন।

কাজ, যা কিছু বাড়ির কর্তাকে ঘিরেই। আলবেলায় তামাক টানা চলে সর্বক্ষণ। তাই ঘন ঘন কল্‌কে পাল্‌টে দিতে হবে।

কর্তা পুলিশের অফিসার। তাই তাঁর ভুঁড়িটা একটু প্রয়োজনের চাইতে বড়—হাঁটবার সময় সর্বদা আগে আগে চলে। সারা গায়ে—বিশেষ করে এই ভুঁড়িতে, খুব ভালো করে তেল মালিশ করতে হবে।

তেল মালিশ কাজটি বড় সহজসাধ্য নয়। জোয়ান হিন্দুস্থানী চাকরেরাও এই তেল মালিশ করতে গিয়ে হিমসিম খায়। কত চাকর এই তেল মালিশ করার ভয়েই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। নইলে বাড়ির গিন্নী বেশ খাইয়ে-দাইয়ে চাকরকে খুব তোয়াজে রাখতে চান !

কিন্তু কর্তা যেন একেবারে গন্‌গনে আগুন। কখন যে অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে বসেন তার কিছু ঠিক নেই।

কর্তা সেদিন বাড়িতে ছিলেন না, তাই বাঁচোয়া। সরকারী কাজে খানাতল্লাসী করতে কোথায় যেন বাইরে গেছেন।

সেদিন সারাটা দিন রতনকে ফাইফরমাস খাটতে হল। এটা আনো, ওটা আনো, কয়লার দোকানে খবর দাও, ঘরে কয় মণ চাল পাঠাতে হবে, সে-খবর পাড়ার মুদীকে জানিয়ে এসো—এই সব।

কর্তা-গিন্নীর একটি ছেলে, একটি মেয়ে। দু'জনেই ছোট। তাদের প্রতিদিন বিকেলবেলা বেড়িয়ে আনতে হবে। কিন্তু নদীর দিকে যাওয়া চলবে না। গিন্নী পই-পই করে বারণ করে দিয়েছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রতন, ছেলে আর মেয়েটির দিব্যি খেলার সাথী হয়ে উঠলো। রতনকে না হলে নাকি ওদের বিকেলবেলার খেলা কিছুতেই জমবে না।

সেদিন হাল্‌কা কাজের ওপর দিয়েই দিনটা বেশ কেটে গেল।

সন্ধ্যেবেলায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রতনের ভাগ্যেও চা আর হালুয়া জুটলো।

সন্ধ্যের পর রতন বসে কানু আর বিনুকে গল্প শোনাচ্ছিল। বাড়ির গিন্নী ছিলেন রান্নাঘরে। নিজের হাতে কিছু তৈরি করতে না পারলে কর্তার নাকি মন ওঠে না ! কর্তা বাড়ি নেই, তাই গিন্নী মনোমত খাবার করে রাখছেন।

আঁধার ঘনিয়ে আসবার বেশ কিছুক্ষণ বাদে রাশি রাশি কালো মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেললো। গুরু-গুরু মেঘের ডাক শোনা যেতে লাগলো। আরো খানিকটা বাদে ইন্দ্রের ঐরাবত যেন তার শুঁড় দিয়ে তোড়ে জল ঢালতে শুরু করে দিলে। সারা দেশ জলে ভেসে যেতে লাগলো। উঠোনে হাঁটু অবধি জল জমে গেল।

সেই জল কল্-কল্ শব্দে জলপ্রপাতের মতো নদীর পথে ছুটতে শুরু করলো। গৃহপালিত জীবজন্তুগুলো বৃষ্টিতে ভিজে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো শীতে।

রতনের গল্পও ঘরের ভেতর বেশ জমে উঠেছে।

আজ কানু-বিনুর চোখে ঘুম নেই। ঘুমের মাসি-পিসি আর কাছে ঘেঁষতে পারছে না ! ওরা দু'টি ভাই-বোন চোখ বড় বড় করে বলছে—তারপর রতনদা—তারপর.?

রতনও একটির পর একটি গল্প শুনিয়ে যাচ্ছে ওদের সেই সব গল্প একদিন বোর্ডিং-এ বসে ওরা জীবনদার মুখে শুনেছিল !

এমন সময় বৃষ্টির ভেতর থেকে একটা হুঙ্কার শোনা গেল, 'বাড়ির সবাই কি মরেছে ? কেউ একটা আলো ধরতে পারে না ?'

বাড়ির কর্তা ফিরে এসেছেন।

এই জল-ঝড়ের রাত্রে একেবারে কাক-ভেজা হয়ে প্রাণটি হাতে নিয়ে কোনো রকমে এসে পৌঁছলেন তিনি।

তাঁর হুঙ্কার শুনেই কানু আর বিনু এক লাফে উঠে বিছানায় গিয়ে একেবারে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লো।

ওদের দিকে তাকিয়ে কে বলবে যে, খানিক্ষণ আগেই ওরা চোখ বড় বড় করে রতনের গল্প গিলছিল !

বাড়ির গিন্নী তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হাতে তাঁর একটি লণ্ঠন।

তিনি হাঁক দিয়ে বললেন, 'ওরে রতন, শীগ্‌গির ছুটে আয়। কর্তা ফিরে এসেছেন। আগে শুক্‌নো তোয়ালে নিয়ে আয়। লুঙ্গিটা এই দড়ির ওপরেই ঝোলানো আছে।

গিন্নীর ডাক শুনে রতনও তিন লাফে বারান্দায় বেরিয়ে এল। তারপর যে দৃশ্য সে চোখের সামনে দেখতে পেলো, তাতে মনে হল—এইমাত্র কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। কর্তার সেই বিকট দেহ—পুলিশের ইউনিফর্ম পরা, মাথা আর সেই কিম্ভূতকিমাকার পোশাক থেকে অঝোরে জল ঝরে পড়ছে। উঠোনের জমা জলে হাঁটু অবধি তলিয়ে গেছে। পোশাক জলে ভিজে একেবারে ঢোল হয়েছে। তারই ভারে তিনি আর কিছুতেই এগোতে পারছেন না।

তোয়ালে হাতে বোকার মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে রতন।

হাঁটু অবধি ডোবা অবস্থায় কর্তা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'এ ছোকরাকে আবার কোথা থেকে জোটালে ?'

গিন্নী ভয়ে ভয়ে বললেন, 'এর নাম রতন। আজই কাজে লেগেছে।'

কর্তা বললেন, 'হুঁম !....তারপর রতনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ধর আমাকে শক্ত করে। তারপর টেনে তোল বারান্দার ওপর।'

কর্তার কাছে রতন যেন একটা বাচ্ছা নেংটি ইঁদুর। কর্তার হাতের টানে রতন একেবারে জলের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে উঠলো।

তারপর কিভাবে রতন জল থেকে উঠে পাঁঠার ছাল ছাড়ানোর মতো কর্তার পোশাক খুলে নিয়ে তাঁর হাত-পা-মাথা মুছে দিলে, সে এক বিরাট ইতিহাস !

তৎক্ষণে দারুণ পরিশ্রমে কর্তাও হাঁসফাঁস করতে লাগলেন ! কোনো রকমে ঢেকুর তোলার মতো একটা হুঙ্কার দিলেন, 'তামাক দে !'

রতন ছুটলো তামাক সাজার জন্য। কিন্তু তামাক কি করে সাজাতে হয় সে রহস্য ওর আদপেই জানা নেই।

বাড়ির গিন্নী ছুটে এলেন তাকে হাতে হাতে শিখিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর নিজের গুণপনাও বেশী আছে বলে মনে হল না।

ফলে যেভাবে কল্‌কেতে তামাক সাজা হল, তাতে একটা টান মেরেই কর্তা সেই কল্‌কে খুলে সোজা রতনের দিকে ছুঁড়ে মারলেন।

রতন কিন্তু এইরকম একটা ব্যাপার ঘটবে আঁচ করে একেবারে ভ্যাবা-গঙ্গারামের মতো ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল।

কল্‌কে তাক্ করতেই সে একটু সরে দাঁড়ালো। ফলে সেই আগুন-ভর্তি কল্‌কেটা দেয়ালের গায় একটি আয়নায় লেগে খান খান হয়ে গেল।

বাড়ির গিন্নী ব্যাপার দেখে একেবারে থ।

আরো ক্রুদ্ধ হয়ে কর্তা উঠতে যাবেন, কিন্তু কোমরের ব্যথায় তাঁকে একেবারে নেতিয়ে পড়তে হল।

সেই রাত্তিরে কর্তা গরম খিচুড়ি খেয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন, আর রতনকে সরষের তেল গরম করে অনেকক্ষণ ধরে পায়ের তলায় মালিশ করতে হল।

রতন ভেবেছিল, রাগ করে রাত্তিরে আর কিছুই খাবে না। কিন্তু গিন্নীর আন্তরিকতায় সেটি হবার জো ছিল না। তিনি বললেন, 'রাতে উপোসী থাকলে হাতিও কাহিল হয়ে পড়ে'।

তাই বেশী কথা না বলে তিনি সোজা হাত ধরে টেনে এনে ওকে একথালা গরম খিচুড়ির সামনে বসিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে গরম প্যাঁজ-ফুলুরীও বাদ গেল না।

একে মনের দুঃখ, তার উপর খিচুড়ির গরম, রতনের দু'চোখ বেয়ে টস্‌টস্‌ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। দু'হাতের চেটো দিয়ে চোখমুখ মুছেও কোনো মতে সেই চোখের জল বন্ধ করতে পারে না !

গভীর রাত।

রতন উঠোনের এক ধারের একটি বারান্দায় একটি খাটিয়া পেতে শুয়ে আছে।

চাকরদের জন্য যে আলাদা ঘর, তাতে সে ঢোকেনি। সে ঘরে তামাক, টিকে সব চারদিকে ছড়ানো। তা ছাড়া বিছানায় যে কত কালের ময়লা জমে আছে সে-কথা বলা শক্ত।

রতন খাটিয়ায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে। খাটিয়া ভর্তি ছারপোকা। দু'চোখ বোজবার জো নেই। দূরে থানার ঘন্টা বেজে চলেছে, কিন্তু রতন বিনিদ্র রজনী যাপন করছে।

আকাশের তারাগুলোর দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এই তারাগুলোই ত' বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ওপর অপলক নেত্রে চেয়ে আছে ! কিন্তু সে আজ ওদের ওখান থেকে কত দূরে !

হঠাৎ বাইরের দরজায় টক্‌টক্‌ করে শব্দ হল।

চোর-টোর আসেনি ত' ?

আবার সেই সাবধানী শব্দ !

রতন পা টিপে টিপে গিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুলে দিল !

এ কি ! ওর সামনে দাঁড়িয়ে জীবনদা !

জীবনদা ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন—চুপ ! কথাটি নয়। দরজাটা আস্তে ভেজিযে দিয়ে আমার সঙ্গে আয়।

ঝিম্‌ঝিমে রাত।

রাস্তার দুই পাশে যে জল জমেছিল, সেখান থেকে ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে। পথ চলতে গিয়েও প্রচুর কাদা।

জীবনদা শুধু বললেন—ভয় পাস্‌ নে। আয় আমার সঙ্গে।

পথের দু'পাশে যে ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল, সেখানে জোনাকি পোকা পিদিম জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই ক্ষীণ আলোকে পথ চলছেন জীবনদা। ডান হাত দিয়ে রতনের একটা হাত শক্ত করে ধরেছেন যাতে রতন পা পিছলে পড়ে না যায়।

এতক্ষণ ধরে বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই খুব পিছল হয়েছে রাস্তাটা।

রতনও পা টিপে টিপে সাবধানে এগিয়ে চলেছে।

অবশেষে ওরা দু'জনে গিয়ে নদীর ধারে হাজির হল। একটা ঝাঁপড়া বটগাছের তলায় কাঠের একটা গুঁড়ি। সেইখানেই জীবনদা ওকে টেনে নিয়ে গেলেন ; বললেন—বোস্, কথা আছে।

রতন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল—ওরা আবার জেগে উঠে আমার খোঁজ করবে না ত' ?

জীবনদা এইবার হেসে ফেললেন ; বললেন, 'না রে, সে ভয় নেই। বাড়ির কর্তা ঠিক কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোয়। তার ওপর আজ আবার বৃষ্টিতে কাক-ভেজা ভিজে এসেছে। আজ কানের কাছে ক্যানেস্ত্রা পিটলেও ওর ঘুম ভাঙবে না।'

রতন তখন নিশ্চিন্ত হয়ে জীবনদার পাশে ভাল হয়ে বসল।

জীবনদা বললেন—এখন তুই রতন। কাজেই সব সময় তোকে রতন বলেই ডাকব। ডাক শুনতে শুনতে ওই নামটাই তোর রপ্ত হয়ে যাবে।

এতক্ষণ ছারপোকার কামড়ে রতনের ঘুম হচ্ছিল না। খাটিয়াতে পড়ে এপাশ-ওপাশ করছিল। তার চাইতে নদীর ধারে বসে জীবনদার সঙ্গে গল্প করা অনেক ভাল।

জীবনদা কিন্তু গল্প করার জন্য ওকে ডেকে আনেন নি। শুধু বললেন, 'জরুরী কথা আছে রে, শোন্।

রতন উৎসুক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

জীবনদা বললেন—আজ আমাদের একটা চমৎকার সুযোগ এসেছে। এই দুর্যোগের রাত্তিরেই কাজ হাসিল করতে হবে।

রতন শুধালে কি কাজ, বল না জীবনদা !

জীবনদা বললেন—ঠিক সেই কথা বলবার জন্যই তো তোকে ডেকে এনেছি রে। মন দিয়ে আমার কথা শুনে নে।

জীবনদা একটু চুপচাপ থাকলেন ; তারপর বললেন, 'আচ্ছা, তোকে সব কিছু খুলে বলাই ভালো। দেখ, আমাদের দলের দু'টি নামকরা বিপ্লবী গা ঢাকা দিয়ে এক জঙ্গলের মধ্যে ঘর বেঁধে বাস করছে। কেউ তাদের সন্ধান রাখে না। পুলিশ ত নয়ই। কিন্তু এই পুলিশ অফিসার আমাদের একটা লোককে ঘুষ দিয়ে নিজের দলে টেনে নিয়েছে। আর লোকটাও বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

রতন যেন অন্ধকারের মধ্যেও আঁতকে উঠলো ! জিজ্ঞেস করলো—ওই বিপ্লবী দু'জন কোথায় থাকেন—সে-কথা পুলিশ অফিসারকে বলে দিয়েছে বুঝি ?

জীবনদা বললেন, 'অনেকটা তাই। সেই বিশ্বাসঘাতক একটা নক্সা এঁকে পুলিশ অফিসারকে দিয়ে দিয়েছে।' আসছেকাল এই পুলিশ অফিসারটি আরো লোকজন

নিয়ে ওই নক্সার অনুসরণ করে বিপ্লবী দু'জনকে ধরে ফেলবে—এই মতলব এঁটেছে। পুলিশের মধ্যেও ত আমাদের গুপ্তচর থাকে। তেমনি একটি কর্মীর কাছে আমি খবর পেয়েছি। আজই সেই নক্সাটা তোর নতুন মনিবের হাতে পড়েছে।

রতন আবেগে যেন থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে ; জিজ্ঞেস করলে—তা'হলে আমায় কি করতে হবে জীবনদা ?

জীবনদা জবাব দিলেন—মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনে রাখ। তোর মনিব যে রকম ভাবে বৃষ্টিতে ভিজে এসেছে, তাতে মনে হয়—ওই নক্সাও ভিজে গেছে। রাত্তিরে শোবার আগে সেই নক্সা নিশ্চয়ই ঘরের কোথাও-না-কোথাও শুকোতে দিয়েছে।

রতন মাথা নেড়ে বললে, 'সম্ভব।'

জীবনদা বললেন, 'সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই। আজ রাত্রেই ওই নক্সা তোকে চুরি করতে হবে। তারপর সিধে চলে আসবি বাইরে ! তখন কি করতে হবে আমি বলে দেবো।

রতনের মনে তখনও দ্বিধা, তাই খাটো গলায় বললে—কিন্তু কুম্ভকর্ণ যদি জেগে ওঠে ?

এইবার জীবনদা হেসে ফেললেন ; বললেন—আরে বোকা, কুম্ভকর্ণ কখনো নিজে থেকে জাগে ? তার ঘুম না ভাঙালে সে কিছুতেই বিছানা ছেড়ে উঠতে চায় না। ভগবান আজ রাত্তিরে আমাদের সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছেন। এই সুযোগ হাতছাড়া করা কখনই উচিত হবে না। ভয় নেই। চল, আমি তোকে দোর-গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি—

নিঃশব্দে দুইজনে আবার রওনা হল।

সেই নিশুতি রাত। গোটা অঞ্চলে কেউ জেগে নেই। শুধু একঘেয়ে ব্যাঙের ডাক আর জোনাকির চক্‌মকি। সাবধানে পা টিপে টিপে ওরা এগিয়ে এলো।

কাদাভরা পথ তেমনি পিছল। কোনো রকমে পা ফস্‌কালে আর রক্ষা নেই। সদর দরজা থেকেই জীবনদা চলে এলেন, ওদের উঠোনে আর ঢুকলেন না।

রতন একবার পিছন ফিরে দেখলো। বাইরে দারুণ অন্ধকার। কিছুই আর চোখে পড়ে না। মনে হয় কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে। সব কালোয় কালো—একাকার।

খুব সাবধানে সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে পা টিপে টিপে রতন উঠোন পেরিয়ে টানা-বারান্দার ওপর গিয়ে উঠলো।

কর্তার পা ধোয়ার জন্য গরম জল করা হয়েছিল। তার খানিকটা তখনো পড়ে ছিল বালতিতে। রতন সেই জল দিয়ে ধীরে ধীরে তার কাদামাখা পা দু'টি ধুয়ে ফেললো।

এখন খুঁজে দেখতে হবে—কোথায় সেই ভিজে নক্সা শুকোতে দেওয়া হয়েছে।

আর কোথায় হবে ?—নিশ্চয়ই কর্তার ঘরে।

অন্ধকার রাত্তিরে চলা বেড়ালের মতো এক পা-দু'পা করে এগিয়ে গেল রতন।

কর্তা আর গিন্নির ঘর পাশাপাশি। কর্তার ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। তারই মৃদু আলোতে জানালা দিয়ে দেখা গেল, বিরাট দেহ নিয়ে কর্তা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। নিঃশ্বাসের তালে তালে ভুঁড়িটা একবার উঠছে আবার পড়ছে। সত্যি, একটা দেখবার মতো দৃশ্য।

সিনেমায় এই জাতীয় দৃশ্য দেখলে লোকে হেসে পাশের দর্শকের গায়ে গড়িয়ে পড়তো।

কিন্তু রতনের হাতে অত সময় কোথায় যে দাঁড়িয়ে দেখবে ? তা ছাড়া ভয়ে আর আতঙ্কে ওর দেহটা থর্‌থর্‌ করে বাঁশপাতার মতো কাঁপছিল।

আসলে কাজটা চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কোনো রকমে জানা-জানি হয়ে যায়, তা'হলে মারধর ত' খেতে হবেই—জেলে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

পুলিশের বাড়িতে চুরি, যাকে বলে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা !

হুটোপুটি করতে, খেলাধূলায় যোগ দিতে আর সাঁতার কাটতে রতন ওস্তাদ। কিন্তু রাতদুপুরে এমনভাবে চুরি করা ! এতে চরণও কাঁপে—পরাণও কাঁপে ! তবু ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না। জীবনদা সাহস দিয়েছেন। যেমন করে হোক, কাজ হাসিল করতেই হবে।

রতন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে আবার দেখলো। নাঃ, এখন কর্তার জাগবার কোনো লক্ষণ নেই।

ঘরের দরজাটাও একবার ঠেলে দেখলো। ওটা ভেতর থেকে বন্ধ।

একটা সুবিধে এই যে, জানলায় শিক বসানো নেই। ওটা আগাগোড়াই খোলা। জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। নিজের ওপর বোধ করি অগাধ বিশ্বাস। তাই লোহার শিক লাগাবার কথা আদৌ মনে হয় নি।

রতনের হাল্‌কা শরীর। অতি সহজেই সে নিজেকে ভেতরে গলিয়ে দিলে।

একবার চারদিক তাকিয়ে দেখলো। বাঘের গুহার মধ্যে সে ঢুকেছে। এখন প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারলে হয়।

যে পোষাক পরে কাক-ভেজা হয়ে কর্তা ফিরেছেন, তার কিছুই এ ঘরে নেই। কোথায় সে সব শুকোতে দেওয়া হয়েছে—এই মিশকালো রাত্তিরে সেগুলো খুঁজে বের করা সত্যি শক্ত।

তবু চেষ্টা করতে বাধা কি ? রতন আবার ঘরের চারদিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। নাঃ, ভিজে জামা-পোষাকের সন্ধান মিললো না। শুধু ভিজে জুতো জোড়া আমসত্ত্বের মতো খাটের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে !

রতন এইবার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল ; দেখলো একটা ভিজে কাগজ খুলে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে টেবিলের ওপর। তার ওপর একটা চামচ চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।

নিশ্চয়ই এইটে নক্সা।

রতন ভয়ে ভয়ে হাতে তুলে নিয়ে দেখলো।

নক্সা যে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। কোন্ দিকে রাস্তা গেছে, কোথায় নদী পড়েছে, কোন্ অঞ্চলে বন—সব পেন্সিল দিয়ে এঁকে দেখানো হয়েছে ! কিন্তু কাগজটা তখনো একেবারে শুকিয়ে যায় নি, একটু একটু ভিজে আছে।

রতন সাবধানে কাগজটা ভাঁজ করে নিজের হাতে তুলে নিলো ; তারপর অতি আনন্দে যেমন তাড়াতাড়ি এগিয়ে জানলার দিকে যাবে—অমনি ওর পা একটা টুলের সঙ্গে ধাক্কা খেলো। সেই টুলটার ওপর একটা কাচের গেলাসে খাবার জল ঢাকা দেওয়া ছিল।

পড়বি ত পড়-হুড়মুড় করে সেই কাচের গেলাস নিয়ে রতন মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। কাচের গেলাস ছিটকে পড়ে খান খান হয়ে গেল !

তাতে এমন একটা শব্দ হল যে ওর মনিব 'কে কে' বলে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন।

রতনের আর এক মুহূর্ত ভাববার সময় নেই। সে বেশ বুঝতে পারছে যে, ভাঙা কাচে লেগে ওর কপালের খানিকটা কেটে গেছে—রক্তও বেরুচ্ছে ! কিন্তু দাঁড়ালেই মরণ !

তাই সে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে, কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে জানালা গলিয়ে একেবারে এক লাফে বাইরে এলো।

ওর মনিবও কোমরের লুঙ্গীটা সামলে নিয়ে ওর পেছন পেছন ধাওয়া করলেন !

হাজার হোক রতন হচ্ছে ছেলেমানুষ, আর ছোটবার ক্ষমতাও তার অনেক বেশী। তাই এক ছুটে উঠোন পেরিয়ে, সদর দরজা খুলে সে পাগলের মতো দৌড়ুতে আরম্ভ করল।

একে অন্ধকার রাস্তা-তাতে আবার পিছল। দু'পা এগোয় ত তিন পা পেছোয়। রতন ভেবেছিল—অতি সহজেই জীবনদার সন্ধান পাবে।

কিন্তু কোথায় জীবনদা ? আশে-পাশে কোথায়ও তাঁকে দেখতে পেলে না। চিৎকার করে যে ডাকবে তারও কোনো উপায় নেই। তা হলেই পেছনকার ছুটে আসা কুম্ভকর্ণটা ওর হদিস পাবে।

আন্দাজে রাস্তাটা ধরে নিয়ে সে নদীর দিকে দৌড়তে শুরু করে দিলে। মনে মনে এইটুকু শুধু আশা যে, নদীর ধারে যদি জীবনদার দেখা মেলে।

আরো খানিকটা ছোটবার পর ওর আশা সফল হল।

জীবনদা সেই কাঠের গুঁড়িটার ওপর বসে রয়েছেন ; রতনকে ছুটে আসতে দেখেই অসীম আগ্রহে এগিয়ে এলেন।

রতন ওঁর হাতে নক্সাটা গুঁজে দিয়ে বললে—জীবনদা, শীগগির পালান—পেছনে কুম্ভকর্ণ আমায় ধরতে আসছে।

সেই কথা শুনে জীবনদা আঁতকে উঠলেন—অ্যাঁ ! বলিস্ কিরে ? দানবটা জানতে পেরেছে বুঝি ? তা'হলে ত তোকেও ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না। দানবটা তোকে দু-টুকরো করে ফেলবে।

এই বলে জীবনদা শক্ত করে রতনের হাতটা চেপে ধরলেন ; তারপর ওকে সঙ্গে নিয়েই পাগলের মতো ছুটতে শুরু করে দিলেন।

রতন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে—এইভাবে আর কতদূর ছুটবে জীবনদা? কুম্ভকর্ণ লম্বা লম্বা পা ফেলে ঠিক তোমায় ধরে ফেলবে।

সে কথা শুনে এত ছোটাছুটির মধ্যেও জীবনদা হো-হো করে হেসে উঠলেন ; বললেন, 'আরে, পাগল হয়েছিস্ তুই ! ওই থপথপে দানব কখনো বিপ্লবীর সঙ্গে ছুটে পারে ? ওরা প্রচুর ঘি-দুধ-মাছ-মাংস খেয়ে ভারী হয়ে গেছে। আর আমরা না খেতে পেয়ে শোলার মতো হাল্‌কা আছি। ওর শক্তি নেই আমাদের ধরে।

তারপর গলা খাটো করে কৌতুকের সুরে জীবনদা বললেন, 'আরে আসল কথাটাই ত তোকে বলিনি !' নদীর দেশে আমাদের সহায় হচ্ছে নৌকো। সেই নৌকো তৈরি হয়ে আছে নদীর ধারের এক ঝোপের আড়ালে। আয় শীগ্‌গির আমার সঙ্গে—দানবটার চোখে ধুলো দিতেই হবে।

জীবনদার হাত ধরে রতন আবার প্রাণপণে ছুটতে শুরু করে দিলো।

অবশেষে ঝোপের আড়ালে সেই নৌকোর দেখা মিললো। মাঝি তৈরি হয়েই ছিল। নৌকোর সামনের গলুইটা সে এগিয়ে ধরলো তাড়াতাড়ি।

জীবনদা রতনকে চেপে ধরে সেই নৌকোর ওপর লাফিয়ে উঠলেন।

একবার ডাইনে-বাঁয়ে দুলে উঠে নৌকোটা তীরবেগে এগিয়ে চললো মাঝ-দরিয়ার দিকে।

তখনো চারদিকে ঘন আঁধার। কাজেই কে যে কোন দিক থেকে ছুটে আসছে কিছুই বোঝবার জো রইলো না।

ইতিমধ্যে জীবনদাও কোমরে গামছা জড়িয়ে নিয়ে দাঁড় টানতে শুরু করে দিয়েছেন।

দুইজনের চেষ্টায় নৌকো শাঁ-শাঁ শব্দে এগিয়ে চললো।

উভয়ের কথাবার্তা শুনে রতন বুঝতে পারলে,—এরা দুজনেই বিপ্লবী। সেদিনের নৈশ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল।

বেশ খানিকক্ষণ নৌকো এগিয়ে চললো নিঃশব্দে। তারপর পূব দিক আলো করে জবাফুলের রঙের নতুন সূর্যোদয় দেখে ওরা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সেই দিকে। তিনজনে নবোদিত অরুণকে প্রণাম জানাল।

জীবনদার মুখে হাসি আর ধরে না ; বললেন—ওরে শম্ভুমচাঁদ, নৌকাতে চিড়ে-মুড়ি কি আছে দেখ্। আমাদের রতনচাঁদ সারারাত বড্ড দৌড়-ঝাঁপ করেছে। তার ওপর আবার কুম্ভকর্ণের বাড়ির মানুষ। তাড়াতাড়ি ওকে খেতে দে, নইলে আমাদের দু'জনকেই চিবিয়ে খাবে !

নৌকো আবার চললো তীরের কোল ঘেঁষে-ঘেঁষে, ঝোপ-জঙ্গলের পাশে পাশে —মাঝ-দরিয়া থেকে একেবারে দূরে দূরে।

জীবনদার সতর্ক দৃষ্টি চারদিকে সার্চ লাইটের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো !

অনেক রকম বিপদ আছে দিনের বেলায়। জল-পুলিশের নজর আছে, গুপ্তচরদের নৌকো আছে, তা ছাড়া ইতিমধ্যে খবরটা কিভাবে চারদিকে চালু হয়েছে —কিছুই জানা নেই।

যে করেই হোক—তাড়াতাড়ি সেই দুটি অসহায় বিপ্লবীকে বনের গোপন আস্তানা থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

তখনকার দিনে পুলিশ চোর-ডাকাত ধরুক আর না-ই ধরুক, বিপ্লবীদের পেছনে হন্যে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াতো।

কাজেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে তাদের এগিয়ে চলতে হবে।

ইতিমধ্যে জীবনদার ব্যবস্থায় তারা তিনজনেই নৌকোর মাঝির বেশ ধরে ফেলেছে, আর জীবনদা ছোট্ট থেলো হুঁকোয় গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানছেন ; চারদিকে নিজের চোখ দুটিকে শুধু ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। হঠাৎ একটা নৌকো এসে পাশে দাঁড়ালো। গলা খাঁকারি দিয়ে ভেতর থেকে একটা মোটা আওয়াজ এলো—এ নৌকো কোথায় যাবে ?

সঙ্গে সঙ্গে জীবনদা জবাব দিলেন—সাবুল্যার হাটে যাবো গো কর্তা। গরুর জন্যে খড় আর ভূষি আনতে হবে।

তিনজনের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মোটা লোকটি নৌকা ছেড়ে দিতে বললে। নৌকোটা চক্ষের পলকে দাঁড় টেনে কোথায় যেন লুকিয়ে পড়লো।

জীবনদা তখন হুঁকোটা হাতে করে হি-হি করে হাসছেন।

একবার চোখ পিট-পিট করে বললেন, 'বুঝতে পারলি নে কিছু ? জল-পুলিশ গো ! ওরা ছদ্মবেশে বেরিয়েছে। এদিকে আমরাও যে রাতারাতি ভেক নিয়ে বসে আছি—সে খবর তা ওরা রাখে না। দেখলি তা চাষীর পার্টে কেমন উৎরে গেলাম।

তারপরই জীবনদা একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠে বললেন—হুঁ ! অনেক মস্করা করা হয়েছে। এইবার দেহটাকে একটু চাঙা করতে হবে। ধর দেখি—একটা ভাটিয়ালী গান ! ডান হাতটা কানের পিঠে রেখে সঙ্গে সঙ্গে একটা গান ধরে ফেললেন—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে—
আমি আর বাইতে পারলাম না !"

স্বীকার করতেই হবে,—জীবনদার গলাটা ভারী দরাজ। নদীর জলের ওপর দিয়ে সেই সুর যেন অনেক দূর অবধি তর্-তর্ করে এগিয়ে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীদের ঠেলা দিয়ে বললেন, 'আরে বোক্চন্দর হাঁদারাম, তোরা চুপচাপ বসে রইলি কেন ? আমার সঙ্গে গাইতে শুরু করে দে।'

রতন বললে, 'আমি যে ভালো করে গাইতে পারি না জীবনদা !'

জীবনদা আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন ; বললেন—দূর বোকা ! চাষা-ভূষোর গলায় যে গান আসে তাই গা না। আমার সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে যা দু'জনে।

তখন-তিনজনে মিলে আবার ভাটিয়ালী গান শুরু করে দিলে।

ইতিমধ্যে নৌকো কখন যে ঘাটে এসে পৌঁছেছে—রতন চোখ বুজে গাইতে গাইতে টের পায়নি।

বেলা তখন প্রায় দুপুর। জীবনদা নৌকোর দড়িটা একটা যজ্ঞডুমুর গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে তড়াক করে নিজে লাফিয়ে পড়লেন আর ওদের বললেন, 'ওরে দুই অকাল-কুষ্মাণ্ড, নেমে আয় শীগ্গির।'

রতন জিজ্ঞেস করলে, 'এ আবার কোথায় নামলে জীবনদা ! সেই জঙ্গলে যাবে না ?'

জীবনদার মুখে রহস্যের হাসি। উত্তর দিলেন—যাবো রে যাবো। এখানে আমার এক বোনের বাড়ি। তার সঙ্গে দেখাও হবে, আর এই তিনটে পেটের খোল ভর্তি করতে হবে না ?

এই বলে রতন আর গোবিন্দকে দেখিয়ে তারপর নিজের খালি পেট বাজাতে শুরু করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কি হাসি।

জীবনদার হাসিকে নকল করবার জো নেই। সেই হাসির শব্দ শুনে একটি সুন্দরী বৌ এসে যে ঘাটের কিনারায় দাঁড়িয়েছে তা কেউ লক্ষ্যই করে নি।

বৌ নয়, ঠিক একেবারে লক্ষ্মীপ্রতিমা ! বৌটি বললে, 'এতদিনে বুঝি পাতানো বোনকে মনে পড়লো দাদা ?'

জীবনদার মুখটা যেন এক মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। ওর কাছে গিয়ে বললেন, 'পাতানো বোন কেন বলছিস্ ? আমার মায়ের পেটের বোন নেই।' তোদের মত

কত বোন আমার সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। যখনই সময় পাই তোদের সঙ্গে দেখা করে যাই।

তারপর আবার সহজ সুরে কৌতুক করে বললেন, 'আর বোন না হলে আমাদের এই খালি পেটের গর্ত কে ভরাট করবে শুনি ?'

বৌটির চোখ দু'টি ছল-ছল করে উঠলো ; বললে, 'জানি জীবনদা, কত দিন তোমার খাওয়া হয় না যখনই মনে হয়, তখন আমাদের মরাইভরা ধানের ভাত আর গোয়ালভরা গরুর দুধ যেন তেতো মনে হয়। মুখে তুললে গলা আটকে আসে।'

জীবনদার চোখেও জল। কথাটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য তিনি বললেন, 'ছিঁচকাঁদুনী মেয়ে, তোর আর একটি দাদা আর একটি ছোট ভাই যে খিদেয় কাঁদছে—সেদিকে নজর দিবি ত একটু !' এই দেখ, তোর আর এক দাদা গোবিন্দ, আর এই দস্যি ভাই রতন।

এক মুহূর্তে বৌটি একেবারে দিদি হয়ে গেল। রতনকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, 'আমারও কোনো ভাই নেই জীবনদা। রতনকে আমার কাছে রেখে যাও। আমি বলছি দিদির সংসারে ওর কোনো অভাব হবে না।'

জীবনদা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—থাকবে রে থাকবে ; কিন্তু এখন ত থাকতে পারবে না। আমাদের আজ রাতে একটা জরুরী কাজ আছে। সেই কাজ শেষ করে তারপর দিদির কাছে ছোট ভাইকে পৌঁছে দেবো।

রতনের নতুন-পাওয়া দিদি আর কিছু বললে না, শুধু বাঁধভাঙা চোখের জলকে গোপন করবার জন্য চট্ করে ওদের ভেতরে আসবার ইঙ্গিত করে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

এই মেয়েটি এক মুহূর্তে যেন একেবারে দশভূজা হয়ে গেল। দশ হাতে কাজ শুরু করে দিলে—ভাইদের একটু মাছ-ভাত খাওয়াবার জন্য।

স্বামী বিদেশে থাকে, বুড়ী শাশুড়ীকে নিয়ে সংসার। শাশুড়ী লাঠি ঠুক-ঠুক করে এসে বললেন, 'ভালো করে খাইয়ে দাও বৌমা। কুটুম্বরা বাড়িতে এসেছে, আর আমার খোকা নেই বাড়িতে। দেখো যেন নিন্দে না হয়।'

মেয়েটি বললে, ' সে আপনি কিচ্ছু ভাববেন না মা !'

রতন চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, একেবারে বাড়বাড়ন্ত সংসার। গোবর-নিকানো উঠোন। সারি সারি সব ধানের গোলা। একদিকে পূজোর ফুলের জন্য সুন্দর একটি বাগান। তাতে বাছাই-করা সব ফুল ফুটে আছে। উঠোনের আর এক প্রান্তে গোয়ালঘর; তাতে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুধেলো সব গাই।

মেয়েটি এক ফাঁকে এসে রতনকে বললে, 'বাড়িতে এত দুধ, কিন্তু খাবার মানুষ নেই। আজ ভাইদের জন্যে পায়েস করবো।'

জীবনদা তাই শুনে বললেন, 'ওরে পাগলী মেয়ে, অত ঝামেলায় যাস নে। তাড়াতাড়ি ভাতে-ভাত করে দে, আমরা আবার এক্ষুণি পালাবো।'

বৌটি মিষ্টি হেসে উত্তর দিলে—তা বৈ কি ! মনে নেই ভাইফোঁটার দিনে আসবে বলে কথা দিয়েছিলে। আমি পায়েস রেঁধে সারাদিন বসে ছিলাম। তারপর সেই পায়েস খালের জলে ঢেলে দিলাম।

জীবনদা তার বোনের কথা শুনে যেন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। বললেন—সব মনে থাকে রে, সব মনে আছে। তবে জানিস ত বোন, আমাদের দয়ামায়া, প্রীতি, স্নেহ কিচ্ছু থাকতে নেই। যে আশা করে সে তোর মতো চোখের জল ফেলে, আর যে দিতে চায়, তার বঞ্চিত আত্মা শুকিয়ে কুঁকড়ে ওঠে।

তারপর, গলাটাকে একটু খাটো করে জীবনদা বললেন—সেদিন পুলিশের তাড়া খেয়ে এক মুসলমান বন্ধুর মাচার ওপর শুয়ে তোর ভাইফোঁটার পায়েসের কথাই ভেবেছি শুধু। নীচে নেমে যে একটু পান্তা ভাত খাবো—তারও জো ছিল না।

জীবনদার বোন বললে—থাক থাক, আর বলতে হবে না। আমি শুনতে চাইনে।

চট্ করে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে সে যেন কাকে বললে—আমার ভাই আর দাদারা এসেছে। বিষণ, তোমাকে কিন্তু পুকুরে জাল ফেলে একটা বড় রুই মাছ ধরতেই হবে।

জীবনদা শুধু অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, 'আজ অনেকদিন পর পাগলীর পাল্লায় পড়েছি, কপালে অনেক দুঃখ আছে দেখছি।

রতন উত্তর দিলে—একে আপনি দুঃখ বলছেন জীবনদা ? পুকুর থেকে লাফিয়ে উঠেছে টাটকা রুইমাছ, আর আমার দিদি নিজে হাতে রান্না করছে পায়েস।

গোবিন্দ এতক্ষণ ধরে বরাবর চুপচাপ ছিল। এইবার উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে—তা'হলে জীবনদা প্রাণ যদি যায় তবে পুলিশের গুলিতে না গিয়ে আজ বোনের বাড়ির এই ফলারেই যাক।

তিনজনেই হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে তারা দেখলে কখন তাদের বোনটি এসে তাদের পাশেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে। হাতে তার সরষের তেলের বাটি, আর তিনখানি গামছা। বোনটি বললে—আর এক মুহূর্তও দেরী নয়। তিনজনে ভালো করে সারা গায়ে তেল মালিশ করে স্নান করে নাও। আমাদের বিষণের মা ইন্দারা থেকে জল তুলে দেবে।

জীবনদা শুনে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—অ্যাঁ ! তুই বলছিস কি বোন ? তোলা জলে স্নান ? তাও আবার বিষণের মায়ের তোলা ? কেন খালের জল কি সব শুকিয়ে গেছে ? আমার আবার তোলা জলে স্নান করলে গায়ে জ্বর আসে।....

* * *

চলরে তোরা সব, খালে যাই। আমাদের নিয়ম কি জানিস ত ?

স্নানং খালের জলে,
ভোজনং যত্র তত্র,
শয়নং হট্টমন্দিরে।

বোনটি বললে, 'বাইরে কি হয় আমি ত' আর দেখতে যাইনে। কিন্তু বোনের বাড়ি এসে ওসব নিয়ম বাতিল। এখন আমার হুকুমমত তোমাদের চলতে হবে।

গোবিন্দ বললে, 'আজ বড় শক্ত হাতে পড়েছ দাদা ! পুলিশের চাইতেও কড়া।'

জীবনদা বললেন, "তাই ত' ভাবছি। কপালে যে কী আছে কে জানে !'

বোনটি এইবার ফোড়ন কাটলে—কপালে আজ তোমাদের অনেক দুঃখ লেখা আছে।

রতন এতক্ষণ অবাক হয়ে সব দেখছিল, সবাইকার কথা শুনছিল। কাছে টেনে নেবার ওরও ত' সংসারে কেউ নেই। এমনি যদি একটি দিদি পাওয়া যায় ত' আর কিচ্ছু সে চায় না। রতন বড় স্নেহের কাঙাল।

হঠাৎ রতন জিজ্ঞেস করে বসলো, 'আচ্ছা দিদি, তোমায় আমি কি বলে ডাকবো ?'

দিদি একটু থমকে দাঁড়ালো, তারপর দুই চোখে স্নেহের আমেজ এনে বললে, তোমাদের ত' কখনই ধরে রাখতে পারবো না ভাই, তাই আমাকে পথের দিদি বলেই ডেকো।

পথের দিদি আর দাঁড়ালো না, ওর হাতে আজ অনেক কাজ। তাড়াতাড়ি রান্না ঘরের দিকে ছুটে গেল।

জীবনদা বললে, 'চল রে তোরা, ভালো করে আগে তেল মেখে খালের জলে কাল রাত্তিরের কাদাগুলো ধুয়ে আসি।'

তিনজনে নিঃশব্দে খালের দিকে এগিয়ে চলে। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে এমনি সব বোন প্রীতির-প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রত্যহ তাদের মঙ্গল কামনা করছে। নইলে বিপ্লবী দল সাপে ভরা পিছল পথে রাতের অন্ধকারে পথ চলতো কি করে ?

সত্যি পায়ের কাদাগুলো শুকিয়ে সিমেন্টের মতো লেগে রয়েছে। এগুলো তোলা কম হাঙ্গামা নয়।

গোবিন্দ বললে, 'আজ রাত্তিরের মধ্যেই ওদের দু'জনকে জঙ্গল থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলতে হবে। নইলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

রতন বললে, 'কিন্তু দিদি কি আজ ছেড়ে দেবে ?'

জীবনদা এইবার হো-হো করে হেসে উঠলেন ; টিপ্পনী কেটে বললেন—কুম্ভকর্ণের

বাড়ির খানা আমাদের রতনচাঁদের ভালো লাগে নি। তাই যেই টাট্‌কা রুইমাছ আর পরমান্নের গন্ধ পেয়েছে অমনি আসন-পিঁড়ি হয়ে বসতে চাইছে।

পরক্ষণেই তিনি খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'রতন, বয়েস তোমার খুবই কম, সেটি আমি জানি। কিন্তু কি প্রতিজ্ঞা করে একদিন পথে বেরিয়েছিলে মনে নেই ?'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিতা আবৃত্তি শুরু করে দিলেন—

ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে ভগিনীর অশ্রুচোখ !

রতনের মনটা সত্যি ভারী খারাপ হয়ে গেল। অনাথ বালকের মতো স্রোতের শ্যাওলা হয়ে ঘুরে বেড়ানোই তার কাজ। পড়াশোনা তার সত্যি ভালো লাগে। কিন্তু এই পথে পা দেবার আগে যদি তার সঙ্গে পথের দিদির পরিচয় হতো তবে তারই স্নেহচ্ছায়ায় সে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু এখন সে জীবনদার হাত ধরে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। এখন মঙ্গল-শঙ্খের ডাকে পেছনে ফেরবার উপায় নেই।

দুপুরবেলা খেতে বসে জীবনদা হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, আমাদের দেশে অনেক রকম প্রতিযোগিতা আছে। এই যেমন ধরো, রতন সাঁতারে ফার্স্ট হয়েছিল। কিন্তু মাছভাজা খাবার প্রতিযোগিতা বোধ করি এর আগে আর কোথায়ও হয় নি। রতন, একবার চেষ্টা করে দেখবি নাকি ?

এই বলে জীবনদা নিজেই একটি বড় পেটিতে কামড় দিতে যাচ্ছেন, হঠাৎ বোনটি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলো—পুলিশ—

খালের দিকে একটা জানলা ছিল। সেই দিকে তাকিয়ে দেখা গেল দূরে একটি পুলিশের নৌকো। মুহূর্ত মধ্যে জীবনদা লাফিয়ে উঠলেন ; বললেন, ' গোবিন্দ, রতন, শীগগির। এবার আর নৌকোয় নয়। পায়ে হেঁটে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ওরা আসবার আগেই পালাতে হবে!'

পড়ে রইল বোনের সাজানো পরমান্নের থালা, পড়ে রইলো সারাদিন ধরে তৈরি করা বুভুক্ষু আত্মার প্রীতির পসরা ! জীবনদা দুইজনকে দুই হাতে চেপে ধরে উঠোনের মাঝখানে লাফিয়ে পড়লেন পাগলের মতো।

পথের দিদি ছুটে এসে রতনের হাতে কি একটা গুঁজে দিয়ে বললেন—মা মঙ্গলচণ্ডীর নির্মাল্য। সব সময় কাপড়ের খুঁটে বেঁধে রাখিস ! তোর পথের দিদির আশীর্বাদে অমঙ্গল কখনো তোকে স্পর্শ করতে পারবে না।

তিনজনে যখন উঠোন পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে চলেছে।

পথের দিদির চোখে তখন আর জল নয়—যেন আগুন জ্বলছে !

এগারো

জীবনদার দেহে যেন হাজার হাতীর বল। একদিকে গোবিন্দ আর একদিকে রতনকে ধরে জীবনদা দৌড়ের প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন।

ওরা দু'জনেও কম যায় না। সবাইকারই ব্যায়াম করার অভ্যাস আছে। লোকালয় ছেড়ে ওরা বনের পথ ধরে তীরবেগে এগোতে লাগলো।

জঙ্গলের পথ তত সমতল নয়, এবড়ো-খেবড়ো, উঁচু-নীচু। কোথাও-কোথাও কাঁটাগাছ। এখানে-ওখানে গাছের ডাল তাদের হাত মেলে পথ বন্ধ করে রেখেছে। সেইগুলোকে পাশ কাটিয়ে দ্রুতবেগে চলা বড় সহজ নয় !

গা ছড়ে যেতে পারে, মোটা গাছের ডালের সঙ্গে মাথার ঠোকা লাগতে পারে ; কাঁটাগাছের টানে কাপড় আটকে যেতে পারে। সব দিকে দৃষ্টি রেখে, নিজেদের বাঁচিয়ে দ্রুতবেগে পথ চলতে হবে।

মাইল দু'য়েক এইভাবে চলবার পর রতন হঠাৎ বলে বসলো, 'যাই বলুন জীবনদা, বড্ড খিদে পেয়েছে কিন্তু।

জীবনদা হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন ; বললেন—আমরা হচ্ছি এখন ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া। আমাদের কি আর খিদে-তেষ্টা থাকতে আছে রে ?

গোবিন্দ ফোড়ন কেটে মন্তব্য করলে—তা যাই কেন না বলো জীবনদা, রতন কিছু মন্দ কথা বলে নি। আহা, এমন বড় বড় মাছের পেটি ! সেইগুলো পাতের ওপর ফেলে কিনা পালিয়ে আসতে হল !

রতন চোখ দু'টোকে ওপরে তুলে ধ্যানমগ্ন সাধু-সন্ন্যাসীর মতো বললে—এই পুলিশের দল কিন্তু ভারী বেরসিক। আগে মাছগুলো খাই, তারপর পায়েসের বাটি সাবাড় করি। ততক্ষণে তোরা না হয় ধীরে-সুস্থে আয়, —গোঁফে চাড়া দে ; আর না হয় পেতলে-বাঁধানো লাঠিগুলোতে তেল মালিশ কর। তা নয় কি না—এমন গুরুতর পরিস্থিতিতে—হুট্ করে চলে আসা ! সত্যি বলছি জীবনদা, রস-কষ-জ্ঞান যদি ওদের বিন্দুমাত্র থাকে !

গোবিন্দ বললে—আমাদের সেই পাতে ফেলে আসা মাছগুলো এতক্ষণ ধরে পুলিশের পেটে গেল কিনা তাই বা কে জানে !

জীবনদা আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন। সেই প্রাণ-খোলা হাসির শব্দ শুনলে মানুষ দু'দণ্ডে দুঃখ-বেদনা সব ভুলে যায়।

জীবনদা হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—আমার বোনটিকে তোরা এখনো চিনিস নি। ও বড় দস্যি মেয়ে ! পুলিশের পেটে যাবার আগে—সব মাছ সে খালের জলে ফেলে দেবে। প্রাণে ধরে কাউকে এক টুকরো খাওয়াতে পারবে না। তবে কি জানিস ?—এতক্ষণে সব খাবার সে লুকিয়ে ফেলেছে। পাছে পুলিশ এত খাবারের

আয়োজন দেখে আমাদের প্রবেশ ও প্রস্থান কিছু টের পায়—সেইজন্য বোনটি ঝট্‌পট্‌ সব শিকেয় তুলে ফেলেছে। ভারী চটপটে মেয়েটি। বিদ্যুতের মতো ওর চাল-চলন। বিয়ের আগে তো বোনটি আমাদের দলেই ছিল। কত অসাধ্য সাধন যে ও করেছে—তা ভেবে আমিই অবাক হয়ে যাই।

আরো কিছু দূর এগোবার পর জীবনদা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন ; বললেন—দেখ, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। সবাই একসঙ্গে একদিকে যাবো না। তা'হলে ধরা পড়লে তিনজনেই জালে আটকে যাবো। আমাদের কাজ তাতে কিছুই হবে না। সব পণ্ড হবে।

রতন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—তা'হলে কি করতে হবে বলো না ! আমি একা একা আবার কোন্ দিকে ছুটবো ? রাস্তাঘাট কিন্তু আমি কিছুই জানি নে।

জীবনদা ততক্ষণে একটা মোটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়েছেন। দর-দর করে তাঁর গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। রতন ছেলেমানুষ, তাই সে তখনো ততটা কাহিল হয়ে পড়েনি।

গোবিন্দ কুকুরের মতো জিব বের করে কেবলি হাঁপাচ্ছে ! ওর আবার ঘামটা কম হয়।

জীবনদা বললেন—গোবিন্দ, তুই আমাদের কেন্দ্রে ফিরে যা। ওখানেই সবাইকে সাবধান হতে বলবি। কখন যে পুলিশ হামলা করে ঠিক নেই। জরুরী কাগজ-পত্র সব যেন সরিয়ে ফেলে।

ভয় পেয়ে রতন জিজ্ঞেস করলে—আর আমি? আমি আপনার সঙ্গেই থাকবো ত'?

নির্বিকার ভাবে জীবনদা জবাব দিলেন—না।

তবে ? প্রশ্ন করলে রতন। তার চোখে-মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা।

জীবনদা বললেন—রতন, শোন্. তুই এক কাজ কর। তুই সোজা চলে যা আমাদের বোনের বাড়ি। পুলিশ ব্যাটারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে। আর আমার বোনটি শুধু আতঙ্কে ঘর-বার করছে। তোকে পেলে ও অনেকটা ঠাণ্ডা হবে।

গোবিন্দ জিজ্ঞেস করলে—আর তুমি জীবনদা ?

জীবনদা জবাব দিলেন—আমাকে সেই জঙ্গলে ঢুকে বিপ্লবী ভাই দু'টিকে এক্ষুণি সরিয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে। নইলে পুলিশ যে রকম হন্যে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাতে ওদের ধরা পড়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। সবাই মিলে ধরা পড়ার চাইতে তিন জনে আমরা তিন দিকে ছড়িয়ে পড়ি। আমাকে আজ রাত্তিরের মধ্যে কাজ হাসিল করতেই হবে।

দুইজনের মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা। ওরা দুইজনে জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু তুমি একা যাবে জীবনদা? পুলিশ যদি পেছন থেকে হঠাৎ তোমায় ঘেরাও করে ফেলে ?

মৃদু হেসে জীবনদা বললেন—না রে ! সে ভয় নেই। পুলিশের সঙ্গে আমার দেখাই হবে না। সেই জঙ্গলে যাবার একটা সোজা পথ আমার জানা আছে। ঘন বনের ভেতর দিয়ে সেই রাস্তায় এগিয়ে যাবো।

এর পরেই তিন জনের পথ তিনমুখো হলো। জীবনদা ঘন বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ! গোবিন্দ নদীর তীর ধরে উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করে দিলে। আর রতন?

রতনের মনে তখন দারুণ উৎসাহ। সে ফিরে চললো তার পথের দিদির স্নেহমাখানো গোবর-নিকানো বাগান-সাজানো মনোরম বাড়িখানির দিকে।

রতন যেন এবার উড়ে চললো। তাই ত ! এত আনন্দও তার মনের কোণে জমা হয়েছিল! সে তা মোটেই জানতে পারে নি!

শিষ দিতে দিতে আপন মনে পথ চলতে লাগলো রতন। কিছুক্ষণ বাদেই ঘন বনপথ পেরিয়ে অনেকটা ফাঁকা জায়গায় এসে হাজির হল।

রতন ভাবতে লাগলো, হঠাৎ যদি তার পিঠে দু'টি পাখা গজিয়ে যায়, তবে সে উড়ে উড়ে একেবারে পরীর মতো পথের দিদির উঠোনে গিয়ে উপস্থিত হয়। ওকে দেখে পথের দিদির তখন এক চোখে হাসি আর এক চোখে জল দেখা যাবে।

আর রতন শুধু দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসবে। কোনো কথাই সে বলবে না।

আরো কিছু দূর এগোবার পর নদীর দিকে একটা শব্দ শুনে সে থমকে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, বিপদ সত্যি পদে পদে ! একটু দূরে নদীর কিনারে একটা নৌকো থেকে নামছে একদল পুলিশ। আর তাদের সঙ্গে সেই মোটা কুম্ভকর্ণ।

নামতে গিয়ে কুম্ভকর্ণের আর এক বিপত্তি। এত বড় বিরাট দেহ—যেমনি ঝপাৎ করে নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে জুতো একেবারে কাদার মধ্যে বসে গিয়েছে। সে কী করুণ দৃশ্য।

রতন একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কুম্ভকর্ণের দুর্গতি লক্ষ্য করতে লাগলো।

সেই মোটা জাঁদরেল লোকটা ক্রমাগত চিৎকার করছে আর পুলিশদের হুকুম করছে— ওরে টেনে আমায় কাদার থেকে তুলে নে ! আমি যে সেঁধিয়ে গেলাম—

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশরাও তৎপর হয়ে উঠল। কর্তা গর্তে পড়েছে, যে করেই হোক তাকে বাঁচাতেই হবে।

হেঁইও জোয়ান .....

এই মারো টান .....

সামাল পরাণ.....

উদর বাঁচান.....

এই গেল জান.....হাফিজ !!!

পুলিশদের গা দিয়ে দর-দর করে ঘাম ঝরতে লাগল। পুলিশের দল যত টানে—তত কুম্ভকর্ণ কাদার মধ্যে সেঁধিয়ে যায় !

এখন উপায় ? এ যে হাতির গর্তে পড়ার অবস্থা হল !

রতন কোনো রকমে হাসি চেপে মনে মনে ভাবলে, এমন একটা রগড়ের দৃশ্য একেবারে সবাইকার চোখের আড়ালে এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেল !

জীবনদা থাকলে নিশ্চয়ই হো-হো করে হেসে উঠতেন।

সিনেমা কোম্পানীর ক্যামেরাম্যানরা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে তার ঠিক নেই ! নইলে বহু টাকা খরচ করে যে দৃশ্য তুলতে হতো—তা এমন করে সবাই মিলে হেলায় হারালে !

এ দুঃখ রতনের হয়তো কোনো দিনই যাবে না !

কুম্ভকর্ণের যখন এই প্রাণ নিয়ে টানাটানি চলছিল তখন নৌকো থেকে একটি ছোকরা লাফিয়ে নেমে এলো। সবাইকে হাঁক দিয়ে বললে—এমন করে কিছুতেই হবে না। আমি একটা রশি দিচ্ছি। তার একটা দিক থাক বড়বাবুর হাতে, আর একটা দিক ধরে পুলিশের দল কষে টান মারতে শুরু করুক—যেমন করে বড় বড় গাছের গুঁড়ি টেনে তোলে নদীর ধার থেকে।

ছোকরার পরামর্শ মতো সেই ব্যবস্থাই করা হল। আবার শুরু হল টানাটানি আর লড়ালড়ি !

কর্তা তখন হাঁসফাঁস করে গোদা পা তুলে তুলে পুলিশ দলের সমবেত আকর্ষণে অনেক কষ্টে কাদার রাজ্যি পেরিয়ে শুক্‌নো ডাঙ্গায় এসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রতন সচকিত হল।

ওরা যে দল বেঁধে এই দিকেই এগিয়ে আসছে !

রতন যেখানে লুকিয়েছিল সে জায়গাটা অনেকটা ফাঁকা।

একটা গাছকে আড়াল করেই সে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু দল বেঁধে ওরা যদি কুম্ভকর্ণ সহ এই পথেই এগিয়ে আসে, তবে আড়ালের আর কিছুই থাকবে না।

কুম্ভকর্ণটা ওকে বিলক্ষণ চেনে। তা ছাড়া লোকটা ওর ওপর যে রকম চটে আছে, তাতে ধরা পড়লে আর কোনো মতেই রক্ষা নেই। কুম্ভকর্ণটা ওকে আস্ত গিলে খেতেই চাইবে।

মুহূর্তের মধ্যে সে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখল।

পলায়নের আর কোনো উপায় নেই। সামনে কিংবা পেছনে—যে দিকেই ছুটতে যাক না কেন, ওদের চোখে পড়ে যাবেই।

পুলিশ ব্যাটাদের হাতে আবার বন্দুক আছে। ওরা যদি রতনকে ছুটতে দেখে বেমক্কা গুলি চালিয়ে বসে তা'হলে আর রক্ষা নেই !

রতন লক্ষ্য করলে—একটু দূরেই একটা পাতকুয়া। ছুটে সেইখানে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে—পাতকুয়াটা একেবারে শুক্‌নো। ভেতরে জলের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই।

সে ভালো করে মাল্‌কোঁচা মেরে তরতর করে সেই শুক্‌নো পাতকুয়ার মধ্যে নেমে গেল।

ততক্ষণে পুলিশের দল নীচেকার ঢালু জমি ছেড়ে ওপরের দিকে অনেকটা উঠে এসেছে।

একটু বাদেই তাদের পায়ের জুতোর খস্‌খস্‌ শব্দ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল।

* * * * *

ওদিকে জীবনদা একা উল্কার বেগে ছুটে চলেছেন।

যে করেই হোক বিপ্লবী দু'জনকে আজ সন্ধ্যের মধ্যে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলতেই হবে।

যে বিপদের বেড়াজাল চারিদিক থেকে টেনে আনা হচ্ছে—ওরা দু'জন তার কোনো খবরই রাখে না। ওরা দু'টিতে জানে—এই জঙ্গলের মধ্যে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদেই আছে।

জীবনদাকে যথাসময়ে পৌঁছে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে ; নইলে পুলিশের হাতে দু'টি মূল্যবান জীবন একেবারে বিপন্ন হবে। প্রাণ থাকতে জীবনদা কখনই তা হতে দিতে পারেন না।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। তবু জীবনদার মনোবল এতটুকু নষ্ট হয়নি। তিনি পাগলের মতো আবার সেই আলো-আঁধারে ঢাকা বনপথ ধরে এগিয়ে চললেন। কাঁটা গাছে লেগে পা ছিঁড়ে যাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছেন কতবার ! খন্দ-খানায় পড়তে পড়তে—কোনো রকমে নিজেকে সাম্‌লে নিচ্ছেন।

তবু তিনি প্রাণপণে ছুটে চলেছেন ! কারণ দু'টি বিপ্লবী ভাই-এর মরণ-বাঁচন আজ তাঁর হাতে।

* * * *

পুলিশের দল বহু অনুসন্ধান করে যখন সেই গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলো, তখন খাঁচা থেকে পাখী পালিয়ে গেছে !

জীবনদা এরই মধ্যে অসাধ্য সাধন করেছেন। পুলিশ এসেছে নৌকো-পথে। কিন্তু জীবনদা হাঁটা পথে তার বহু আগে এসে বিপ্লবী দু'জনকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

যে খড়ের ঘরে তারা দু'টিতে বাস করতো সেটা আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলছে।

কোনো রকমের সন্ধান—এমন কি একটু কাগজ-পত্রও আর খুঁজে পাবার কিছুমাত্র উপায় রইলো না।

*　　*　　*　　*

ঠিক এই সময় রতন হাঁপাতে হাঁপাতে শ্রান্ত-ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত বেশে পথের দিদির উঠোনে ঢুকে হাঁক দিলে—দিদি, পায়েসের লোভেই আবার ফিরে আসতে হল। বাটির তলায় কিছু পড়ে আছে নাকি ?

দিদি ছুটে এসে অর্দ্ধ মৃত ভাইটিকে জড়িয়ে ধরে আপন মনে বললে—ভাগ্যিস্ মা মঙ্গলচণ্ডীর নির্মাল্য তোর হাতে গুঁজে দিয়েছিলাম, তাই তো আবার তোকে ফিরে পেলাম।

বারো

রতন দু'টো দিন একেবারে বেহুঁশ হয়ে বিছানায় পড়ে রইলো।

ওর শরীরের ওপর দিয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম গেছে। তারপর অনাহারে, অনিদ্রায় এমনিতেই ছেলেটা খুব কাবু হয়েছিল।

ওর কচি মনটা কখনো আনন্দে, কখনো বেদনায় দোল খেয়েছে। তাই বুঝি ছোট মগজের ওপর সব কিছু চাপ সইতে পারেনি !

তিন দিনের দিন রতন চিৎকার করতে শুরু করলো—মাথা গেল—মাথা গেল !

পথের দিদি ভারী ভয় পেয়ে গেল, ওর শরীরের অবস্থা দেখে।

বাড়িতে কোনো ব্যাটা ছেলে নেই, হঠাৎ যদি সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু ঘটে বসে, তা'হলে লজ্জা লুকোবার আর ঠাঁই থাকবে না।

পথের দিদি আতঙ্কিত মনে কেবলই ঘর-বার করতে লাগলো।

গ্রামে একজন প্রবীণ আর বিচক্ষণ কব্‌রেজমশাই আছেন। দিদি মনে মনে ঠিক করলে তাঁর কাছেই লোক পাঠাতে হবে।

দিদির বুড়ি শাশুড়ীরও মনে একটু স্বস্তি নেই।

তিনি কেবলই হাঁক দিচ্ছেন—অ বৌমা, এই দুধের বাছা আমার বাড়িতে বেঘোরে প্রাণ দেবে ? তা'হলে আমার পাপের সীমা থাকবে না। আমি চোখে আঁধার দেখছি! ছেলেটা আমার বাড়িতে থাকে না। আমি কি করি বলতো বৌমা ? ভয়ে যে আমার হাত-পা পেটের ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

পথের দিদি তার শাশুড়ীকে ঘরের কোণে বসিয়ে দিয়ে বললে, আপনি মিছিমিছি

ব্যস্ত হচ্ছেন মা? আপনার ছেলে বাড়িতে নেই, আমি ত' রয়েছি। আপনি সুস্থির হয়ে দু'দণ্ড বসুন দেখি! আমি এক্ষুণি কব্‌রেজমশাইকে ডেকে আনতে লোক পাঠাচ্ছি।

পাশের বাড়ির চঞ্চল ছিপ নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল।

দিদি ডাকলে—ও চঞ্চল, শুনে যা দেখি এদিকে।

চঞ্চল বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে—আবার পিছু ডাকছ কেন বৌদি? দেখছ না মাছ ধরতে রওনা হয়েছি। হাতে আমার এতটুকু সময় নেই।

দিদি ফোড়ন দিয়ে উত্তর দিলে—হুঁ! ভারী রাজ্যি জয় করতে ছুটছে ছেলে, এতটুকু দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই! ভালোয় ভালোয় আয় বলছি। নইলে তোর দাদা বাড়িতে ফিরে এলে এমন মার খাওয়াবো—

এ বাড়ির দাদাকে চঞ্চলের ভারী ভয়। তা ছাড়া বৌদির ফাইফরমাস খাটার জন্য দাদার কাছ থেকে নানারকম উপহারও তার লাভ হয়।

তাই মুখ গোমড়া করে চঞ্চল বৌদির পাশে এসে দাঁড়াল।

পথের দিদি রোগ-শয্যায় শায়িত রতনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ওই, দেখ তোরই বয়সী একটি ছেলে—জ্বরে বেহুঁশ হয়ে আছে।' তুই কি না কব্‌রেজ মশাইকে ডেকে না দিয়েই মাছ ধরতে ছুটেছিস?

এইবার চঞ্চল লজ্জা পেয়ে; বললে—বাঃ রে! আমি সে-কথা জানবো কেমন করে? তারপর গলাটা খাটো করে আবদারের সুরে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বৌদি ও ছেলেটা তোমার কে হয়?

পথের দিদি উত্তর দিলে—আমার ছোট ভাই হয় রে! দেখবি, জ্বর ছেড়ে গেলে তোর সাথে আলাপ করিয়ে দেবো। তোর একেবারে বন্ধু হয়ে যাবে।

চঞ্চল ছিপ হাতেই একেবারে লাফিয়ে উঠল। বললে, 'সে কথা আগে বলতে বৌদি। আমি এক ছুটে কবরেজমশাইকে ডেকে নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, ভালো কথা ওর নামটা কি বৌদি?

মুচকি হেসে পথের দিদি উত্তর দিলে—আমার ভাইয়ের নাম রতন রে, রতন।

চঞ্চল যেন নামটাকে লুফে নিলে, আঁ্যা, রতন! চমৎকার নাম ত'! আমার নাম কিন্তু অত ভাল নয়।

পথের দিদি বললে, 'কেন রে? চঞ্চল নামটাও ত' বেশ ভালো। তুই যেমন সবসময় ছটফটে, তেমনি তোর নামটাও হয়েছে চঞ্চল।

চঞ্চল বললে—তোমার ভাই ভালো হয়ে উঠলে আমরা বন্ধু হবো। একসঙ্গে মাছ ধরতে যাবো। বুঝলে বৌদি?

পথের দিদি তখন খিল-খিল করে হেসে উঠল; তারপর বললে—অত মাছ কিন্তু আমি রান্না করে দিতে পারবো না।

রসিকতায় চঞ্চলও কম নয়। সেও কৌতুক করে উত্তর দিলে—তা বৈ কি। তখন দেখবো, আমায় লুকিয়ে নিজের ভাইটিকে রান্নাঘরের কোণে বসিয়ে রাশি রাশি মাছভাজা খাওয়াচ্ছ!

দিদি ওর কথা শুনে তেড়ে মারতে গেল—তবে রে হিংসুটে! তোকে বুঝি কখনো থালা ভর্তি মাছভাজা খাওয়াইনি?

চঞ্চল হাসতে হাসতে এক ছুটে পালিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল—একেবারে কব্‌রেজমশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছি। তাঁর সামনে ত' আর তুমি আমায় কিছু বলতে পারবে না!

* * * *

তারপর একমাস রতনকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি!

এদিকে মৃত্যু-দূত, আর একদিকে পথের দিদি ও চঞ্চল।

সত্যিকারের রোগীর সেবা কাকে বলে—বৌদি আর দেওর তাই দেখিয়ে দিলে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, আলস্য নেই, জগতের আর কোনো দিকে চোখ মেলে তাকানো নেই, শুধু মানুষটিকে কিভাবে বাঁচিয়ে তোলা যাবে, সেই জন্য দু'টি অনির্বাণ দীপ-শিখা যেন রতনের শিয়রে জেগে ছিল।

মৃত্যু-দূত সেই শিখার তীব্র জ্যোতি সহ্য করতে না পেরে ভয়ে পালিয়ে গেল।

যেদিন রতন অন্ন-পথ্য করলে—তিন গাঁয়ের বৌ-ঝিরা বাড়িতে ভেঙে পড়ল। সবাই বৌয়ের সেবার ধন্যি-ধন্যি করতে লাগল। চঞ্চল বাঁকা চোখে ফোড়ন কাটলে—সব প্রশংসাই বুঝি বৌদির একার প্রাপ্য? আমার ভাগ্যে ছিটে-ফোঁটা কিছু রইলো না?

বাড়ির প্রবীণা গৃহিণী ফোক্‌লা দাঁতে ফিক্-ফিক্ করে হাসতে লাগলেন। বললেন—হ্যাঁ, সেকথা স্বীকার করতেই হবে। চঞ্চল ছিল বলে আমার বৌমার পরাণটা বেঁচেছে। নইলে ভাইয়ের সেবা করতে গিয়ে নিজেকেই শয্যা নিতে হতো।

সেদিন বুড়ি ট্যাঁকের টাকা খরচ করে সবাইকে মিষ্টিমুখ করালেন।

নতুন জীবন পাবার সঙ্গে সঙ্গে রতন একটি নতুন বন্ধুও লাভ করলো। সে বন্ধুটি চঞ্চল। পথের দিদিকে কেন্দ্র করে ওদের দুই বন্ধুর খুনসুটি লেগেই আছে।

কে বেশী আদর কেড়ে নিচ্ছে—তাই নিয়ে দুই বন্ধুর কপট-কলহ! রতন আর চঞ্চল নতুন করে বাড়ি সাজাতে বসলো।

পথের দিদি ঝুমকোলতা ভালোবাসে, তাই দুই বন্ধু নিয়ে অনেক খুঁজে পেতে কোত্থেকে ঝুমকোলতার চারা নিয়ে এসে বাড়ির সামনে বাঁশের ফটকে লাগিয়ে দিলে।

পথের দিদি রসিকতা করে বলে—ওই ঝুমকোলতাটা যেন রতনের প্রাণ। বড় অসুখের পর রতনের শরীরটা যেমন ধীরে ধীরে ভালো হয়ে উঠছে, ঠিক তেমনি ঝুমকোলতাটাও ফন্ ফন্ করে বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আর কয়েকদিন পরই ফুল ফুটবে।

চঞ্চল ব্যস্ত হয়ে শুধোলে—আর আমার প্রাণ কিসে বৌদি ?

বৌদি চোখ টিপে উত্তর দিলে—আমার দেওরের প্রাণ রয়েছে ধানীলঙ্কা গাছে। ও ঠিক ধানীলঙ্কার মতোই ঝাল আর চঞ্চল কিনা !

চঞ্চল মুখ ভার করে উত্তর দেয়—হুঁ ! বুঝতে আর বাকি নেই আমার ! নিজের ভাইটিকেই শুধু আদর করা ! আমি দাদার ভাই কিনা, তাই যেন বানের জলে ভেসে এসেছি !

রতন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে—না না, চঞ্চল, বানের জলে ভেসে আসবে কেন ? চঞ্চল শুধু বানের জলে মাছ ধরে বেড়াবে !

তিন জনে মিলে হো-হো করে হেসে উঠলো।

সত্যি, এটা মাছেরই দেশ। নদী-নালা-খাল-বিলে পোকার মতো মাছ কিল-বিল করছে।

একদিন দিদি বললে—হ্যাঁরে, তোরা তো দিন-রাত বন বাদাড়ে ঘুরে বেড়াস। একটা ময়না পাখী ধরতে পারিস নে ? ময়না কিন্তু চমৎকার কথা বলে।

তখন দুই বন্ধু উঠে-পড়ে লাগলো—কি করে একটি ময়না ধরা যায়।

চঞ্চলের মাথার অনেক ফন্দী-ফিকির আসে। ও চটপট একটি জাল তৈরি করে ফেললে। তাই নিয়ে দুই জনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো—বনে-জঙ্গলে, এখানে-ওখানে।

অবশেষে ছোলা-ক্ষেতে মিললো একটি ময়না। সবাই বললে, ছোলা খেতে এসেছিল।

ময়না দেখে দিদি ভারী খুশী।

রতন বাঁশ কেটে সুন্দর একটি খাঁচা তৈরি করে ফেললে। এখন ময়নাকে নিয়েই তিনজনের অর্ধেক দিন কাটে। কে আগে ওকে কথা শেখাবে, তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে।

দিদি বলে—পড়ো ময়না, —রা—ধা—কে—ষ্ট !

চঞ্চল বলে— Twinkle—twinkle—little star !

রতন শেখায়—

আমি দাঁড়ের ময়না—
খিদে আমার সয় না !!

ময়না চুপ করে বসে শুধু মাথা নাড়ে, আর কুটুস্‌-কুটুস্‌ করে ছোলা ঠুকরে খায় !

* * * *

দিন আসে—দিন যায়।

আস্তে আস্তে সেই ময়না শিস্‌ দেয়—নানা রকম বোল বলতে শেখে।

পাড়ার বৌ-ঝিরা এসে ময়নাকে ঘিরে ধরে। ওর মুখের শিস্‌ শুনে সবাই হেসে কুটি-কুটি !

সেদিন রাত্তিরে যেমন ঝড়, তেমনি জল !

রতন বললে, 'পড়াশোনায় আজ আর মন লাগছে না।'

দিদি এগিয়ে এসে বললে—অনেক বিদ্যে হয়েছে। খিচুড়ি রান্না করেছি ; গরম-গরম ভাজা দিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়।

সেদিন ওরা খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে সকাল-সকাল শুয়ে পড়লো।

গভীর রাত্রে যেমন ঝড়ের মাতামাতি, তেমনি অবিশ্রাম জল পড়ার শব্দ !

দুই ভাই-বোন দুই খাটে শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করে—ঘুম আর কিছুতেই আসে না।

হঠাৎ শোনা গেল—দরজায় টক-টক শব্দ ! দুই জনে কান খাড়া করে শুনলে। কিন্তু কেউ কাউকে ডাকলে না।

আবার সেই টক-টক শব্দ !

পথের দিদি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলে। সারা গা জলে ভেজা জীবনদা এসে মূর্তিমান ধূমকেতুর মতো ঘরে ঢুকলেন।

দুই ভাই-বোন আনন্দে আর বেদনায় চিৎকার করে উঠলো—জীবনদা, তুমি !

জীবনদা জবাব দিলেন—হ্যাঁ, আমি। ভূত নই। রতন, এক্ষুণি আমার সঙ্গে তোকে বেরোতে হবে। চটপট তৈরি হয়ে নে।

পথের দিদি যেন সহসা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো—না না, ওকে নিয়ে যেও না জীবনদা। শক্ত অসুখ থেকে ও উঠেছে।

গম্ভীর গলায় জীবনদা জবাব দিলেন—সব জানি। গেলাস-গেলাস দুধ খেয়ে এখন ওর শরীর বেশ সবল হয়েছে। আমার চাইতেও ও এখন সুস্থ আছে—ওকে আজ আমার সঙ্গে বেরোতেই হবে !

রতন আর্তনাদ করে উঠলো।

দিদির এই প্রাণঢালা স্নেহ, এমন-সাজানো-গোছানো সংসার, ওদের ঝুমকোলতার সবে ফুল ফুটেছে, ময়নাটা খাঁচায় বসে কত কথা বলে !

রতন বললে, 'না না, আমি পথের দিদিকে ছেড়ে, ময়নাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।'

সহসা যেন আগুনের হল্‌কা বেরিয়ে এলো জীবনদার গলা থেকে—কী বললে ! ময়না ?

এক ছুটে গিয়ে জীবনদা খাঁচা খুলে ময়নাটাকে উড়িয়ে দিলেন। জানালা গলিয়ে মিশকালো আঁধারের মধ্যে ময়নাটা যে কোথায় হারিয়ে গেল—কিছু বোঝা গেল না।

জীবনদা রতনের হাতটা শক্ত করে ধরে বললেন, 'চল্, শীগ্‌গির আমার সঙ্গে।'

পথের দিদি করুণ কণ্ঠে শুধোলে, 'জীবনদা, এই জল-ঝড়ের মধ্যে আবার এক্ষুণি ওকে নিয়ে বেরুবে ? কিছু খেয়ে যাবে না ?'

জীবনদা গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, 'ওকে তুই ভালো শিক্ষা দিস নি বোন।' তাই আজ তোর এখানে আমি জল গ্রহণ করবো না। যেদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবি—সেইদিন আবার ফিরে এসে চেয়ে নিয়ে তোর হাতের মাছ-ভাত খাবো। জেনে রাখ বোন, ঝুমকোলতার ফুল, আর খাঁচার পোষা ময়না—বিপ্লবী ভাইদের জন্য নয়।

কখন ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে কেউ জানে না।

ওরা অনেকগুলো নৌকো করে নিঃশব্দে এসে পৌঁছলো এক মহাজনের বাড়ির খিড়কির ঘাটে।

বাড়িতে সানাই বাজছে। বহু আত্মীয়-স্বজন এসেছে উৎসব উপলক্ষে।

পিল-পিল করে বিপ্লবী মানুষগুলো বেরিয়ে বাড়িটাকে ঘেরাও করে ফেললো।

জীবনদাকে দেখা গেল বাড়ির চিলে-কুঠুরীর ছাদের কার্নিশে। হাতে তাঁর উদ্যত রিভলভার।

হুঙ্কার দিয়ে জীবনদা বললেন, 'কেউ এতটুকু নড়বার চেষ্টা করেছেন কি—গুলিতে মারা পড়বেন। মহাজন মশাই, লোক ঠকিয়ে সারা জীবন অনেক অর্থ জমিয়েছেন। এখন লোহার সিন্ধুকের চাবি বের করে দিতে হবে।

তারপর মেয়েদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'মায়েদের কোনো ভয় নেই। তাঁদের সম্মান এতটুকু নষ্ট হবে না। সবাইকে আমি বলছি—নিজের নিজের গায়ের গয়না খুলে পায়ের কাছে রাখুন। আমার লোক গিয়ে সব কুড়িয়ে নেবে। কেউ আপনাদের গায়ে হাতও দেবে না।'

জীবনদার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝন্ করে সব সোনার গহনা হরির লুটের মতো মাটিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

বাড়ির মালিক—মহাজন পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন—হাম দেখ্‌লেঙ্গে ! দারোগা সায়েব হামারা দোস্ত হ্যায় ! এ কি মগ-কা মুল্লুক হ্যায় !

তাঁর সেই চিৎকার কান্নার মতো শোনাতে লাগলো।

তেরো

খাঁচা থেকে যে পাখী একবার পালিয়ে যাবার সুযোগ পায়, সে আর লোহার শেকলে পা বাড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসে না।

মানুষও ঠিক তাই তার উল্টো। স্নেহের শৃঙ্খল মানুষ বড় ভালোবাসে।

যার কাছ থেকে সে এতটুকু স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা পেয়েছে, বারে বারে তারই বন্ধনে সে ধরা দিতে চায়।

এ বাঁধন বড় মধুর—বড় কামনার ধন।

রতনের মনে এই মধুর আশা বাসা বেঁধেছিল যে, জীবনদা আবার হয়ত তাকে পথের দিদির শান্তির নীড়ে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

কিন্তু রতন বলি-বলি করেও মুখ ফুটে সে-কথা প্রকাশ করতে পারেনি।

রতনের মনের মাঝখানে একান্ত বাসনা—জীবনদাই সে-কথা আপনা থেকে বলুন তাকে। আগেকার মতো মুখে সেই জ্যোছ্না-ধোয়া হাসি এনে বলুক—ওরে রতনা, চল তোকে তোর পথের দিদির কাছেই পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার মাথায় এখন কত কাজের বোঝা ! তার ওপর তোর বোঝা আর বইতে পারবো না বাপু।

কিন্তু মানুষ যা চায়, ঠিক তার উল্টোটি ঘটে বসে থাকে।

নৌকো চলেছে ফিরতি মুখে। জীবনদা বুদ্ধি করে দল-বল সবাইকে একসঙ্গে রওনা হতে দেন নি।

একদল গেছে হাঁটা পথে—এদিক-ওদিক ছড়িয়ে—গঞ্জে-হাটে-বাজারে গাঁয়ের চেনা আস্তানায়। কয়েকটি দল রওনা হয়েছে নৌকোতে। কিন্তু বিভিন্ন দিকে তারা নৌকো চালিয়ে গভীর রাতেই রওনা হয়ে গেছে।

জীবনদা রতনকে সঙ্গে নিয়ে একটি ছোট্ট নৌকোয় উঠেছেন। এবার জীবনদা সেজেছেন এক মুসলমান কৃষক আর রতনকে সাজিয়েছেন তার ছেলে। নৌকো শেষ রাত্তিরের আলো-আঁধারী ক্ষীণ চাঁদের জ্যোছ্নায় এগিয়ে চলেছে—বোধ করি নিরুদ্দেশের পথে।

কোন্ দিক থেকে ওরা এলো—এখন কোন্ দিক পানে চলেছে—রতন কিছুই ঠাহর করতে পারে না।

ছোট্ট নৌকো দুলছে আর সেই সঙ্গে দুলছে রতনের ছোট্ট মনটা।

একটা লণ্ঠন বাঁধা রয়েছে নৌকোর ডানদিকের ছইয়ের বাঁকা বাঁশের সঙ্গে। সেটা যত না আলো দিচ্ছে—কালো-কালো ধোঁয়া ছড়াচ্ছে তার চাইতে অনেক বেশী।

ছইয়ের ফাঁক দিয়ে যেটুকু আকাশ চোখে পড়ে—রতন সেই দিক পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে—আকাশের গায়ে রাশি রাশি তারা জ্বলছে আর নিবছে।

মাথার ওপরকার কালপুরুষ একদিকে হেলে পড়েছে। দু-একটি নিশাচর পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে—দূর দিগন্ত থেকে।

রতন অপলক-নেত্রে তাকিয়ে থাকে মিশকালো আঁধারের দিকে। কানে ভেসে আসে নদীর ছল্-ছল্ শব্দ। পাটাতনে মাথা রেখে শুয়ে আছে বটে, কিন্তু চোখের দু'টি পাতা থেকে ঘুম একেবারে ছুটি নিয়ে পালিয়েছে।

কখনো রতনের মনে হচ্ছে—অন্য একটি নৌকো থেকে ক্ষীণ বাঁশীর শব্দ ভেসে আসছে। চঞ্চল নদীর জল সেই সুরটাকে যেন কুলকুচো করে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে মজা পাচ্ছে।

রাত তখন কত, সেটাও ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না। ভোর হতে তখনো কিছুটা বাকি আছে। নিঃশব্দে আর চারটি মানুষ কেবলি দাঁড় টেনে চলেছে। তাদের মুখে এতটুকু কথা নেই। পরণে তাদের মাঝির মতোই ময়লা ছেঁড়া কাপড়, কোমরে শক্ত করে গামছা বাঁধা।

ছপ্-ছপ্-ছপ্-ছপ্ শব্দ একটানা শোনা যাচ্ছে।

ওই চারজন মানুষ অন্ধকারে ঘাপটি মেরে শুধু দাঁড় টেনে চলেছে। দেখে মনে হয়, একমাত্র দাঁড় টানা ছাড়া বিশ্ব-সংসারে ওরা যেন আর কিছুই জানে না। কিন্তু রতন ভালো করেই জানে, ওরা এক একজন নামকরা বিপ্লবী, ওইভাবে আত্মগোপন করে আছে। সবরকম কাজে ওরা দক্ষ। সংসারের সুখ-শান্তি, আনন্দ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়ে একমাত্র ভারত-ভূমির মুক্তির জন্য রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে তপস্যা করে চলেছে।

কবে এরা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করবে, আর ভারতের স্বাধীনতা উজ্জ্বল অরুণের মতোই পুবের আকাশকে রঙ্গীন করে তুলবে—দেশের ভাগ্য-বিধাতাই বুঝি তা বলতে পারেন !

অতটুকু ছেলে রতন—কিন্তু সে এখন অনেক কথা ভাবতে চেষ্টা করে কিন্তু একটু বাদেই ওর ভাবনার সূতো হঠাৎ একটা আচমকা হাঁক-ডাকে ছিঁড়ে গেল !

জীবনদা ততক্ষণে পাটাতনের ওপর একটা কিল মেরে বললেন, 'ওরে আবদুল, ঘুমুচ্ছিস—না জেগে আছিস ?'

রতন প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেনি—আবদুল আবার কে ?

আবার জীবনদার হুমকি শোনা গেল—কি রে আবদুল, মুখে যে বোবা কাঠি ছুঁইয়ে বসে আছিস ! কথাটা তোর কানে গেল ?

ততক্ষণে রতন বুঝে নিয়েছে, নৌকোর ওপর ওর নতুন নামকরণ হয়েছে আবদুল। বিপ্লবীদের যে প্রতি মুহূর্তে নাম পাল্টে যায়, সে কথা ওর ভোলা উচিত হয় নি। তাড়াতাড়ি উঠে বসে জিজ্ঞেস করলে রতন—কি বলছেন, জীবনদা ?

সঙ্গে সঙ্গে জীবনদা একেবারে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন হুঁ! জীবনদা! কেন, বাপজান বলতে কি হয় ? নৌকোয় ওঠবার সময় এত যে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলাম, সব ভর্স্মে ঘি ঢালা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি ! দিদির বাড়িতে মাছের মুড়ো আর দুধ খেয়ে খেয়ে তোর মগজে আর কিচ্ছু নেই দেখতে পাচ্ছি। দিন কয়েক আমার সঙ্গে থাক—শুক্‌নো চিঁড়ে-মুড়ি খেয়ে দিন কাটা, তবে তো আবার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগবে !

রতন তাকিয়ে দেখে—জীবনদা ওর দিকে চেয়ে মিটি-মিটি হাসছেন !

তাই তো! সব কিছু গুলিয়ে গেল নাকি রতনের ? সে তো এখন মুসলমান চাষীর ছেলে। যাকে সে জীবনদা বলে ডাকছে, তারই ছেলে সেজেছে সে। এখন 'বাপজান' বলে না ডাকলে, সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে ! তাই মাথাটাকে গুড়ের কলসীর মতো ভালো করে একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কি বলছ বাপজান?

ওর বাপজান হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—তবু ভাগ্যি যে, আমার পোলার চ্যাতন হয়েছে! গলাটা যে কাঠ হয়ে গেল রে আবদুল ! ভালো করে এক ছিলিম মিঠে-কড়া তামাক সাজ তো দেখি! দু'টো সুখ-টান দিয়ে একটু আমেজ করে নেই।

আবদুল হুঁকোটা টেনে নিয়ে তামাক সাজতে বসলো !

বেশ করে তামাক সেজে টিকে ধরিয়ে ফুঁ দিয়ে তাকে টানবার মতো তৈরি করে আবদুল বাপজানের হাতে হুঁকোটা তুলে দিয়ে—কি যেন বলবার আশায় তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

আবদুলের বাপজানের তখন অন্য দিকে তাকাবার বিন্দুমাত্র ফুরসৎ নেই। হুঁকোটা হাতে নিয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টেনে চলছে তো টেনেই চলেছে। মাঝে মাঝে মাথাটা একটু নাড়ছে তৃপ্তির আনন্দে।

এইবার মনে একটু সাহস যোগালো আবদুলের। আরো একটু এগিয়ে এসে তারপর জিব দিয়ে ঠোঁট দু'টোকে একটু ভিজিয়ে নিয়ে শুধোলে, আচ্ছা বাপজান, এখন কোথায় চলেছি আমরা ? আমি কি আর দিদির বাড়ি ফিরে যাবো না ?

বাপজান সঙ্গে সঙ্গে হুঁকোটা নামিয়ে নিয়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো ; বললে—হুঁ ! বেশ বুঝতে পারছি যে, দিদির বাড়ির খাওয়া-দাওয়ায় শরীরে বেশ চেকনাই হয়েছে। জিবে স্বাদ লেগেছে—তাও মালুম দিচ্ছে আমার। তবু বলি আবদুল, ওখানে এখন তোমার যাওয়া হবে না।

তাই তো ! দিদির বাড়ি যাওয়া এখন হবে না ! তা'হলে কোথায় চলেছে এখন আবদুল ?

আবদুলের দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইলো। কিন্তু কাউকে তো সেই চোখের জল দেখানো চলবে না। সে ভারী লজ্জার বিষয়।

ভাগ্যিস নৌকোর ভেতরটা বেশ অন্ধকার। আলোর চাইতে ধোঁয়া বেশি। হাতের চেটো দিয়ে আবদুল উদ্গত অশ্রুকে আটকে দিলে ; তারপর ভয়ে ভয়ে আবার বাপজানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না!

বাপজান আড়চোখে ওর মুখের অবস্থা দেখে হো-হো করে হেসে উঠলো ; বললে—অমনি আমার পোলার মুখ ভার হল।

একটু বাদে আবদুলকে কাছে টেনে নিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বাপজান বললে—ওরে বোকা ছেলে, দিদির বাড়িতেই কি তোর দিন কাটবে? বাবুইবাসা বোর্ডিংকে কি তুই একেবারে ভুলে গেলি ?

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর নাম শুনে এক মুহূর্তে আবদুল যেন একেবারে রতন হয়ে গেল।

হ্যাঁ, সত্যি কথাই তো !

বাবুইবাসা বোর্ডিংকে সে যেন একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। সেখানকার ছেলের দলের মধুর সাহচর্য্য, সেখানকার নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতের টানে অবিরাম সাঁতার কাটা, সেখানকার নদীর ধারে ঝাউগাছের শীতল ছায়ায় সোজা একটানা আনন্দের পথ। সেখানকার পাখী-ডাকা রঙীন সকাল, আর হলদে বিকেল—সব একে একে যেন ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল ! আর সব চাইতে আশ্চর্য মানুষ হচ্ছেন সনাতনবাবু! এমনি দেখতে দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ, কিন্তু কাজের সময় এলে সেই ঢিলে-ঢালা আমুদে লোকটি এক মুহূর্তে যেন লোহার মতো শক্ত হয়ে যান। তখন আর তাঁকে টলানো বা গলানো যায় না.!

সেই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ তাকে এতদিন পর ফিরে যেতে হবে ?

সত্যি, আনন্দে যেন তার নাচতে ইচ্ছে হচ্ছিল। সেই সনাতনবাবুর পায়ের ধুলো সে এতদিন বাদে নিতে পারবে ! তাঁর একান্ত কাছে বসে—বোর্ডিং-এর এতদিনকার জমা গল্পগুলো ঝুড়ি ঝেড়ে যোগাড় করতে পারবে !

কি করে এতদিন সে সনাতনবাবুকে ভুলে ছিল ? এর মধ্যে একবারও তো সেই সদাশিব মানুষটির কথা তার মনে হয় নি !

সনাতনবাবু কুশলে আছেন তো ?

জীবনদা বোধ করি রতনের মনের কথাগুলো মন দিয়ে পড়ছিলেন।

তিনি এইবার তার মাথায় হাত রেখে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন—না রে, আমাদের সনাতনদার শরীর ভালো নেই। ওঁকে ভালো করে সেবা

করার মানুষও নেই। আর সেই জন্যই তো তোকে নিয়ে যাচ্ছি সোজা তাঁর কাছে। আমার মাথায় এখন হাজার কাজের বোঝা। আমি তো ওখানে থাকতে পারবো না। তোকে পৌঁছে দিয়েই আমায় আর এক পথে পালাতে হবে!

খানিকটা চুপ করে রইলেন জীবনদা।

তারপর জীবনদা আপন মনেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন—

"যে শুনেছে কানে—তাঁহার আহ্বান-গীত
ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট-আবর্ত মাঝে—
দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন—
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি।'

একটু চুপ করে থেকে জীবনদা বললেন, না রে, সনাতনদা ভালো নেই। একটা দারুণ শক্ত কাজ সমাধা করতে গিয়ে তিনি সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন। কিন্তু জানিস তো ভাই, বিপ্লবীদের হাসপাতালে যাওয়া চলে না। সেখানে হাজারো প্রশ্ন, শতেক সন্দেহ ! তাই সবাইকার আড়ালে সেবা করে তাঁকে ভালো করে তুলতে হবে। আর সে ভার আমি তোর হাতেই দিতে চাই।

এইবার লজ্জা পেল রতন। সে শুধু নিজের সুখের উদ্দেশ্যে দিদির বাড়ির নিশ্চিন্ত আরামের জন্য আঁকু-পাঁকু করছিল। কিন্তু যাঁর রোগশয্যার পাশে তার উপস্থিত থাকার একান্তভাবে প্রয়োজন তাঁর কথাই সে ভুলে বসেছিল। সনাতনবাবুকে ভুলে থাকা কি তার উচিত হয়েছে ? কষাঘাতে কষাঘাতে সে নিজের মনকে সচেতন করে তুললো।

না—না—এখন আর কোথাও নয়। সনাতনবাবুর রোগশয্যার পাশেই তার স্থান। রতন মনে মনে আবৃত্তি করলে জীবনদার শেখানো কবিতা—

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলাম শুধু লজ্জা—
এবার সকল অঙ্গ ঘেরি
পরাও রণ-সজ্জা॥"

নৌকোটি ঠিকমত চলতে পারছে না।

রতনের মনে হলো, ওরা যেন অনেকক্ষণ থেকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আরো দাঁড় ফেলতে পারে না বিপ্লবী ভাইরা ? শত দাঁড়—সহস্র দাঁড় ?

পক্ষিরাজ ঘোড়ার বেগে এই মন-পবনের নৌকো উড়ে যাবে পথের সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে ?

সূর্যোদয়ের আগেই এরা গিয়ে পৌঁছুবে সেই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ—নদীর জলের আরশিতে যার ছায়া ভাসে দিনরাত। নৌকো থেকে ছুটে নেমে তর্‌তর্‌ করে ওপরে উঠে—ঝাউগাছের পথটা পেরিয়ে বোর্ডিং-এর ভেতর দ্রুত পা চালিয়ে দেবে !

পৌঁছবে গিয়ে সনাতনবাবুর রোগশয্যা-পার্শ্বে। তিনি হয়ত তাঁর জানালায় দু'টি আকুল চোখের প্রদীপ জ্বেলে রেখেছেন—কখন রতন আসবে ! কখন তার ছোট্ট হাতখানি সনাতনবাবুর উত্তপ্ত ললাট স্পর্শ করবে !

চৌদ্দ

যে আবেগ নিয়ে রতন দ্রুতবেগে সনাতনবাবুর রোগশয্যা-পাশে ছুটে গিয়েছিল, বোধ করি তার চাইতেও আকস্মিক আঘাতে সে একেবারে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হয়ত রতনের চলার শক্তি মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এ কী, সনাতনবাবুর দু'টি চোখ অন্ধ হয়ে গেছে ! একটা বুকফাটা আর্তনাদ করে রতন সনাতনবাবুর ডান হাতটা চেপে ধরলে। মুখে সে আর কোন কথাই বলতে পারলে না।

অনেকক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় না তার। শুধু ফোঁটা-ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ে সনাতনবাবুর বিরাট বুকটা ভাসিয়ে দিতে লাগলো।

এত দুঃখেও সনাতনবাবুর মুখ থেকে হাসি হারিয়ে যায়নি।

কৌতুক করে তিনি বললেন, 'কি রে রতন, তুই যে একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দিলি ?'

রতন রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'আপনি যে আর চোখে দেখতে পারেন না স্যার !'

এত বেদনাতেও হো-হো করে হেসে উঠলেন সনাতনবাবু। বুঝি পাষাণ ভেঙে নির্ঝরের জন্ম হল। বললেন, 'চোখে দেখতে পাবো না তাতে কি হয়েছে রে ? তোর তো দু'টি চোখ আছে। আজ থেকে তোর চোখের ভেতর দিয়ে আমি দেখবো। আর আমার কোনো অসুবিধেই থাকবে না।'

শুনে কিশোর রতন আবার হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। মনে মনে ভাবলে, কি সে শক্তি যাতে সনাতনবাবু দু'টি চোখ হারিয়েও সমস্ত দুঃখ-কষ্টের ওপরে উঠে প্রাণ খুলে হাসতে পারছেন !

সনাতনবাবু বোধ করি ওর মনের কথাটি শুনতে পেলেন। তাই আপন মনে আবৃত্তি করলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

"—মৃত্যুর গর্জন শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো,
দহিয়াছে অগ্নি তারে—
বিদ্ধ করিয়াছে শূল—
ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,—
সর্বপ্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন—
চিরজন্ম তারই লাগি
জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন॥"

রতন আপন মনে ভাবে, বিপ্লবীরা বুঝি মানুষ নয়! নইলে নিজের দেহের অসহ্য যাতনাকে কি করে তারা ভুলে থাকতে পারে ? আগুনে হাত দিলেও তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হয়, বুঝি তারা ফুলের বাগান থেকে টাট্‌কা তাজা সুগন্ধ কুসুম তুলে সাজি ভর্তি করছে !

এই যে সনাতনবাবু—রতন তাঁর সম্পর্কে কতটুকুই বা জানে ! বাইরে থেকে মনে হয় মানুষটা বুঝি ভাঁড় ! কখনো হাসছেন, কখনও রসিকতা করে মানুষকে হাসাচ্ছেন, আবার কখনো বা সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে চিৎকারে বাবুইবাসা বোর্ডিংকে মাথায় করে তুলছেন ; আবার সেই মানুষটি যখন আপন মনে বই পড়েন, —রতন লুকিয়ে দেখেছে—তখন তিনি একেবারে বিশ্ব-জগৎ ভুলে বসে থাকেন। দেখে মনে হয় না সংসারে তাঁর কোনো ভাবনা-চিন্তা আছে !

সনাতনবাবুর সংসারে কে আছে রতন তার কোনো খবরই রাখে না। তাঁর কি বাবা-মা, ভাই-বোন কেউ নেই ? কারো স্নেহের বন্ধন কি তাঁকে ঘরে আবদ্ধ রাখতে পারে না ? এই দারুণ দুঃখের দিনে কারো স্নেহ-ছল-ছল আঁখি দু'টি কি তাঁর মনে একবারের জন্যও ভেসে ওঠে না ?

মনে আরও প্রশ্ন জাগে রতনের—কি এমন শক্ত কাজ করতে গিয়েছিলেন সনাতনবাবু, যার জন্য এই চোখ দু'টিকে তাঁর চিরতরে হারাতে হল ?

সনাতনবাবু কিন্তু এ সম্বন্ধে ওকে কোন কথাই বললেন না—শুধু ওর ডান হাতটি চেপে ধরে পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ শুয়ে রইলেন।

আসল ব্যাপারটা জানা গেল—সেই দিন দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকটা বিশ্রামের সময়। জীবনদাই ওকে সব কথা ধীরে ধীরে খুলে বললেন।

একটা খুব জরুরি দলিল সরিয়ে নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন সনাতনদা, সঙ্গে ছিল এই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এরই একটি ছেলে। ছেলেটা পূর্ব-পরিকল্পনা মতো দোতলার একটি সরকারী দপ্তরে উঠে ভেতর থেকে দরজা খুলে দেয়। তারপর সনাতনদা

দালানের নল বেয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হন। টর্চ জ্বালিয়ে সেই অন্ধকার ঘরে ঢুকে দলিলটাও হাত করেছিলেন। কিন্তু ফিরে আসবার মুখে সঙ্গের ছেলেটা ধরা পড়ে যায়। তাকে ছাড়িয়ে আনতে গিয়ে সনাতনদা সিংহ-বিক্রমে রক্ষীদের আক্রমণ করেন।

রক্ষীদের মধ্যে একজনের হাতে ছিল মাছ মারবার একটা বাঁশের ট্যাঁটা—অনেকগুলো তার মুখ। উপায়ান্তর না দেখে জান বাঁচাবার জন্য লোকটা সেই ট্যাঁটা সনাতনদার দিকে ছুঁড়ে মারে। তার ফলে সনাতনবাবুর দু'টো চোখই গেঁথে যায়। সেই অবস্থাতেই তিনি ছেলেটাকে বগলদাবা করে পাশের খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওখানেই একটা ডিঙি নৌকো নিয়ে বিপ্লবীরা অপেক্ষা করছিল। তারা তাড়াতাড়ি জল থেকে দু'জনকে উদ্ধার করে নৌকো নিয়ে দ্রুতবেগে পালিয়ে আসে। কিন্তু সর্বনাশ যা হবার তা আগেই হয়ে গিয়েছে ! চিরদিনের মতো সনাতনদা তাঁর দু'টি চোখই হারিয়ে ফেলেছেন

এই জীবন-মরণ সংগ্রামে সনাতনদা কিন্তু হাতের দলিলটা কিছুতেই ছাড়েন নি।

জ্ঞান হারাবার আগের মুহূর্তে তিনি শুধু ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন—ওরে, তোরা কেউ এই দলিলটা ধর, নইলে খালের জলে হারিয়ে যাবে।

রতন যেন নিজের চোখের সামনে গোটা দৃশ্যটা দেখতে পায়।

সিনেমাতে যেমন দেখা যায়—ঠিক তেমনি ! রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে গিয়ে ডিঙি নৌকোটা থামল সরকারী দপ্তরের পেছন দিককার খালে। ওদের দু'জনকে নামিয়ে দিয়ে নৌকোটা ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে রইল। ওদিকে সনাতনবাবু ছেলেটিকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। ওকে কাঁধে করে তুলে দিলেন জানালার ওপর। ছেলেটি সাপের মতো এঁকেবেঁকে দোতলায় গিয়ে উঠল, তারপর কৌশলে পেছন দিককার দরজাটার ছিটকিনি খুলে দিল।

সনাতনবাবু মালকোঁচা মেরে তৈরি হয়েই ছিলেন। বৃষ্টির জলে ভেজা নল বেয়ে দোতলায় উঠে অন্ধকার ঘরে গিয়ে হাজির হলেন।

কোমরে লুকানো ছিল টর্চটা। সেইটে জ্বালিয়ে দরকারী দলিলটা খুঁজে নিতে বেশী বেগ পেতে হয় নি। কেননা বিপ্লবীরা আগে থেকে খবরগুলো সংগ্রহ করে রাখে।

হঠাৎ ধুলো-বালি নাকে-মুখে ঢোকায় ছেলেটা খক্‌খক্ করে কেশে উঠলো।

রক্ষীরা সজাগ ছিল। শব্দ শুনেই তারা ছুটে এলো। সনাতনবাবু অবলীলাক্রমে পালিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু ছেলেটাকে ওরা পেছন দিক থেকে আচমকা ধরে ফেললে।

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছেলেকে ফেলে সনাতনবাবু নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসবেন—এ-কথা কোনোক্রমে কল্পনাও করা যায় না!

সিংহ-বিক্রমে রক্ষীদের আক্রমণ করতে গেলেন তিনি। কিন্তু তার আগেই বাঁশের সেই বহুমুখী ট্যাটাটা ছুঁড়ে দিয়েছে রক্ষীটি।

সনাতনবাবুর দু'টো চোখে বিঁধে গিয়েছে সেই ট্যাটা দু'টির তীক্ষ্ণ মুখ। দর-দর ধারে রক্ত ঝরে পড়ছে তাঁর দু'টি চোখ দিয়ে। ভিজে যাচ্ছে তাঁর মুখ, বুক, সারা দেহ—এমন কি, পরনের ধুতিও। কিন্তু তবু তিনি এতটুকু বিচলিত হননি ! বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছেলেটাকে বগলে জাপটে ধরে তিনি লাফিয়ে পড়েছেন—দোতলা থেকে একেবারে খালের জলে।

রক্তে খালের জলের রঙ রাঙা হয়ে গেছে—তবু তিনি হাতের দলিলটি ছাড়েন নি।

এইভাবে—একের পর এক গোটা দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করে শিউরে উঠলো রতন।

এই হচ্ছে বিপ্লবীর সহনশীলতা ! ওরা ভাঙবে, তবু এতটুকু মচকাবে না।

সনাতনবাবুর শুশ্রূষার সব কিছু দায়িত্ব ধীরে ধীরে হাতে তুলে নিয়েছে কিশোর রতন।

কিশোর রতন মনে মনে কল্পনা করে ওর যদি সনাতনবাবুর মতো একটি দাদা থাকতো, তাহলে সে তাঁর জন্য প্রাণ দিতেও এতটুকু পেছপা হতো না।

সকাল থেকে রতনের কাজের অন্ত নেই। ঘুম থেকে উঠেই চোখে-মুখে জল দিয়ে সনাতনবাবুর দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে দিতে হয়। বেডপ্যান ধরতে হয় ; তারপর সেই বেডপ্যান যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করে আনতে হয়। গরম দুধ আর প্রয়োজনীয় পথ্য খাওয়াতে হয় সময়মতো। তা ছাড়া ঘড়ি ধরে ডাক্তারের নির্দেশমতো ওষুধ খাওয়াতে হয়। ঠাণ্ডা মলম লাগিয়ে দিতে হয় দুই চোখের ওপর। ব্যাণ্ডেজ বাঁধাটাও সে শিখে নিয়েছে জীবনদার কাছ থেকে।

আরো একটা জরুরী কাজ থাকে তার দুপুরবেলা। রোগীকে রোজকার খবরের কাগজ আর নানা জাতীয় বইপত্তর পড়ে শোনাতে হয়।

এই কাজটা রতনের ভারী মনের মতো। সনাতনবাবুকে শোনাতে গিয়ে তার নিজের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে ওঠে।

রাত্তিরে মাঝে মাঝে উঠে দেখতে হয় রোগী ঠিকমতো ঘুমুচ্ছেন কি না ! যদি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে তবে কখনো কখনো ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিতে হয়। আবার কোনো সময় মাথায় হাত বুলিয়ে নানা রকম গল্প করতে হয়। রোগীর ইচ্ছামতো রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা', সত্যেন দত্তের 'বেণু ও বীণা' কিংবা নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার আবৃত্তি করে শোনাতে হয়।

রোগীর সেবা করতে বসে রতনের নিজের যে কত শেখা হয়ে যাচ্ছে তার লেখাজোখা নেই।

অনেক সময় সনাতনবাবু বলেন, 'ওরে রতন, তুই আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বল। বলতে বলতে ইংরেজীটা দিব্যি রপ্ত হয়ে যাবে।'

রতন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি ইংরেজীতে কথা বলতে পারবো ?'

শুনে সনাতনবাবু হো-হো করে হেসে উঠেন ; তারপর উত্তর দেন, 'ওরে বোকা, অভ্যাসে কি না হয় ! মাদ্রাজের বহু কুলি ইংরেজীতে সায়েবদের সঙ্গে কথা বলে। অথচ তারা ABCD পর্যন্ত জানে না ! বুঝলি—সবই অভ্যাস !'

সেদিন রাত্তিরে দারুণ গুমোট।

কারো চোখে আর ঘুম আসছে না।

জীবনদা আর রতন রোগীর শিয়রে বসে ধীরে ধীরে মাথায় আর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

রোগীর মুখেও কোনো কথা নেই। শুধু এপাশ আর ওপাশ—শুধু ছটফটানি !

এমন সময় বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর একটি ছেলে হন্তদন্ত হয়ে সেই ঘরে ঢুকলো ; বললে, 'জীবনদা, রোগীকে আর এখানে রাখা নিরাপদ নয়। পুলিশ বোধকরি কোনো রকমে টের পেয়েছে।'

শুনেই জীবনদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ; বললেন, আমি মনে মনে সেই ভয়ই করছিলাম। তা'হলে আর দেরী নয়। সনাতনবাবুকে আজ রাত্রে—এক্ষুণি বোর্ডিং থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।'

জীবনদার কথা শুনে রতন চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলে, 'এক্ষুণি? এত রাত্রে?'

জীবনদা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, এক্ষুণি। আমাদের দিন-ক্ষণ দেখবার সময় কোথায় ? তা ছাড়া রাতের অন্ধকার আমাদের পরম বন্ধু। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে হলে এই রাতের অন্ধকার আমাদের একান্ত সুহৃদ। এই আঁধার আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে। আঁধার ভেদ করে পুলিশের সদা-জাগ্রত চোখ আমাদের দেখতে পাবে না।'

'কিন্তু কোথায় যাবো আমরা ?'—রতনের কণ্ঠে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

ছায়েদ বলে একটি ছেলে থাকতো বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ। সে এগিয়ে এসে বললে, 'আমার এক নানী থাকে অজ পাড়াগাঁয়। নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে আমার নানীর বাড়ি। বাড়ি বলতে ভাঙাচোরা একটা দালান—সাপ-খোপের বাসা। লোকে বলে ভুতুড়ে বাড়ি, নানীকে বলে ডাইনী। দিনের বেলাতেও কেউ সেদিকে এগোয় না। যদি নৌকো করে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায়'—

জীবনদা যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেলেন ; বললেন, ঠিক বলেছিস ছায়েদ।' ওই ভুতুড়ে বাড়িই সনাতনবাবুকে সব বিপদ থেকে আড়াল করে রাখবে। আর তোর

নানী বুঝি ডাইনী ? আমাদের ত' ভূত-প্রেত-ডাকিনী-যোগিনী আর ডাইনী নিয়েই ঘর করতে হবে। সমুদ্রে যে শয্যা পেতেছে শিশির দেখে তার ভয় পেলে চলবে কেন ?

তারপর হাতে হাতে অতি দ্রুতবেগে সব কিছুর ব্যবস্থা। সনাতনবাবুকে ধরাধরি করে নৌকোয় তোলা হল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে নৌকো এগিয়ে চললো নদীপথে।

শেষ রাত্তিরে ছায়েদের সাড়া পেয়ে তার নানী একটা কুপি হাতে এগিয়ে এল। তারপর সনাতনবাবুর দিকে চোখ পড়তেই খ্যানখেনে গলায় চিৎকার করে উঠল, 'এ কোন্ ঘাটের মড়াকে টেনে নিয়ে এলি রে ছায়েদ ? দু'টো চোখের মাথাই যে খেয়ে বসে আছে !'

॥ পনেরো ॥

ছায়েদের নানীকে সবাই যে ডাইনী বলে কেন—সেটা জানা গেল পরদিন সকাল থেকে।

অতি ভোরেই খ্যানখেনে গলার আওয়াজে সবাইকার ঘুম ভেঙে গেল।

অতি ভোরেই নানী চিৎকার শুরু করে দিলে, 'ওরে ছায়েদ, ওঠ ওঠ। কুকুড়ো চারটে আণ্ডা দিয়েছে। এ কিন্তু আমি প্রাণধরে কাউকে দিতে পারবো না। তোকেই কিন্তু এ চারটে আণ্ডা খেতে হবে।'

জীবনদা, রতন সবাই মাদুর বিছিয়ে দাওয়াতে শুয়ে পড়েছিল। শেষ রাত্তিরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সবাইকার চোখে ঘুম জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাধ্যি কি দু'দণ্ড তারা শুয়ে থাকে ওখানে! বুড়ীর চিকণ গলার চীৎকারে সবাই উঠে বসলো।

জীবনদা চোখ কচলে হাসিমুখে বললে, ' তোমার কোনো ভয় নেই নানী ! তুমি তোমার সব আণ্ডা ছায়েদকে খাইয়ে দাও। ওরই ত' এখন বুকে বল হওয়া দরকার। এখন খুব খাটনি যাবে ওর ওপর দিয়ে।'

বুড়ী চোখের ওপর হাতের চেটো রেখে শুধোয়, 'কেন, ওর খাটা-খাটনি হবে কেন? এদ্দিন বাদে ছায়েদ তার নানীর কাছে এলো—একটু আরাম করুক, আয়েস করুক। খাটা-খাটনির জন্যে ত' সারা জীবনটাই পড়ে রইলো।'

জীবনদা তবু রসিকতা করতে ছাড়লেন না ; বললেন, 'শুধু কি ছায়েদই তার নানীর কাছে এসেছে ? আমরা বুঝি একেবারে গাঙের জলে ভেসে এসেছি ?'

এই কথা শুনে নানী এমন তীক্ষ্ণকণ্ঠে খ্যানখ্যান করে হেসে উঠলে যে, মনে হল বুঝি একটা কাঁসার বাসন কারো হাত থেকে পড়ে খান খান হয়ে ভেঙে গেল !

এই প্রাণ-কাঁপানো হাসির ভেতর দিয়ে বুড়ী হাসলো কি কাঁদলো ঠিক বোঝা গেল না।

রতন ফিস্‌ফিসে গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা জীবনদা, বুড়ীটা সত্যিই কি ডাইনী ? কি রকম চোখের চাউনী দেখেছেন? যেন ভেতরটা অবধি দেখতে পাচ্ছে ! তারপর ওই হাসি দিন কয়েক শুনলেই বুকের রক্ত শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে যাবে !'

জীবনদা হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, 'এত ভয় পাবার কি আছে রে বোকা ? আমাদের ছায়েদেরই নানী। কাজেই মানুষ ত' বটেই। আস্ত চিবিয়ে গিলে খেতে ত' আর পারবে না।'

'কিন্তু তা'হলে লোকে ওকে ডাইনী বলে কেন? জানেন ত—যা রটে তা কিছুও বটে।'—বললে রতন।

এমন সময় ঘরের ভেতর সনাতনবাবুর একটা গোঙানির শব্দ শোনা গেল।

রতন তাড়াতাড়ি ছুটে গেল ঘরের ভেতর।

সকালবেলাকার অনেক কাজ জমা হয়ে আছে।

সনাতনবাবুকে বহুক্ষণ দেখাশোনা করা হয় নি।

তাঁর মুখ ধোয়াতে হবে, বেডপ্যান ধরতে হবে, সকালবেলাকার ওষুধ খাওয়াতে হবে। বিছানাটা ঝেড়ে-পুছে ঠিক করে দেওয়া দরকার। তারপর রয়েছে সকাল-বেলাকার পথ্যি খাওয়ানোর পর্ব।

কাজেই রতন ডাইনীর ভীতিপ্রদ আলোচনা ছেড়ে নিজের রোজকার কাজ নিয়ে মেতে উঠলো।

ওদিকে জীবনদা দাওয়া থেকে নেমে সোজা খালধারে চলে গেলেন। ভালো করে মুখ-হাত ধুয়ে সুস্থির হয়ে ফিরে এলেন উঠোনে।

চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন জীবনদা। গত রাত্তিরের আলো-আঁধারী নিঝুম থমথমে পরিবেশে কোনো দিকেই তাকিয়ে দেখবার ফুরসৎ হয় নি।

ছায়েদের দাদামশাই জোতদার ছিলেন। এককালে তাঁর অবস্থা ভালোই ছিল।

জীবনদার চোখ দু'টি চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ছায়েদের দাদামশাই এই নির্জন খালের ধারে কোঠাবাড়িই তৈরি করেছিলেন। ছোট ছোট ইটের দেওয়াল। দেখে মনে হয় অনেক কালের পুরানো। দেয়ালের গায় কি সব নক্সা আঁকা। ভালো করে ঠাহর করা যায় না।

এককালে নাকি এই বাড়ি মানুষ-জনে গমগম করতো। দু'বেলায় অনেকগুলো পাত পড়তো।

ছায়েদের দাদামশায়ের দান-ধ্যানও ছিল বেশ। কাউকে তিনি নাকি বিমুখ করতেন না।

তারপর কি কাল মড়ক এলো গাঁয়ে। একে একে অমন জলজ্যান্ত স্বাস্থ্যবান ভাইগুলো পট-পট করে মরে গেল। মেয়েদের ভালো বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু জামাইগুলো ছিল অমানুষ। তাই মেয়েরাও বেশীর ভাগ সময় এই বাড়িতে এসে মা-বাবার কাছেই থাকতো।

তারপর কোথা দিয়ে যে কি হল—কেউ হিসেব দিতে পারে না।

ছায়েদের দাদামশাই গফুর সাহেব এই সর্বনাশের বন্যাকে বাঁধ দিয়ে আটকাতে পারলেন না।

এমন সাজানো বাগান একেবারে যেন ছাগলে মুড়িয়ে রেখে গেল!

যখন চারদিকে ভালো করে তাকাবার অবসর পেলেন, তখন চোখে তাঁর ঘুম নেই। এক রাত্তিরের ভেতর চুল আর দাড়ি পেকে শনের গোছার মতো দেখাতে লাগলো।

আপনার জন যারা ছিল—যাদের জন্য কোঠাবাড়ি তৈরি করা—তারা সবাই ছেড়ে গেছে ! বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে। শূন্যপুরীতে বাতি জ্বালাবার জন্য শুধু বুড়ো-বুড়ী বেঁচে আছেন। কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারেন না।

বুকটা হু-হু করে জ্বলে যায়—কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোঁটা কান্না বেরোয় না।

বুড়ো সারারাত ঘুমুতে পারেন না। শুধু উঠোনে পায়চারি করেন আর বলেন, 'আমার এত বড় বাড়ি, এতগুলো কামরা—এখানে থাকবে না কেউ?'

এসব বলেন আর দু'হাতের আঙুল দিয়ে মাথার চুলগুলো টানতে থাকেন। দেখতে দেখতে চোখ দুটো করমচার মতো লাল হয়ে ওঠে।

এইভাবে বুড়ো পাগল হয়ে গেলেন। তখন বুড়ীই তাঁকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখতেন—পাছে পাগল মানুষটা কোনো সময়ে খালের জলে ডুবে মরতে যায়।

সে আজ কতকালের কথা। ছায়েদ তখন শিশু।

ওই মহামারীর সময় ছায়েদ এখানে ছিল না বলেই বেঁচে গিয়েছিল। ছায়েদ তখন তার নিজের বাপের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল।

কিন্তু সে যে কবে তার মাকে হারালে, সে নিজে কখনো তা জানতেও পারে নি। বড় হয়ে এই নানীর কাছেই সে তার মায়ের গল্প শুনেছে।

ছায়েদের জীবনের সব কথাই জীবনদার জানা—কোনো কিছুই অজানা নয়।

তাই ত' তিনি শত অসুবিধার মধ্যেও এক কথায় ছায়েদের সঙ্গে এখানে আসতে রাজী হয়েছিলেন।

তিনি বেশ ভালো ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই রকম একটি নির্জন-নিরিবিলি পোড়ো বাড়িই সনাতনবাবুকে সত্যিকারের আশ্রয় দিতে পারবে।

পুলিশ সনাতনবাবুর সন্ধান করতে জানা-অজানা বহু জায়গাতেই ঢুঁ মারবে। কিন্তু এই অজ-পাড়াগাঁয়ের কথা তাদের গোপন খাতার কোথায়ও লেখা নেই।

আরো একটা সুবিধের কথা ওরই মধ্যে ভেবে নিয়েছেন জীবনদা ! সেটি হচ্ছে ছায়েদের নানীর ডাইনী নামটি। এই নামটি রক্ষা-কবচের মতো সনাতনবাবুকে সকল রকম পুলিশী জুলুম থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

পুলিশ কখনো ধারণাতেই আনতে পারবে না যে, সনাতনবাবুর মতো একজন নামকরা বিপ্লবী—এই ডাইনীর আশ্রয়ে এসে আত্মগোপন করে আছে।

সবুজ রঙের কীট-পতঙ্গ যেমন গাছের সবুজ পাতার আড়ালে নিজেদের রক্ষা করে—এ ঠিক তেমনি ব্যবস্থা।

'ডাইনী' নামের ভয়ে গ্রামের কেউ এ বাড়ির ত্রিসীমানায় এগোয় না। বিপ্লবীর নিরাপত্তার দিক থেকে তার মূল্য আছে বৈ কি !

জীবনদা সেই উঠোনে দাঁড়িয়ে আপন মনে অনেক কথাই ভাবছিলেন। বাড়ির চারদিকে এত জঙ্গল জমে গেছে যে, বাইরে থেকে ভেতরে কি ঘটছে না-ঘটছে, কিছুই নজরে পড়ে না।

ছায়েদ সকলের আগেই উঠে গোয়ালাদের পাড়ায় চলে গেছে—সনাতনবাবুর জন্য দুধ রোজ করতে। এতক্ষণে সে ফিরে এলো এক ঘটি খাঁটি দুধ নিয়ে ! ওটার দরকার পড়বে একটু বেলাতে।

ইতিমধ্যে সনাতনবাবু বার্লিজল খান। রতন দেখলে, উঠোনের এক পাশে চমৎকার একটি লেবুগাছ! অনেক লেবু ফলে রয়েছে সেই গাছে।

এ বাড়িতে লেবু তোলার লোক কোথায় ? তাই রতন মনের আনন্দে ছুটে গেল গোটা কয়েক লেবু পেড়ে আনতে।

কিন্তু তার আগেই হাঁ-হাঁ করে পথ আটকে দাঁড়ালো সেই ডাইনীটা ; বললে, 'খবরদার! এই লেবুগাছে তোমরা কেউ হাত দেবে না। এই লেবুগাছ কে পুঁতেছিল জানো? জানো না কেউ! আমার মেজ মেয়ের হাতে পোঁতা এই লেবুগাছের ফল কাউকে ছুঁতে দিই নে। যক্ষের মতো আগলে আছি আমি। আজ ছায়েদ এসেছে। সে খাবে এই লেবু। হি—হি—হি !'

পাগলের মতো হাসতে লাগলো ডাইনীটা। তার ওই রণচণ্ডী মূর্তি দেখে রতন ভয়ে দু'পা পেছিয়ে এলো! কি জানি,—বলা ত' যায় না! যদি ডাইনীটা ছুটে এসে তার হাতের আঙুল কামড়ে ধরে?

দূর থেকে ছায়েদ কিন্তু সব দেখেছে, সব শুনেছে। সে তার নানীর কাণ্ড দেখে এগিয়ে এসে বললে, 'ওরে রতন, তুই ভয় পাস নে। আমার মায়ের পোঁতা গাছ

কিনা—তাই বুড়ী কাউকে ও গাছে হাত দিতে দেয় না। ওর ইচ্ছে, সব লেবু আমি বসে বসে চিবুই—পাগল আর কাকে বলে!'

বুড়ী কিন্তু শনের নুড়ির মতো চুলগুলো উড়িয়ে এগিয়ে এসে বললে, 'কী, আমি পাগল? আমি কিন্তু কখনো পাগল হবো না। আমার মাথা সাফ আছে। পাগল হয়েছিল ত' তোর নানা। তাকে নিয়ে সারা জীবন কি আমি কম জ্বলেছি! তারপর মুখপোড়াটা করলো কি জানিস ? একদিন পাটের দড়ি পাকিয়ে কড়িকাঠের সঙ্গে বেঁধে গলায় জড়িয়ে একেবারে ঝুলে পড়লো। ডাকাত বলতে চাস বল ডাকাত— আর পাগল বলতে চাস ত' বল পাগল! সে লাস টেনে নামালো কে শুনি ? এই ডাইনী ছাড়া আর কেউ নয়!'

ছায়েদ এগিয়ে এসে বুড়ীর পিঠে মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

তার ফলে সাপের মাথায় যেন মন্তর-পড়া ধুলো ছিটানো হল। বুড়ী ফ্যাল্‌ফ্যাল করে ছায়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কতক্ষণ, তারপর ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেললে—যেন পাঁচ বছরের ছোট্ট খুকীটি!

ছায়েদ তখন তাকে নিয়ে দাওয়াতে বসলো। বললে, 'শোন নানী, এরা যে সব আমার সঙ্গে এসেছে, এরা ত' তোর মেহমান। এদের খাওয়াবি-দাওয়াবি, যত্ন-আত্তি করবি—তবে ত' আমি তোর কাছে কয়েকটা দিন থাকতে পারবো। নইলে যে আমাকেও ওদের সঙ্গে চলে যেতে হবে।'

ডাইনীটা যেন সেই কথা শুনে শিউরে উঠলো ! বললে, 'কোথায় যাবি তুই আমার কোল খালি করে ? তোকে আর আমি কোথাও যেতে দেবো না। শালিধানের চিঁড়ে কুটে রেখেছি। পাটালী গুড় রেখেছি কলসী ভর্তি করে। সবরী কলা পেকে রয়েছে গাছে। পুষ্করিণীতে টাটকা মাছ। এসব ফেলে কোথায় যাবি রে ছায়েদ ? এসব কি আমার কবরে ঢেলে দিতে চাস ?'

ছায়েদ তখন আদর করে নানীকে কাছে টেনে নিয়েছে। ছোট্ট খুকীকে সবাই যেমন করে আদর করে ঠিক তেমনি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলছে, 'শোন নানী, তোর চিঁড়ে আমি খাবো। পাটালী গুড়ও ছাড়বো না। গাছের সবরী কলা দুধের সঙ্গে মেখে নেবো। কিন্তু আমায় তুই কথা দে—আমার একটা কথা তুই রাখবি?'

বুড়ী মাথা দুলিয়ে আবদারের সুরে শুধোল, 'কি কথা শুনি?'

ছায়েদ বললে, 'আমার সঙ্গে যারা বাড়িতে এসেছে তাদেরকেও আমার মতন ভালোবাসবি—খাওয়াবি-দাওয়াবি, আদর করে কাছে ডেকে এনে কথা বলবি। ওরা যে আমাদের মেহমান—অতিথি।'

বুড়ী আনন্দে মাথা দোলাতে থাকে আর বলে, 'ওরা আমার মেহমান ? হ্যাঁ, হ্যাঁ ! ওরা আমার শূন্যি ঘর আবার ভরতি করে তুলবে। ওরে ছায়েদ, গাছে যত পাকা ফল আছে পেড়ে নিয়ে আয়। আমি ওদের দাওয়ায় বসিয়ে খাওয়াবো।'

অতি আনন্দে ডাইনী বুঝি দাওয়াতেই নেতিয়ে পড়লো।

* * * *

সেদিন গভীর রাত্রে রতনরা যখন ঘুমে একেবারে অচৈতন্য, ঠিক সেই সময় গাঁয়ের চৌকিদার লাঠি ঠুক ঠুক করে এসে হাজির। জিজ্ঞেস করলে, 'ও বুড়ী, তোর বাড়িতে কি কেউ এসেছে ? রাত্তিরে আলো জ্বলে কেন ঘরে ?'

বুড়ী পাগলের মতো হি-হি করে হেসে উঠলো। হাসলো অনেকক্ষণ ধরে ; তারপর বললে, 'ওরে মুখপোড়া, আমার ঘর ভর্তি ছেলেমেয়ে ছিল। তারা যে রাত্তিরে এসে আমার কাছে খেতে চায়। তাই ওদের খেতে দেবো বলে পিদিম জ্বালি। ডাইনী ছাড়া আর কার কাছে নিশুতি রাতে ওরা খেতে আসবে শুনি ? এখানে উঁকি দিতে এলে ধড়ে আর পরাণ থাকবে না ! মুখ থুবড়ে পড়ে মরে থাকবি —হি-হি হি!'

চৌকিদার ভয়ে ভয়ে নাম জপ করে—রাম-রাম-রাম। তারপর হাতের লণ্ঠনটা ফেলে রেখেই পালাতে পথ পায় না !

ষোল

পৃথিবীতে যে কত অবাক কাণ্ড ঘটে, ভাবতে গেলে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না।

ডাইনী যে এমন করে মানুষকে আপনার করে নিতে পারে, সে-কথা রতনের জানতে বাকী ছিল। বুড়ী যেন তার দুই ডানা দিয়ে দুনিয়ার সব আপদ-বিপদ থেকে ওদের আগলে রাখতে চায়।

যে ডাইনীর রকম-সকম দেখে রতন মনে মনে পালাবার সঙ্কল্প করেছিল, আজ সে দাওয়ায় বসে জলভরা চোখ নিয়ে ভাবছে, এই নানীকে সে ছেড়ে যাবে কি করে ? বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মানুষের হৃদয়ে যে এমন সুধা লুকিয়ে থাকে বিপ্লবী দলে যোগ না দিলে কি সে জানতে পারতো !

বাবুইবাসা বোর্ডিং তাকে-সব পাইয়ে দিয়েছে। সনাতনবাবু, জীবনদা, পথের পাওয়া দিদি, আর আজকের নানী। এরা সবাই স্নেহ-প্রীতির ফল্গুধারায় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত কোন্ ঘাটে গিয়ে সে তার ডিঙি বাঁধবে জানে না ! এদের যে-কোনো একজনের সঙ্গে সে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তার ত' উপায় নেই। বিপ্লবীর জীবনে কখনো শেকড় বসানো চলে না। সে হবে শুধু কদমের ফুল। যখন যেখানে ডাক পড়বে দুরন্ত ঘুর্ণি হাওয়ায় উড়ে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হবে। যে ব্রত গ্রহণ করেছে, সেই ব্রত তাকে পালন করতেই হবে।

এখন দিনগুলো কত স্বচ্ছ, কত সুন্দর। তারা যে এই নিভৃত পল্লীতে আত্মগোপন করে আছে, কাক-পক্ষীতেও তাদের খবর পায় না। এ এক চমৎকার লুকোচুরি খেলা।

ওরা যেন পাণ্ডবদের মতো অজ্ঞাতবাস করছে! কবে যে অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে ভারতের স্বাধীনতার সোনালী রোদ্দুরে মাথা তুলে দাঁড়াবে—তা ওরা জানে না। যতদিন সেই সঙ্কল্প সার্থক হয়ে না ওঠে, ওরা ধূপের মতো পুড়ে পুড়ে গন্ধ বিলিয়ে দিয়ে যাবে !

নানীর সজাগ ও সস্নেহ দৃষ্টিতে ওরা সবাই ছায়েদের সঙ্গে একাত্মা হয়ে গেছে। তিনটি ছায়েদকে যেন নানী একই সঙ্গে স্নেহের ঝর্ণায় অবগাহন করাচ্ছে ! আজ আর ওরা পৃথক্ নয়। ওরা তিনজনেই এক বুড়ির নাতির স্থান অধিকার করে বসেছে। কাকে নানী বেশী ভালোবাসে আজ এই নিয়ে তিনজনের কপট কলহ চলে। আর নানী হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হাসে। তার সেই হাসি শুনে গাঁয়ের লোক শিউরে ওঠে ! কেউ আর ভয়ে এদিক পানে পা বাড়ায় না।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যের আঁধারে একটি নতুন লোক জীবনদার হাতে একটি চিঠি গুঁজে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিপ্লবীদের কৌতূহল প্রকাশ করতে নেই। তাই রতন একবার জীবনদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

জীবনদার কাছ থেকে ডাক এলো গভীর রাত্রে। সনাতনবাবু ঘরের ভেতর। জীবনদা ও রতন দাওয়ায় ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ কার হাতের ধাক্কায় রতনের ঘুম ভেঙে গেল। সেই লোকটা আর কেউ নয়—জীবনদা।

ফিস্‌ফিস্ করে জীবনদা বললেন, 'শোন, আয় আমার সঙ্গে চুপি চুপি। দেখিস যেন কারো ঘুম না ভাঙে। ও ঘরে ছায়েদ তার নানীর সঙ্গে ঘুমুচ্ছে। পায়ের এতটুকু শব্দ করবি নে। তাহলেই বুড়ী জেগে উঠে হাঁক ছাড়বে—কে যায়?'

দুরু-দুরু বক্ষে রতন জীবনদার পেছন পেছন খালের ধারে এগিয়ে যায়।

না জানি কি গুরুতর খবর এসেছে। জীবনদা ওকে নিয়ে খালের ধারে একটি গাছের আড়ালে বসলেন।

রতন কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না, অবাক হয়ে জীবনদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জীবনদাই ধীরে ধীরে খবরটা ভাঙলেন; বললেন, 'দেখ রতন, আবার তোর ডাক এসেছে। জানিস ত' ভাই, বিপ্লবীর যখন ডাক আসে, তখন সে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে না, কার কাছ থেকে আদেশ এলো জানতে চাইবে না, কোন ওজর-আপত্তি উত্থাপন করবে না। সঙ্গে সঙ্গে সটান হয়ে বলবে, হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।'

রতন তখনো চুপ করে বসে।

এই আনন্দের নীড় ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি তার কোথায়ও যাবার বাসনা ছিল না। কিন্তু.....

'এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাজ হলো শেষ।'

জীবনদা ওর মনের ভাবটা হয়ত বুঝতে পারলেন। তাই ধীরকণ্ঠে বললেন, 'আর একটা কথা মনে রাখবি রতন, মহাভারত তো তোর ভালোই পড়া আছে। সেই যে অর্জুনের অস্ত্র পরীক্ষার ব্যাপারটা ! গুরু দ্রোণাচার্য জিজ্ঞেস করলেন—গোটা পাখীটাকে কি দেখছ অর্জুন ? অর্জুন উত্তর দিলেন—না গুরুদেব, শুধু পাখীর চোখটা দেখতে পাচ্ছি। দ্রোণাচার্য তখন সোল্লাসে আদেশ দিলেন, তা'হলে বাণ নিক্ষেপ করো অর্জুন। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যভেদ ! বিপ্লবী-জীবনের মূল কথাটাই তাই। আমাদের গোটা গাছটা দেখবার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু যেখানে তাকাতে বলা হবে, আমরা শুধু সেইখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো।'

খানিকটা চুপ করে রইলেন জীবনদা।

তারপর ধীরকণ্ঠে তিনি বললেন, 'তোর ওপর আজ একটি কাজের দায়িত্ব এসেছে। অবশ্য এই কাজের ভার আমার ওপর পড়লে আমি আনন্দের সঙ্গে চলে যেতাম। কিন্তু চিঠিতে নির্দেশ আছে ছোট ছেলের প্রয়োজন। আর সেই সঙ্গে তোর নামই উল্লেখ আছে। কাজেই তোকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।'

নির্ভীক কণ্ঠে রতন উত্তর দিলে, 'আমি প্রস্তুত জীবনদা ! কে আদেশ পাঠিয়েছেন তাও আমি জানতে চাইব না। শুধু আমায় বলুন কি আমায় করতে হবে।'

জীবনদা রতনের পিঠে একবার হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর কাঁপা গলায় বললেন, 'দেখ, কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজ আমি পেলে খুশী হতাম। কিন্তু দায়িত্ব এসেছে তোর ওপর। কাজেই মনে বল এনে তোকেই এ কাজে এগিয়ে যেতে হবে'।

রতন মুখে হাসি এনে বললে, 'বলছি ত' জীবনদা, আমি প্রস্তুত। শুধু আমাকে কাজটা ভালো করে বুঝিয়ে দিন। কোনো রকম কাজেই আমি পেছপা হবো না জানবেন।'

জীবনদা আবার ওর একটা হাত মুঠোর মধ্যে তুলে নিলেন ; তারপর বললেন, 'আচ্ছা, মন দিয়ে শোন। আজ রাত্তিরেই তোকে রওনা হতে হবে। সঙ্গে পথের নিশানা রয়েছে।'

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে জীবনদা সেই কাগজে আঁকা নক্সাটা মেলে ধরলেন।

দেখা গেল, ওরা যে খালটার পাশে বসে আছে, তারই আঁকাবাঁকা পথের একটা নিশানা। খালটা যেখানে রেললাইনের কাছে গিয়ে পড়েছে, সেইখানেই নক্সাটা শেষ হয়ে গেছে। চারদিকে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম লিখে নক্সাটার দিক নির্ণয় করা হয়েছে।

রতনের কণ্ঠে বিস্ময়। সে জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা জীবনদা, এই নক্সাটা নিয়ে আমি কি করবো, সে-কথা ত' তুমি আমায় বললে না !'

জীবনদা জবাব দিলেন, 'আ-রে, সেই কথাই ত' বলতে যাচ্ছি। এখন মন দিয়ে শোন।'

আরো একটু চুপচাপ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। রতন কিন্তু এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। সে জীবনদার হাত চেপে ধরে বললে, 'তুমি নিজেই বলতে ভয় পাচ্ছ জীবনদা?'

জীবনদা বললেন, 'না রে, না। শোন, বলি তবে, ওই যে খালের ওপর ঝোপের আড়ালে একটা ডিঙি নৌকো রয়েছে, ওইটে বেয়ে নিয়ে তোকে রেললাইন পর্যন্ত যেতে হবে। নিশুতি রাত, কেউ কোথাও জেগে নেই। খুব সাবধানে বৈঠে চালিয়ে যাবি, 'কাক পক্ষীতে যেন টের না পায় !'

রতন বললে, 'তা ত' যাবো। কিন্তু ওখানে এই আঁধার রাতে গিয়ে করবো কি শুনি ?

'তা' হলে আসল কথাটাই খুলে বলি।' —এই বলে জীবনদা একটু নড়ে-চড়ে বসলেন ; তারপরে বলতে শুরু করলেন, 'আজ শেষরাত্তিরে ওই রেললাইন ধরে পূব থেকে পশ্চিমদিকে একটা গাড়ি যাবে ঠিক চারটে দশ মিনিটে। তখনো বেশ অন্ধকার থাকবে। ওই গাড়ির একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় থাকবে এমন এক জাঁদরেল সাহেব যে বহু বিপ্লবীকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে, আর ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছে। এই শয়তানটার প্রাণ নেবার মহান দায়িত্ব পড়েছে তোর ওপরে।'

রতন এইবার উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সে সোল্লাসে বললে, 'হ্যাঁ, এই ত' কাজের মতো কাজ পাওয়া গেছে। কিন্তু কি দিয়ে খতম করবো দুশমনটাকে ? বন্দুক, না রিভলবার ?

এইবার হেসে উঠলেন জীবনদা, 'না রে বোকা, না। বন্দুকও নয়, রিভলবারও নয়। চলন্ত ট্রেনকে খতম করতে চাই বোমা। আর আমি তোকে জঙ্গলের মধ্যে বোমা ছুঁড়তে শিখিয়েছি। আজ সেই বোমা ছুঁড়েই শয়তানটাকে শেষ করতে হবে, বুঝলি ?'

আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো রতন ; গদগদ কণ্ঠে বললে, 'আমি এক্ষুণি রওনা হবো জীবনদা। কিন্তু বোমা কোথায় মিলবে, সেই কথাটা শুধু বলে দাও।'

জীবনদা জবাব দিলেন, 'এত ব্যস্ত হস্‌নি। সব মন দিয়ে শোন। এই নৌকো বেয়ে নক্সা অনুযায়ী তুই ঠিক জায়গায় গিয়ে হাজির হবি। ট্রেন আসার ঠিক পনের মিনিট আগে একটি ছেলে আসবে। এসে একসঙ্গে দু'টো শিস দেবে। তারপর বলবে 'সীতারাম'। তুই তাকিয়ে দেখবি, তার মাথায় একটি লাল গামছা বাঁধা রয়েছে। সীতারামের উত্তরে তুই শুধু বলবি 'হরেকেষ্ট' । 'তাকে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করবি নে। সে এসে নিঃশব্দে তোর হাতে দুটো বোমা দিয়ে সোজা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। মনে থাকে যেন তাঁকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবি নে। সে কোথায় যাচ্ছে তাও জানতে চাইবি নে। শুধু বোমা দুটো হাতে নিয়ে তুই প্রস্তুত হবি। একটা বোমা যদি ব্যর্থ হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে একটা আর ছুঁড়ে দিবি। একটি কথা-শুধু মনে রাখবি যে, প্রথম শ্রেণীর গাড়িগুলো ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় থাকে। হুঁশিয়ার!'

এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো রতন জীবনদার কথা শুনছিল ! এইবার তাঁর পায়ের ধুলো কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'তুমি আমায় আশীর্বাদ করো জীবনদা, যেন আমি কৃতকার্য হয়ে ফিরতে পারি।'

মৃদু চন্দ্রালোকে হাত-ঘড়িটা দেখে নিয়ে জীবনদা বললেন, 'এখন দুটো বেজে দশ মিনিট। যথেষ্ট সময় আছে। তুই নীচে নেমে গিয়ে নৌকোয় উঠে বস। আমিও আর এখানে অপেক্ষা করবো না। Wish you good luck !

যেন একটা আঁধারের সাগরের ভেতর দিয়ে রতনের নৌকো তরতর করে এগিয়ে চলেছে। আকাশে মৃদু চন্দ্রালোক আছে বটে, তবে খালের যে দিকটায় গাছগুলোর ছায়া পড়েছে সে সেই অঞ্চল ধরেই নৌকো বেয়ে এগিয়ে চলেছে।

উঁচু বাঁধের ওপর রেললাইন। টেলিগ্রাফের তারগুলো যেন আঙুল উঁচু করে নিঃশব্দে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। খালের দু'ধারে ব্যাঙগু লা একটানা ডেকে চলেছে।

ক্ষিপ্রগতিতে ডিঙি নৌকোটা একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে, রতন বাঁধের ওপরে উঠে জায়গাটা ভালো করে দেখে নিলে। দু'ধারে অজস্র ফণিমনসা আর বাসক গাছ জায়গাটাকে ছেয়ে রেখেছে। সেদিক দিয়ে লুকিয়ে থাকবার পক্ষে স্থানটি বেশ নিরিবিলি, আর লোকালয় থেকে অনেক দূরে।

স্থান নির্বাচন দেখে রতন ভারী খুশী হল। হাতের নক্সাটার সঙ্গে আবার ভালো করে মিলিয়ে দেখলে, হ্যাঁ, ফণিমনসা ও বাসকপাতার ঝোপের উল্লেখ আছে তার হাতের নক্সাতে।

রতন এইবার নিশ্চিত হল যে, ঠিক জায়গায় সে পৌঁছতে পেরেছে।

এখন তীর্থের কাকের মতো তাকে প্রতীক্ষা করতে হবে। কোন্ ছেলেটি আসবে মাথায় লাল রঙের গামছা বেঁধে, তার হাতে থাকবে মারণ-অস্ত্র। তাই নিয়ে তাকে যথাসময়ে শত্রু নিধন করতে হবে।

রতন তার মনকে লোহার মতন শক্ত করেছে; আর তার কোনো ভয় নেই।

পেছনে একটা শব্দ হতেই সে সেইদিক পানে তাকালে। না না, কোনো মানুষ নয়! বরং মানুষ দেখে একটা শেয়াল জঙ্গলের দিকে ভোঁ-দৌড় দিলে।

এখন রতনের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। দম বন্ধ করে সে প্রতীক্ষা করবে সেই ছেলেটির জন্য—যার আসার সঙ্গে তার ওপরে ন্যস্ত কাজ একেবারে একসূত্রে গাঁথা হয়ে আছে।

রতনের মনে হল আশে-পাশের গাছগুলো যেন সব কিছু জানতে পেরেছে। তারাও যেন এই গুরু দায়িত্বের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে।

ওই যে একটু দূরে একটা বিরাট বটগাছ তার মোটা মোটা 'ব' গুলো মাটিতে নামিয়ে অপার কৌতুকে তাকিয়ে আছে ; ওই যে টেলিগ্রাফের তারগুলোর ওপর দুটি নাম-না জানা পাখী অন্ধকারের মধ্যে তাদের পুচ্ছ দুটি নাচাচ্ছে, আবার ওই যে যজ্ঞডুমুরের গাছটা খালের জলে নিজের ছায়াটাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করছে—সবাই তাকে নানাভাবে সাহস দিচ্ছে। শত্রু নিধন করতে নীরবে তার প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করছে। এদের সবাইকেই সংকল্প পালনের শুভ মুহূর্তে তার প্রয়োজন আছে। আশে-পাশে কাউকে বাদ দিলে সে সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

হ্যাঁ, তার প্রতীক্ষা সার্থক।

ছেলেটি আসছে। তার মাথার লাল গামছাটা ঝোপের ওপর দিব্যি দেখা যাচ্ছে। সে কাছে এসে পড়ে। রতনের বুকে কে-যেন ঢেঁকির পার দিচ্ছে।

কানের কাছে দুটো শিস্ শোনা গেল। তারপর শোনা গেল—'সীতারাম'। সঙ্গে সঙ্গে রতন বললে, 'হরেকেষ্ট'।

হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে ব্রহ্মাস্ত্র। আর কাউকে ভয় করে না রতন।

ইতিমধ্যে সেই ছেলেটি কোন্ দিকে যে মিলিয়ে গেল—রতন তা ঠাহর করতে পারলে না। আর তাকে প্রয়োজন নেই। এইবার তার নিজের কাজ।

প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের মতো সে যেন তপস্যায় বসেছে। কেউ তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না।

হ্যাঁ—ওই যে দূরে ছুটে আসছে লৌহ-দানব। চোখটা তার ভাঁটার মতো জ্বলছে। রতন নিজেকে প্রস্তুত করে নিল।

এই তো ট্রেনের মাঝামাঝি জায়গা। ছুঁড়ে দিল সে তার ব্রহ্মাস্ত্র—পর পর দু'টি।

দারুণ শব্দে একটা কামরা অনেক উঁচুতে উঠে খালের জলে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি কামরা। আগুন ধরে গেছে গাড়িতে।

রতন সেই তীব্র ঝাপটায় যেন উড়ে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে পড়ে গেল। তারপর কি ঘটলো সে আর কিছু জানে না।

সতেরো

আবার সেই বাবুইবাসা বোর্ডিং! বিস্ফোরণের ফলে ঝোপের মধ্যে ছিট্‌কে পড়ে রতন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

তারপর বিপ্লবী ভাইদের দল কিভাবে ওকে তুলে নিয়ে সেই অন্ধকার থাকতে থাকতেই আট দাঁড়ের ছিপ বেয়ে একেবারে সোজা চলে এসেছে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ সে খবর রতন কিছুই জানে না।

ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে দু'দিন পর। এই ঘটনার পরই সেই অঞ্চলে পুলিশের অত্যাচার শুরু হবে—সে তো জানা কথাই। তাই জীবনদার পরামর্শে ওকে সরাসরি এইখানে চালান করে দেওয়া হয়েছে।

আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে এসেছে রতনের। এক প্রবীণ কবিরাজ গোপনে ওর চিকিৎসা করছেন। তিনি রাত্তিরের অন্ধকারে এসে ওকে দেখে যান, আর প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজেও একজন নামকরা বিপ্লবী। এখন বেশ বয়স হয়েছে, 'তাই প্রত্যক্ষ কাজ থেকে দূরে সরে এসে আহত বিপ্লবীদের চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। চিকিৎসা আর রোগ-নির্ণয়ে তাঁর সুনাম আছে। রতন তাঁর ব্যবস্থায় তাড়াতাড়ি দেহে-মনে বল পাচ্ছে।

রতন মনে মনে ভেবে রেখেছিল যে, একটু ভালো হয়ে উঠেই সে নানীর বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে। ওখানে গিয়ে ছায়েদের সঙ্গে লেবুগাছ নিয়ে খুনসুটি করতে না পারলে ওর আদৌ ভালো লাগছিল না। দেহটা পড়ে ছিল বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ, আর ওর মনটা ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেই নিশুতি পুরীতে নানীর সঙ্গে। নানীর মুখ দিয়ে শুনতে চায় যে, ছায়েদের চাইতে, রতনকে নানী বেশী ভালবাসে !

শুধু মুখে বললেই হবে না। নানীর ফোকলা দাঁতের সেই খিল্‌খিল হাসিটিও রতন আর একবার শুনতে চায়। যে হাসিকে নিশুতি রাতে লোকে মনে করে ডাইনীর হাসি. রতনের কানে সেই হাসিই মধু বর্ষণ করে।

কিন্তু মূলকেন্দ্র থেকে আদেশ এলো অন্যরকম। জীবনদার মাধ্যমেই অবশ্য খবরটা এসেছে।

রতনকে এখন আর ভাঙার কাজ করতে হবে না। এইবার তার ওপর গড়ার কাজের ভার পড়েছে।

প্রথমটা রতন কিছুই বুঝতে পারে নি। একদিন জীবনদা হঠাৎ ধূমকেতুর মতো এসে উপস্থিত। তিনিই ওকে সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন।

আবার ভালো ছেলের মতো ওকে ইস্কুল পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। মাইনের জন্য ভাবনা নেই। মাসের পর মাস ওর ইস্কুলের মাইনে চালিয়ে যাবে বিপ্লবীদল।

এখানে থাকার খরচ আর ইস্কুলের দেয় সব কিছু জীবনদার হাত দিয়েই সে প্রতিমাসে পাবে।

এখন ওর কাজটা কি, সেই ব্যাপারটাই জীবনদা একটা ঘরের দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়ে দিলেন।

তারপর জীবনদা যেমন ধূমকেতুর মতো বোর্ডিং-এ এসেছিলেন, ঠিক তেমনি কাউকে কিছু না জানিয়ে, হঠাৎ কোন্ আঁধার-পথে মিলিয়ে গেলেন।

এই ঘটনার দিন সাতেক পর থেকে আরম্ভ হল রতনের সংগঠনের কাজ। ছেলেদের সঙ্গে মিলে-মিশে এক-একটা আসল মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে।

"যেখানে দেখিবে ছাই —
উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলেও পাইতে পারো লুকানো রতন।"

প্রথমেই যে তাদের বিপ্লবীদলে গ্রহণ করা হবে তা মোটেই নয়। নানারকম কাজের ভেতর দিয়ে তাদের মনের বল, সাহস , একতা, নিষ্ঠা আর সহনশীলতার পরীক্ষা নিতে হবে। যে সব ছেলে শেষ পর্যন্ত সব রকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, কেবলমাত্র তাদেরকেই বিপ্লবীদের দলে নাম লেখাতে দেওয়া হবে।

তারপর চলবে তাদের শিক্ষা, মানে ট্রেনিং। এই ট্রেনিং-এর কাজ চলবে খুব গোপনে, যাতে বাইরের লোক কিছুমাত্র খবর না পায়।

প্রথমেই ছেলেদের জন্য একটি ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সকাল-সন্ধ্যেয় ছেলের দল শরীরচর্চা করবে। কুস্তি শিখবে, যুযুৎসু অনুশীলন করবে।

যাতে দমটা খুব বাড়ে তার চেষ্টা করতে হবে সবাইকে। সাঁতারের ব্যবস্থাটা আবার চালু করতে হবে। মাঝে মাঝে ছাত্র-সমাজে দৌড়ের প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হবে। দৌড়ে যারা কৃতিত্ব অর্জ্জন করবে, তাদের জন্য নতুনভাবে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

সবাইকার শরীর লোহার মত শক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। কেননা বিপ্লবীর চলার পথ কুসুমে ঢাকা নয়। কোথায় কোন্ অন্ধকার পথে সাপ লুকিয়ে আছে, বিপ্লবীকে ঝড়-বাদলের মধ্যে সেই বিপদের মাঝখান দিয়ে পথ চলতে হবে।

রতনের শিক্ষাদান-প্রণালীও একটু অন্য পথ ধরে চলে।

অল্প বয়সেই জীবনের অনেকখানি দেখে নিয়েছে সে। সেই উঁচু নীচু পথের অভিজ্ঞতার দাম বড় কম নয়।

যখন গভীর রাত্রে অঝোর ধারায় বর্ষণ চলে 'ঠিক সেই সময় রতন চুপি চুপি ছেলেদের ডেকে নিয়ে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঘরে ঘরে সবাই তখন সুখ-শয্যায় নিদ্রা যায়, আর এই দস্যি ছেলের দল বজ্রবিদ্যুৎ-বর্ষণকে মাথায় নিয়ে কেবল নদী পারাপার করতে থাকে।

দুঃখের দহনের ভেতর দিয়েই যে ভারতের স্বাধীনতার-সূর্য উদিত হবে, একথা এই বেপরোয়ার দল মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। তাই চলে ওদের বিপদসঙ্কুল পথে অভিনব অনুশীলন।

এক একদিন রতন ওদের গভীর জঙ্গলের ভেতর নিয়ে যায়। সে অঞ্চলটা লোকালয় থেকে অনেক দূরে।

সেইখানে সবার চোখের আড়ালে রতন ছেলেদের রিভলবার চালানো শিক্ষা দেয়। একটা নির্দিষ্ট গাছের গুঁড়িতে চুন দিয়ে গোল দাগ দিয়ে নেয়। মাঝখানে থাকে একটি ফোঁটা। সেই কেন্দ্রবিন্দুকে যে গুলিবিদ্ধ করতে পারবে, 'তারই হাতের নিশানা ঠিক হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।'

অনেক সময় অন্য বন্দুক দিয়ে উড়ন্ত পাখীকে গুলি মেরে মাটিতে ফেলতে হবে। সেই লক্ষ্যভেদে যারা কৃতিত্ব অর্জন করে রতন তাদের সাধুবাদ জানায়।

ব্যায়ামাগারের মাটি কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে সেইখানে চলে ছেলেদের কুস্তিশিক্ষা। রীতিমত কুস্তি করলে শরীর খুব বলিষ্ঠ হয়! কুস্তির পরে বিশ্রাম করে ওরা ভিজে ছোলা আর গুড় খায়!

অনেক সময় গরু কিংবা মোষের দুধ পানিয়ে গরম গরম ফ্যানাসুদ্ধু তাই পান করে। এতে দেহে শক্তি সঞ্চার হয়।

শরীরকে শক্ত করতে হবে, আর দেহ থেকে রোগ-ব্যাধির বালাইকে দূরে তাড়িয়ে দিতে হবে।

যে সব সময় 'মাথা গেল, পেট কামড়াচ্ছে' কিংবা 'পায়ে ব্যথা হয়েছে' বলে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে, মুক্তি সংগ্রামে তার এতটুকু স্থান নেই।

তাই সবার আগে চাই শক্ত দেহ আর সরল মন।

গোটা ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেছে। আশে-পাশের গ্রাম থেকেও অনেক ছাত্র এসে ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়েছে।

দেহ চর্চার সঙ্গে মনের চর্চাও চলছে।

এদের ভেতর থেকে সব ছেলেকেই যে বিপ্লবীদলে নেওয়া হবে তা কিন্তু মোটেই নয়।

যারা সব কাজে সেরা, দিনের পর দিন তাদের বাছাই করেই আসল কাজের জন্য তালিকাভূক্ত করে নেওয়া হবে।

বিশ্বকর্মার দৃষ্টি নিয়ে রতন সকলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোন্ ঘরে যে আগামী দিনের যোদ্ধা তৈরি হচ্ছে তা কেউ জানে না। কাউকে সে হেলা করে না। সকলের মধ্যেই বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

তাই তো সে সাহসী মানুষ গড়বার ব্রত গ্রহণ করছে। ঘরে ঘরে সবাইকে ডাক দিয়ে যাবে সে। যে ঘুমে একেবারে অচেতন, তার ঘুম হয়তো ভাঙবে না। কিন্তু সজাগ ছেলেরা নিশ্চয় তার ডাকে সাড়া দেবে। এই তার একমাত্র ভরসা !

নানা জাতীয় প্রতিযোগিতা চলছে ছেলেদের মধ্যে। দূর পাল্লার হাঁটা, ডন-বৈঠকের প্রতিযোগিতা, সাঁতারের প্রতিযোগিতা, অন্ধকারে হাঁটার প্রতিযোগিতা, সাহসের প্রতিযোগিতা, ছেলেদের মধ্যে সব কিছুরই অনুশীলন চলছে।

একদিন রতন ঘোষণা করলে, 'তোমাদের মধ্যে সাহসের প্রতিযোগিতা হবে। প্রতিযোগিতায় কে কে নাম দিতে চাও, এগিয়ে এসো !'

ঝোঁকের মাথায় অনেক ছেলেই এসে নাম লিখিয়ে গেল। কিন্তু রতন যখন আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে, তখন বহু ছেলেই পেছু হটতে শুরু করলে।

কেউ বললে, মা রাজী হচ্ছেন না। কেউ ওজর দেখালে, বাড়িতে পিসীমার ভারী ব্যামো। তাঁর সেবা করতে হয়—রাত জেগে। কেউ বললে, সন্ধ্যার পরেই দারুণ ঘুম পায় যে ! অত রাত্তিরে ওখানে যাবো কি করে ?

রতনের প্রস্তাবটা একটু বিদঘুটে বৈ কি ! অমাবস্যার রাত্রে, ঠিক রাত বারোটার সময় একা একা নদীর ধারের শ্মশানে গিয়ে একটি খুঁটি পুঁতে আসতে হবে। সেই খুঁটির মাথায় একটি নিশান বেঁধে দিয়ে আসা চাই। একে একে যেতে হবে। দল বেঁধে যাওয়া চলবে না।

প্রথমে অনেকের নামই তালিকাভূক্ত হয়েছিল। কিন্তু শেষকালে কেউ কেউ ওজর-আপত্তি ও অসুবিধার কথা জানিয়ে নাম কাটিয়ে চলে গেল।

শেষ পর্যন্ত তিনটি ছেলে কিছুতেই পেছ-পা হয় নি। তারা অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে যাবে বলেই স্থির হল।

বাবুইবাসা বোর্ডিং হল কাজের ঘাঁটি।

সেইখানেই সব ছেলে জমায়েত হল। লটারী করে স্থির হল কে আগে যাবে।

রতন ব্যাপারটা সব বুঝিয়ে দিলে। সঙ্গে কোন আলো কিংবা টর্চ নেওয়া চলবে না ; চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে দশটা পাড়াকে জানিয়ে যাওয়া চলবে না। নিঃশব্দে চলে যেতে হবে।

হাতে থাকবে সেই বাঁশের খুঁটি আর পতাকা। বাঁশের খুঁটিটা ইটের টুকরো দিয়ে ঠুঁকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে, তার মাথায় নিশানটা বেঁধে দিয়ে আসতে হবে।

প্রথম যার নাম উঠেছে তার নাম জয়ন্ত। জয়ন্তের সত্যি সাহস আছে।

এমনিতেই সে রাত-বিরেতে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। অন্ধকারে চলতেও সে সাপের ভয় করে না। এ ছাড়া সে চমৎকার বাঁশী বাজাতে পারে।

জয়ন্ত একবার শুধু জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা, আমি বাঁশী বাজাতে পারব তো ?'

রতন উত্তর দিলে, ' মোটেই না। বাঁশী বাজিয়ে তুমি মনটাকে অন্য দিকে ঠেলে দিতে চাও। তার মানে, ওইভাবে তুমি মনের ভয়টাকে দূর করে দিতে মনস্থ করেছ। তা কিন্তু চলবে না। গান গাওয়া কিংবা বাঁশী বাজানো আদৌ গ্রাহ্য হবে না। শুধু নিজের মনের জোরে এগিয়ে যাবে। গান গাওয়া কিংবা বাঁশী বাজানো মানেই তুমি একটি সঙ্গী চাইছ। তার সঙ্গে গল্প বলে তুমি মনের ভয়টাকে আমল দিতে অনিচ্ছুক !'

যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, জয়ন্ত একাই যাচ্ছে। বাঁশের খুঁটি আর পতাকা নিয়ে সে রওনা হল। ছেলেরা কেউ কেউ শাঁখ বাজালে, কেউ কেউ উলুধ্বনি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করলো।

ভয়-ডর কাকে বলে জয়ন্ত জানে না। আপন মনেই সে এগিয়ে চললো। নদীর ধার দিয়ে চেনা পথ। না-ই বা থাকলো আকাশে চাঁদ, আকাশভরা তারার আলোতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে পথের রেখা।

ঝাউবন পেরিয়ে শ্মশানের দিকে আঁকা-বাঁকা পথ ধরলো জয়ন্ত।

ওই তো দূরে মরা-পোড়া ঘরটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্মশানের দিকে যেতে—বাঁ দিকে একটা ইঁটের খোলা পড়ে। জয়ন্ত সেইখান থেকে একটা ভাঙা ইঁট কুড়িয়ে নিলে। এইটে ঠুঁকে-ঠুঁকে বাঁশের খুঁটিটা মাটিতে পুঁততে হবে।

সদর রাস্তা ছেড়ে আরো কিছুদূর চলে যায় জয়ন্ত ! তার পাশ দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে কি একটা জানোয়ার খুব জোরে ছুটে পালিয়ে গেল।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো জয়ন্ত।

নাঃ, ওটা একটা শেয়াল।

শেয়ালটা হয়তো অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আধপোড়া মড়া খাচ্ছিল। বহু লোক কাঠের অভাবে শেষ পর্যন্ত মড়া পোড়ায় না, ফেলে রেখে চলে যায়। এই জাতীয় ঘটনা হামেশাই ঘটে।

জয়ন্ত মনে মনে স্থির করে নিলে, সে এতটুকু ভয় পাবে না। আর ভয় পাবার আছেই বা কী? দিনের বেলা সূর্যের আলো থাকে—এখন তারই অভাব।

অন্ধকার তো আর রাক্ষস নয়! ভয়ের কি আছে? জয়ন্ত এগিয়ে চলে।

একটা জায়গা বেছে নিয়ে দমাদ্দম পিটতে থাকে খুঁটিটাকে। মনে হল বেশ বসে গেছে। তারপর সে নিশানটা টাঙিয়ে দিলে খুঁটিটার মাথায়।

ব্যস্! কাজ খতম!

কিন্তু যেই ফিরতে যাবে—কে যেন জয়ন্তের কোঁচা টেনে ধরেছে ? যত টানে খোলে না !

তবে কি মহা শ্মশানে ভূত-প্রেত, দৈত্যি-দানো কেউ আছে ? দর-দর করে ঘাম ঝরতে থাকে জয়ন্তের সারা গা দিয়ে।

গোঁ-গোঁ শব্দ করে জয়ন্ত সেইখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে !

এক ঘন্টা বাদেও যখন জয়ন্ত ফিরে এলো না, তখন রতন দলবল নিয়ে সেইখানে এসে হাজির।

টর্চ দিয়ে জয়ন্তের জ্ঞানহীন দেহটা শুধু দেখলে ওরা।

তারপর রতন বললে, 'হুঁ ! যা ভেবেছি তাই। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে জয়ন্ত নিজের কোঁচাটাই খুঁটির সঙ্গে পুঁতে ফেলেছিল। তারপর যেই রওনা হতে গেছে—অমনি পিছু টান।'

আসলে মনের ভয়ই মানুষকে কাবু করে ফেলে। সেই দিন জয়ন্তের জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে ওদের বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল।

আঠারো

বৃটিশের চ্যালা-চামুণ্ডা—যারা তখন আমাদের দেশ শাসন করতো, তারা আমাদের দেশেরই মানুষ। কিন্তু তারা মনে করতো, এই যে বৃটিশ রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না—এর সমস্ত গর্ব আর গৌরব তাদের। পীড়ন করে হোক, শয়তানী করে হোক, নিজের দেশের মানুষদের কারাগারে পাঠিয়ে হোক—বৃটিশ রাজত্ব এই দেশে অক্ষুন্ন রাখতে হবে। রাজার জাতের পায়ে যাতে কাঁটাটিও ফুটতে না পারে, তারই খবরদারী করবার জন্যই তাদের জন্ম হয়েছে। তারা সরকারী চাকরী পেয়েছে সেই মহৎ কাজকে সকল দিক দিয়ে সফল করে তোলবার জন্য।

এই কথা তখনকার দিনের আমলারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতো।

এই সব যো-হুকুমের দল জানতে পেরেছিল যে, একদল বিপ্লবী তরুণ তাদের নিজেদের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার ব্রত গ্রহণ করেছে। এই বিপ্লবী দল আপন স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করছে না, নিজেদের সংসারের [illegible] কথা ভাবছে না, নিজেদের উপার্জনের কথা চিন্তা করছে না, শুধু ভাবছে—মাতৃভূমিকে কি করে স্বাধীন করা যায় ! কি উপায়ে বৃটিশকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের জাতীয় পতাকা ভারতের বুকে উঁচু করে তুলে ধরা চলে। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য বিপ্লবীদের কোনো ত্যাগই ত্যাগ নয়।

এই কাজের জন্য সোজা পথে না গিয়ে তারা আঁধার পথে পা বাড়িয়েছে। ঘরের সুখ-শয্যা পরিত্যাগ করে সর্প-সঙ্কুল পথে অমানিশা রাত্রে নীরবে অভিযান চালিয়েছে।

কবি ত' তাদের উদ্দেশ্য করেই গান বেঁধেছেন—

"আপন জনে ছাড়বে তোরে—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না—
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয়ত রে ফল ফলবে না !
আসবে ঘিরে আঁধার নেমে—
তাই বলে কি রইবি থেমে ?
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি—
হয়ত বাতি জ্বলবে না !
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"

এই বিপ্লবী দল যে গোপনে গোপনে দেশের মধ্যে নীরবে স্বাধীনতার ব্রত উদ্‌যাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে—সে কথা যো হুকুমের দল যে করেই হোক জানতে পেরেছিল।

তাই তারাও ঠিক করলে, এই বিপ্লবকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে। আমলারা আরও খোঁজ পেয়েছিল যে, বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলোর ভেতর দিয়েই এই প্রস্তুতি চলছে। দেশের সমস্ত ছেলেমেয়েকে যদি সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, তা'হলে বৃটিশ রাজত্বে ফাটল ধরবে, আর তাকে রক্ষা করা যাবে না।

এখানে ওখানে স্বদেশী ডাকাতির খবর তারা পেয়েছে, আর অত্যাচারী লালমুখদেরও যে ধ্বংস করবার চেষ্টা চলছে—ট্রেন ধ্বংসের পরিকল্পনা থেকে সে কথাও তারা বেশ জানতে পেরেছে।

তাই ওপর থেকে হুকুম এলো—শিক্ষা-বিভাগের ভেতর দিয়ে বিদ্যালয়গুলোর ওপর পীড়ন চালাও। ছাত্রদল যাতে কোনো রকম স্বদেশ আন্দোলনে যোগদান করতে না পারে সেজন্য প্রখর দৃষ্টি রাখো।

অন্যান্য বিদ্যালয়ের মতো—এই বাবুইবাসা বোর্ডিং আর তার ইস্কুলের ওপরও কড়া চিঠি এলো। কিন্তু যখন দেখা গেল, কিছুতেই ছাত্রদলকে শায়েস্তা করা যাচ্ছে না, তখন শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক এলেন বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে।

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর একটা বদনাম চিরকালই ছিল। তার ওপর যখন ওপর থেকে আদেশ পাওয়া গেল—তখন পুরোনো ঝাল ঝাড়বার একটা সুযোগ পেয়ে যো-হুকুমের দল সত্যি উল্লসিত হয়ে উঠলো। আমাদের দেশে একটা চলতি কথা আছে যে, ধরে নিয়ে আসতে বললে বেঁধে নিয়ে আসে। এখানেও অবস্থাটা দাঁড়ালো ঠিক সেইরকম।

একদিন কাউকে কিচ্ছু না জানিয়ে একদল সরকারী কর্মচারী, বিদ্যালয়ের পরিদর্শক আর সেই সঙ্গে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার এসে হাজির হলেন বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ।

আগে থাকতেই আট-ঘাঁট বেঁধে কাজ করেন এঁরা। তাই সাবধানের বিনাশ নেই ! শেষ রাত্তির থেকে খানাতল্লাসী শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু বিপ্লবী ছাত্রদল যে আরো চালাক সে-কথা যো-হুকুমের দলের জানা ছিল না।

বৃটিশ সরকার তাদের কার্যসিদ্ধির জন্য যেমন গোপনে গুপ্তচর নিয়োগ করে থাকে, তেমনি বিপ্লবী দলের গোপনকর্মী আছে। তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দুরূহ কাজ সম্পন্ন করে। এরা তখনকার দিনে ছড়িয়ে ছিল সরকারী দপ্তরখানায়, বিভিন্ন থানাতে, আমলাদের বাড়ির অন্দর-মহলে, এমন কি বড় বড় অফিসারের ছেলে, মেয়ে, ছেলে-বৌদের পর্যন্ত বিপ্লবীদল নিজেদের সমিতির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল—বিপ্লবী কাজের সকল রকম সুবিধের জন্য। আমলার দল তখনো এত ঘটনা ভাল করে জানতে পারেনি।

যে রাত্রে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ খানাতল্লাসী হবে তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় ছেলের দল তাদের মূলকেন্দ্রের গোপন চিঠিতে সব কিছু জানতে পারে। কাজেই রতন সেদিন গভীর রাত্রে বোর্ডিং-এর একটা নিরালা ঘরে বিশ্বাসী বিপ্লবী ছাত্রদের একটা পরামর্শ সভা আহ্বান করে।

একদল ছাত্র বলে, চলো আমরা দিন কয়েকের জন্য গা-ঢাকা দি। তা'হলে দেশের শত্রুরা এসে কোনো কিছুরই হদিস পাবে না।

রতন জবাব দিলে, 'না ভাই, তাতে ওদের সন্দেহ আরো বাড়বে। ওদের মনে এই ধারণা হবে যে, একদল বিপ্লবী এখানে বাসা বেঁধেছে। গুপ্তচরেরা সব সময় দৃষ্টি রাখবে এই বোর্ডিং-এর ওপর। ফলে আমাদের সবাইকার জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।'

ছেলেরা জিজ্ঞেস করলে, 'তা'হলে আমরা এখন কি করবো ? আমাদের এই বোর্ডিং-এ অনেক রিভলবার, কিছু অস্ত্রশস্ত্র আর বোমা-বারুদ লুকোনো আছে। সেগুলোর কি ব্যবস্থা করা যাবে ?'

রতন হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, 'দেখ ভাই, পালিয়ে ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। তার চাইতে এসো, আমরা ওদের সঙ্গে বুদ্ধির খেলা খেলি। ওরা যদি যায় ডালে ডালে, তবে আমরা যাবো পাতায় পাতায়। দেখি সে খেলায় কে জেতে, আর কে হারে!'

একটি ছেলে জিজ্ঞেস করলে, 'সেই খেলাটা আমরা কি ভাবে খেলবো—আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দাও না। আমাদের যে শিয়রে সংক্রান্তি। সময় আর মোটেই হাতে নেই।'

রতন বললে, 'ভয় পাবার কোন কারণ নেই। এক্ষুণি আমি সবাইকে কাজ ভাগ করে দিচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে কাজের তালিকা তৈরি হয়ে গেল।

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর কাছেই একটা নিবিড় জঙ্গল ছিল। দিনের বেলাতেও সেখানে কেউ ঢোকে না।

একদল ছেলে সেখানে গিয়ে টর্চ ধরবে, আর একদল রাতারাতি গর্ত খুঁড়ে ফেলবে।

এই দুই দল ছাত্রকে রতন পাঠিয়ে দিলে জঙ্গলের ভেতর।

ওরা একটি বড় বটগাছের তলায় জায়গা ঠিক করে—গভীর একটি গর্ত খুঁড়ে ফেলল।

রতন তখন আর কয়েকজন ছেলের সহায়তায় থলে ভর্তি করে লুকিয়ে রাখা রিভলবার, আর অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সেই গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। তার ওপর রইলো কিছু খড় আর কাঠের গুঁড়ো। তার ওপর মাটি চাপা দিয়ে দিব্যি ঘাসের চাপড়া বসিয়ে দেওয়া হল। তখন কে দেখে বলবে যে, এই জঙ্গলের ভেতর গর্ত খোঁড়া হয়েছে, আর তার তলায় এত মজার ব্যাপার লুকিয়ে আছে!

আর দু'টি ছেলেকে রতন নৌকো করে কাছের গঞ্জে পাঠিয়ে দিলে পরদিন সকালবেলা। সেখানে কিছু জিনিস কেনা-কাটা করতে হবে। ওদের বারবার সাবধান করে দিলে রতন যেন জিনিসগুলো কিনে তাড়াতাড়ি বোর্ডিং-এ ফিরে আসে। কেননা, তারপরও অনেক কাজ সবাই মিলে শেষ করতে হবে।

সারাদিন ধরে এঘরে-ওঘরে খুটখাট কাজ চললো। অন্যান্য ছেলেরা ইস্কুলে চলে গেছে। শুধু কয়েকটি বিশ্বাসী ছাত্রকে রতন যেতে দেয়নি। তারাই ক্ষিপ্রগতিতে সব কাজ সমাধা করে ফেলেছে।

সেদিন বোর্ডিং-এর খাওয়া-দাওয়ার পাট সন্ধ্যের মুখেই সেরে ফেলা হল।

সব ঘরেই ছাত্ররা পড়তে বসেছে। পড়াশোনায় এত মনোযোগ ছেলেদের এর আগে আর কখনো দেখা যায় নি! প্রতিটি কামরায় আলো জ্বলছে। ছেলেরা শান্তশিষ্ট হয়ে বিভিন্ন বিষয় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মুখস্থ করছে। কেউ পড়ছে ইংরেজী, কেউ ইতিহাস, কেউ ভূগোল, কেউ জ্যামিতি, আবার আর একদল ছেলে বাংলা কবিতা মুখস্থ করতে লেগে গেছে।

এ যেন একেবারে শটির বনের পাঠশালা বসে গেছে। সবাই শেয়াল পণ্ডিতের পড়ুয়া ছাত্র। কুমীর খুড়ো এলেই—চালাকির বুদ্ধিতে তাকে বোকা বানিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

সন্ধ্যের বেশ কিছু বাদে একটি নতুন ছেলে, একটি চিঠি নিয়ে রতনের কাছে হাজির হল।

রতন সেই চিঠি পড়ে জানতে পারলে—বোর্ডিং-এ যারা খানাতল্লাসী করবে সেই বীর-বাহিনী নানা সাজে সজ্জিত হয়ে রওনা হয়েছে। তাদের মনে এ বিশ্বাসও আছে যে, আত্মরক্ষার জন্য বোর্ডিং-এর ছেলেরা বোমা ছুঁড়তে পারে কিংবা রিভলবার ব্যবহার করতে পারে। তাই ওরাও নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যেন যুদ্ধযাত্রা করেছে!

চিঠিখানি পড়ে রতন মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো। তারপর প্রদীপের আলোতে ধরে সেই জরুরী পত্রখানি সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে ফেললো !

সেই নতুন ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'সব ঠিক আছে। আমি আর নতুন কোনো চিঠি দেবো না। তুমি এক্ষুণি মূলকেন্দ্রে ফিরে যাও। এ অঞ্চলে তোমায় কেউ চেনে না। তুমি একেবারে নতুন মুখ। ওদের গুপ্তচর চারদিকে সব সময় ঘোরাফেরা করছে। তাই তোমার তাড়াতাড়ি এ জায়গা ছেড়ে যাওয়াই ভাল।

ছেলেটি মাথা নেড়ে তার মুখখানি চাদরে ভাল করে ঢেকে নিয়ে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল, আর তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

সারা বোর্ডিং অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ঘড়ির পেণ্ডুলামের শব্দটা টক্‌টক্‌ করে কানে ভেসে আসছে।

রতনের চোখে ঘুম নেই। সে চুপ করে শুয়ে আছে। আর ঘড়ির শব্দটা সব সময় তাকে সচেতন করে দিচ্ছে।

আজকে রাতের অতিথির জন্য তাকে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতে হবে বৈকি!

এদের অভ্যর্থনার জন্য রতন অন্যরকম ব্যবস্থাও করতে পারতো।

নৈশ আকাশের নীরবতাকে খানখান করে ভেঙে দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করে উঠে শত্রুকে মুহূর্তে ধরাশায়ী করতে পারতো। ওদের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারতো বোমার প্রচণ্ড আঘাতে !

কিন্তু তাতে কাজ কিছুই হবে না। শুধু জানিয়ে দেওয়া হবে যে, বিপ্লবী দল এই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ সত্যি সত্যিই নীড় বেঁধেছে। তার ফলে অকারণে কয়েকটি নিরীহ ছেলেকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। অমানুষিক পীড়ন করবে তাদের ! কারাগারে পাঠিয়ে দেবে এখানে ওখানে।

কিন্তু রতন তা চায় না। চরম আঘাত হানবার সময় এখনো আসে নি।

বিপ্লবীদের ভাল করে প্রস্তুত হতে হবে। তার জন্য আরো কিছু সময় চাই।

আজ বুদ্ধির যুদ্ধে তাদের জিততে হবে।

শেষ রাত্তিরে সত্যি হানাদাররা এসে হাজির হল। ছেলেদের মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হল—ওরা কিছুই জানে না !

খানাতল্লাসী শুরু হতে দেখা গেল, প্রতি ঘরে সম্রাটের ছবি শোভা পাচ্ছে। কোনো কোনো ফটোর গায়ে ফুলের মালা দুলছে। 'England's Work in India' থেকে তর্জমা করে নানা বাণী ঝোলানো রয়েছে দেয়ালের গায়ে। ভাইস্‌রয়দের ফটোর নীচে রাজভক্তির চমৎকার নিদর্শন ! বৃটিশের পতাকাও খুঁজে পাওয়া গেল কোনো পড়ার টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে !

যে অফিসারের ওপর খানাতল্লাসীর ভার ছিল তিনি স্থানীয় থানার কর্মচারীকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'কি খবরাখবর রাখেন আপনারা ? এই রকম এক রাজভক্ত বোর্ডিং সম্পর্কে আপনি আমায় ভুল খবর পাঠিয়েছেন ! আপনার বিরুদ্ধে আমি হেড-কোয়ার্টারে রিপোর্ট করবো।'

গট্‌গট্‌ করে অফিসার বেরিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে গেল তাঁর বিরাট বাহিনী।

তারপরেই ছেলেদের আনন্দের আতিশয্যে এত ক্ষিদে পেয়ে গেল যে, বোর্ডিং-এর বামুন সঙ্গে সঙ্গে খিচুড়ি আর মাংস উনুনে চাপিয়ে দিল।

আমার মায়ের মুখ

(কিশোর উপন্যাস)
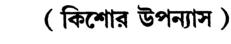
এ-রকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

কুশলের যেদিন জন্মদিন সেই দিনই তার মায়ের মৃত্যুদিন। এ-কথা শুনে কেউ যেন মনে না করে যে, কুশলের জন্মদান করেই তার মা অকালে দেহরক্ষা করেছিলেন।

ঘটনাটা মোটেই তা নয়। কুশলের দুখিনী মা সারাজীবন কষ্ট করে ছেলেকে মানুষ করবার চেষ্টা করেছেন। তারপর একদিন চরম দুঃখের মধ্যে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। সেদিন তাঁর চোখ দু'টিতে কুশলের মুখখানি ক্ষণকালের জন্যে ভেসে উঠেছিল কিনা—সে-কথা কেউ বলতে পারে না।

আজ যে কুশলের জন্মদিন সে-খবর এ-অঞ্চলে কে না জানে ? সেই জন্মদিনের উৎসবে যারা নিমন্ত্রিত হয়েছে তাদের চাইতে যারা মুখে-মুখে খবরটা পেয়েছে—তাদের সংখ্যা অনেক বেশী।

কলেজের ছাত্রদল, বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা, বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েরা, কারখানার শ্রমিক দল, নদীর ঘাটের মাঝি-মাল্লারা সবাই জানে এ অঞ্চলের প্রাণ-পুরুষ কুশলের আজ জন্মদিন।

তাই নিমন্ত্রণ না থাকলেও—শুধু পাখীর মুখে খবর পেয়ে ওরা দলে দলে মিছিল করে আসবে এই বিশেষ বাড়িটিতে।

সে কথা কুশলও যে না জানে তা নয়।

কুশলের আজ জন্মদিন এ-কথা অজানা লোকেরও আজ জানা হয়ে গেছে। কিন্তু তার মায়ের আজ মৃত্যুদিন এ-কথা কুশল ছাড়া আর কেউ জানে না। জানবার সুযোগও হয় নি কারো কখনো। কুশলের জন্মদিনের উৎসবে তার মায়ের মৃত্যুদিনের বেদনাকে যেন বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে দিয়েছে।

আজ সকাল থেকে সারাটা দিন ধরে যে আনন্দের প্রবাহ চলবে, সে কথা কুশল বেশ অনুমান করতে পারছে।

প্রথমেই মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুর এসে অতি ভোরে তাকে আশীর্বাদ করে গেলেন।

ছেলেরা সকলেই কৃতি। তারাও একে একে এসে বাবার পায়ের ধূলো নিয়ে নিজের নিজের কাজে চলে গেল।

নিজের সারা জীবনের চেষ্টায় বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে কুশল। ছেলেরা তার বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত রয়েছে। কাজ ভাগ করে দিয়ে কুশল নিজে নিশ্চিন্ত।

ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছায় হোক এই অঞ্চলের সব কিছু গড়বার কাজে জড়িত হয়ে পড়েছে কুশল। ছোট-বড় সকলেই যে কুশলের বিশেষ পরিচিত এই কথাটাই নানাভাবে সকলে জানাতে চায়।

এটা দোষের কিছু ব্যাপার নয়, মানুষের স্বাভাবিক বাসনা। কুশল সব কিছুই বোঝে আর আপন মনে তৃপ্তির হাসি হাসে।

জন্মতিথি উৎসবে তাকেই মানায়, যার জীবন—ধনে-জনে-মানে একেবারে সফল হয়ে ওঠে।

সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কুশলের জীবন একেবারে সাফল্যের শিখরে গিয়ে পৌঁছেছে।

আজ তার জীবনে চাইবার বা কামনা করবার কিছু নেই।

কিন্তু আর একদিকে তীব্র বেদনার মতো তার দুখিনী মায়ের কথা যখন মনে হয়—চরম দুঃখে সে যেন একেবারে নেতিয়ে পড়ে। সেই সময় সে তার মায়ের জন্যে কোনো সান্ত্বনাই খুঁজে পায় না।

তার আজকের এই প্রাচুর্য্য তার দুখিনী মায়ের সারা জীবনের অভাব-অনটনকে যেন দাঁত বের করে বিদ্রূপ করতে থাকে !

আজ সারা সকাল ধরে মানুষের মিছিল যেন আসছে তার বাড়ির দিকে।

সেই ছেলেবেলাকার ভুলে যাওয়া দিনে মায়ের তপ্ত বুক ছাড়া সারা দুনিয়ায় ওর প্রাণ জুড়োবার জায়গা ছিল না। আজ কুশল এ-কথা জানে আর বিশ্বাস করে যে মানুষের ভালবাসা সে পেয়েছে। তার আশে-পাশের সকলে তাকে আপনার বলে গ্রহণ করেছে।

এ অঞ্চলের সুধীজনে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। ছাত্রদল তাদের আস্থা জানিয়ে গেছে। খেলোয়াড় দল জানিয়ে গেছে তাদের উচ্ছ্বাস, শিক্ষকদল প্রকাশ করে গেছেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া কারখানার শ্রমিক দল, নদীর ঘাটের মাঝিমাল্লারা, বাজারের দোকানদাররা অবধি বাড়ি-বয়ে এসে রাশি রাশি উপহার দিয়ে গেছে তার জন্মদিনে।

জন্মদিন ত' অনেকেরই হয়। বহু লোকও আমন্ত্রিত হয়, কিন্তু এমনটি সচরাচর দেখা যায় না।

অবশ্য এর পেছনে কুশলের বিরাট কর্ম-প্রতিভা লুকিয়ে আছে।

নিজের প্রতিষ্ঠান ছাড়াও.....এই অঞ্চলের সব কিছু কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কুশলের কর্মকুশলতা জড়িয়ে আছে।

এ অঞ্চলের ছেলেদের ইস্কুল, মেয়েদের বিদ্যালয়, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, লাইব্রেরী, খেলার মাঠ, সাঁতারের পুকুর, রঙ্গমঞ্চ , ক্লাব, সভা-সমিতি সব কিছুর সঙ্গে কুশলের কর্ম-কুশলতার সুক্ষ্ম-সূত্র যেন চারিদিক দিয়ে জড়িয়ে আছে।

স্থানীয় মহিলা সমিতিরও এ ব্যাপারে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। প্রকৃতপক্ষে কুশলের সহযোগিতা ও আনুকূল্যেই এই মহিলা সমিতিটি গড়ে উঠেছে। আর নানা-

ধরণের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও অন্যান্য সংগঠনমূলক কাজ করে চলেছে।

এই সব মহিলারাও দল বেঁধে এসে নানা জাতের হাতের কাজ উপহার দিয়ে গেছে।

সন্ধের পর এসেছিল পাটকলের বিদেশী ব্যবসায়ী আর অফিসারের দল। তাদের জন্য আলাদা রকম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

এ বাড়ির ছোট মেয়ে তনুকার আবদার ছিল কিন্তু অন্যরকম।

সে তার বন্ধুদের দিয়ে একটি ছোট্ট নৃত্য-নাটিকার আয়োজন করেছিল। সেই নাটিকাটি অভিনীত হয়েছিল আবার তাদেরই "কুশল ভবনের" হল ঘরে—ঠিক সন্ধ্যেবেলায়।

সেই সময় যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁরা মেয়েদের গান শুনে, নাচ দেখে আর আলোর খেলায় খুশী হয়ে ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে তাদের উৎসাহিত করেছিলেন।

অনেকের জন্যে আবার পদকও ঘোষণা করা হয়েছিল। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আর অধ্যাপকেরাই এই পদকের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাতে তনুকার আর আনন্দের সীমা ছিল না।

মেয়ের বাবা অবশেষে একটি মোটা অঙ্কের চেক মেয়ের বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

তাতে কচি মুখের হাসি সেই হলঘরটিকে ভরিয়ে তুলেছিল। একটি মানুষের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে আশে-পাশের সকল লোকের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা বড় সহজ কথা নয়।

বাড়ির ঝি-চাকরেরা এসেও গৃহস্বামীর পদধূলি নিয়ে গেছে, আর হাত ভরে বক্‌শিস পেয়ে হাসি মুখে ফিরে গেছে।

বাড়ির ভেতর থেকে তাগিদ এসেছে এখন রাত্রের খাবার পাঠাতে হবে কি না!

কিন্তু অবেলায় খেয়ে কুশলের আজ ক্ষিদে নেই! তা ছাড়া মনটা কানায় কানায় ভরে আছে বলেই কি আজ রাত্রে ক্ষিদে পায় নি?

কুশল জানিয়েছে, খাবার যেন তার শোবার ঘরে ঢেকে রেখে দেওয়া হয়। বেশী রাত্তিরে ক্ষিদে পেলে কিছুটা খেয়ে নেবে।

চুপচাপ বসে আছে কুশল তার লাইব্রেরী ঘরে।

ধীরে ধীরে সারা বাড়ির উৎসবের আলো নিভে এসেছে।

এই কিছুক্ষণ আগেও যে বাড়ি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আর অভ্যাগত মানুষের কলহাস্যে মুখরিত ছিল—সেটা যেন ধীরে ধীরে নীরব হয়ে এসেছে।

একটা নীল আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে কুশল, তার এই লাইব্রেরী ঘরে।

চুপচাপ বসে আছে মানুষটি যেন এক অসীম সমুদ্রের সামনে।

এই আলো-আঁধারী ঘরে একা একা চুপচাপ বসে কত কথাই না মনে পড়তে লাগলো।

মনে জাগল, কত সময় কুশল দুস্থ-সাহিত্যিকদের পুস্তক রচনার জন্য অর্থ সাহায্য করেছে।

আজ তার কেবলি থেকে থেকে মনে পড়তে লাগল, তার নিজের এই বিচিত্র জীবনী সে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় নি কেন?

নিজের জীবনী লিখতে গেলে কি অনেক অবান্তর কথা এসে পড়ত?

অথবা ছেলেবেলায় দুঃখের আর অভাবের কথা লিখলে আজকের দুনিয়ার চোখে সে খাটো হয়ে পড়ত?

সবাই মুখ টিপে টিপে হাসত তার সেই ভুলে যাওয়া চরম দুর্দিনের কথা জানতে পেরে?

আশে-পাশে কি অনেক ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে? নাকি তার মগজেই রাশি রাশি ঝিঁঝিঁ পোকা বাসা বেঁধেছে? কিছুতেই তাদের সেই ঝিম্‌ঝিমে ডাককে সরানো যাচ্ছে না।

নিজের দু'টি আঙুল দিয়ে সে তার কপালটা টিপে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। কিন্তু ঝিঁঝিঁ পোকার সেই ঝিম্‌ঝিম্ শব্দ কিছুতেই তাড়ানো যাচ্ছে না।

কুশল আপন মনে ভাবতে লাগলো। যারা আজ তার জন্মতিথি উৎসবে যোগদান করে ঘরে ফিরে গেল—তারা কেউ খুশী হয়েছে, কেউ কেউ বাড়িতে ফিরে গিয়ে ঈর্ষায় হয়ত অনেক নিন্দাবাদ করেছে। কেউ খোসামোদ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছে। আবার দিলদরিয়া অনেকে সুখ-শয্যায় আরামে নিদ্রা উপভোগ করছে। তাদের মনে কোনো গ্লানি নেই।

অপরের ঐশ্বর্য দেখে খুশী হয়, এমন মানুষও ত' দুনিয়ায় আছে।

এই জন্মদিনের উৎসবে যারা গৃহটি সজ্জিত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, যারা ফুলের মালা সরবরাহ করেছে, যে সব লোক খাবারের জোগান দিয়েছে, যে প্রতিষ্ঠান আলোকমালায় বাড়িটি রোশনাই করেছিল, যারা বিভিন্ন সময়ে এসে তাকে উপহার দিয়ে গেছে,—এমন কি যে সব ভিক্ষুক উৎসবের ফেলে-দেওয়া খাবারগুলি খেয়ে তার জয়ধ্বনি করে নিজ নিজ ডেরায় ফিরে গেছে—সকলেই এখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে।

কিন্তু তার চক্ষে আজ রাত্রে ঘুম নেই কেন? তার সৌখীন শোবার ঘরে সুন্দর করে বিছানা পাতা আছে। রাত্রের আহারের জন্য নানা জাতীয় মুখরোচক খাদ্য ঢাকা দেওয়া আছে, সাদা ধবধবে নেটের মশারি ফ্যানের মৃদু হাওয়ায় কাঁপছে, কিন্তু তার নয়নে নিদ্রা নেই!

এই অবস্থা ত' তার চিরদিন ছিল না। মায়ের বুকের কাছটিতে শুয়ে সে ছেঁড়া কাঁথায় দারুণ শীতে রাত কাটিয়েছে।

তখন ত' তার চোখ দু'টিতে ঘুমের অভাব হয় নি!

আজ কেন তার জানা সারা দুনিয়া ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসির আল্‌তো ছোঁয়ায় সারাদিনের ক্লান্তিতে ভুলে সুখ-স্বপ্নে মগ্ন রয়েছে.....আর সেই কেন একা জেগে থেকে বিভীষিকা দেখছে?

বিভীষিকা?

হঠাৎ এই কথাটি তার মনে এলো কেন?

সে ত' আজ সুখী তৃপ্ত, সম্পদে ঐশ্বর্যে সার্থক।

তবে সে কেন গভীর রাত্রে বিভীষিকা দেখবে?

সে চোখ তুলে ঘরের দেয়ালগুলির দিকে তাকাল।

ওই ত' তার ছেলে-মেয়েদের হাসি মুখগুলি দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় শোভা পাচ্ছে—

ছোট মেয়েটির ফটোর দিকে তাকালে চোখ আর ফেরানো যায় না।

কোঁকড়া-কোঁকড়া একমাথা ভর্তি চুল। তার ওপর চোখে মুখে দুষ্টুমির হাসি।

দেখে মনে হয়—এখুনি বুঝি গান গেয়ে উঠবে। বাড়ির সবাইকার ফটোই সযত্নে টাঙ্গানো আছে। বাড়ির গৃহিণী খুশী-খুশীভাব নিয়ে তাকিয়ে আছেন—ছেলেমেয়েদের দিকে।

দূর সম্পর্কের আত্মীয়-আত্মীয়া, বন্ধুদের ছবিও রয়েছে। খাস খানসামার ছবিটিও বাদ পড়ে নি এই মিছিলের মাঝখান থেকে।

কুশল সারা জীবনে যত জায়গায় গিয়েছেন তারও ফটোগুলি রয়েছে দেওয়ালের আর এক দিকে সাজানো।

কোথাও গেছেন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে, আবার কোথাও পাড়ি জমিয়েছেন—নিছক দেশ ভ্রমণের আনন্দে।

ক্যামেরাম্যান কোনো ছবি তুলতেই ভুল করে নি। কিন্তু এই বহু রকম চিত্রের শোভাযাত্রায় কোথায় তার মা ? তার একখানি ছবিও এই বিরাট গৃহের কোনো দেওয়ালে স্থান পায় নি—

আজ তার দুখিনী মায়ের বিষাদ মলিন মুখখানি কি কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না?

দুই

তখনো ভোরের আলো সারা আকাশটায় ছড়িয়ে পড়েনি। কখন যে মায়ের ঘুম ভেঙেছে কেউ জানে না।

সারা উঠোনটায় মা গোবর জলের ছড়া দিচ্ছেন, আর আপন মনে স্তোত্র আবৃত্তি করে চলেছেন।

এরই মধ্যে মায়ের মনে হ'ল—পূবের আকাশটা অনেক ফিকে হয়ে এসেছে। এইবার বোধকরি সকল আঁধার দূর করে দিয়ে রাঙা সূর্যি উঠবে।

কুশল কিন্তু তখনো জাগেনি।

আধো ঘুম, আধো জাগরণের ভেতর মায়ের মুখের সেই—সংস্কৃত স্তোত্র ওর কানের ভেতর এক গুঞ্জরণের সৃষ্টি করেছে। তাতে শেষ রাত্তিরের মধুর স্বপ্ন আরো মিঠে হয়ে উঠেছে।

আরো কিছুক্ষণ এইভাবে মায়ের মুখের গুণ গুণ গান শোনা গেল।

ভোরের পাখ-পাখালি চারদিকে ডাকাডাকি সুরু করেছে।

মা হঠাৎ উঠোন থেকে হাঁক দিলেন, ওরে কুশু, তুই কি আজ উঠবি নে ? এরপর রোদ্দুরে সারা উঠোন ছেয়ে যাবে।

কুশল এই ডাকটির জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল। ঘুম ভেঙেছিল, কিন্তু বিছানাটা ছাড়তে পারছিল না।

এইবার এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো কুশল। তারপর লাফাতে লাফাতে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল।

মা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন, একি, একেবারে আদুল গা যে ! এক্ষুণি ঠাণ্ডা লেগে যাবে। যা, দোলাইটি জড়িয়ে নে গায়ে।

তারপর গলাটা একটু খাটো করে আদরের সুরে কইলেন, আচ্ছা কুশু তোর কি বুদ্ধি-সুদ্ধি আর কোনো কালেই হবে না ? হঠাৎ অসুখ-বিসুখ করলে তখন উপায়? এর পর আবার পাঠশালায় যেতে হবে—

কুশু কিন্তু মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে ঠিক বাদুড়ের মতো ঝুলতে লাগলো।

মা হাসতে হাসতে বললেন, আর আদর খেতে হবে না। চারদিকে তাকিয়ে দেখ, দিনের আলো দিব্যি ফুটে উঠেছে।

কুশল মায়ের গলা ছেড়ে দিয়ে উঠোনের এদিক-ওদিক পানে চেয়ে দেখলে—

ওদের উঠোনের এক ধারে শিউলী গাছের তলায় রাশি রাশি ফুল পড়ে যেন সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর সাদা আর হলদে চিকণের কাজ তৈরি করেছে।

তাছাড়া শিউলী ফুলের মিষ্টি সুবাস সারা উঠোনটাকে যেন মাতিয়ে রেখেছে।

ওদিকে গোয়ালঘরের পাশের ছোট ঘরটি থেকে একদল হাঁস প্যাঁক্ প্যাঁক্ শব্দ করতে করতে পুকুরের দিকে এগিয়ে চলেছে। ভোর হয়ে গেছে, এখন আর ওদের অন্ধকার ঘরে আট্‌কে রাখা যাবে না। তাই ছোট বাখারীর দরজাটা খোলার শব্দ পেয়েই ওরা দল বেঁধে পুকুরের জলে গুগ্‌লীর সন্ধানে চলেছে।

গাই দু'টোও হাম্বা হাম্বা রব তুলেছে গোয়ালঘরে। ওদেরকে বের করে এনে এখন দুধ দুইতে বস্‌বে বিষণখুড়ো।

বিষণখুড়ো একটু দূরে গোয়ালাপাড়ায় থাকে। কিন্তু কুশলের সঙ্গে ভারী ভাব। কুশলদের অনেক কাজ বিষণখুড়ো প্রাণের টানে করে দিয়ে যায়।

আশে-পাশের ফুল গাছগুলিতে নানা জাতের আর নানা রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। তারই তলায় তলায় যে ঘাসের জমি আছে সেখানে মুক্তোর মতো ফোঁটা ফোঁটা শিশির জমে আছে। এই শিশির হাত দিয়ে তুলে নিয়ে কুশল ঠোঁটে আর মুখে মাখতে লাগলো। তাতে নাকি ঠোঁট ফাটে না !

মা বললেন, ঘুঁটের ছাই আছে উনুনের ধারে। একটুখানি হাতে করে নিয়ে সোজা পুকুরঘাটে চলে যা। ভালো করে দাঁত মেজে ধুয়ে আসবি। দাঁতে যেন ময়লা জমতে না পারে। এর মধ্যে বিষণ এসে পড়বে। সে গাইয়ের দুধ পানিয়ে দেবে। ঘরে মুড়ির মোয়া আছে। কলাও বোধ করি পেকেছে। তাই মেখে খেয়ে পাঠশালায় চলে যাবি।

ওদের পাঠশালা সকাল বেলা বসে। দুপুরবেলা পণ্ডিতমশাই কোন দোকানে গিয়ে যেন খাতা লেখেন।

কুশল পুকুরের ঘাটলায় গিয়ে হাজির হ'ল। অনেকগুলি শাপলা ফুটে আছে ঘাটলার আশে-পাশে। একটা বড় নারকেল গাছের গুঁড়ি কেটে এই তৈরি করা হয়েছে। অনেক ওপরে পাড়। মাটি কেটে সিঁড়ির মতো থাক করা হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে এসে পৌঁছতে হয়।

এই পুকুরে অনেক বড় বড় মাছ আছে। কুশল তাদের অনেককে চেনে। তাদের মজার মজার সব নাম দিয়েছে।

—রাঙা মূলো, বিজলী আলো, ঢেউ জাগানো, মনভোলানো—এ সব নাম কুশলের দেওয়া।

অনেক সময় বন্ধুদের ডেকে এনে হাজির করে। মুড়ি ছিটিয়ে দেয় জলের ওপর। তখন এই সব মাছের দল এসে ঘাটতলার ধারে ভীড় করে।

কুশল বন্ধুদের মাছগুলি সব চিনিয়ে দেয়। কার যে কোন নাম—বন্ধুরা ঠিক ঠিক বলতে পারে না।

কুশলের কিন্তু কখনো ভুল হয় না।

ওই যে টক্‌টকে লাল রুই মাছ—ওর নাম রাঙা মূলো। আর ওই যে ঝিলিক

মারছে চিতল—ওটার নাম—ঢেউ জাগানো। আর মন-মাতানো—কোন্‌টা বল দেখি?

ছেলের দল এদিক-ওদিক তাকায় ঠিক মত জবাব দিতে পারে না।

কুশল তখন প্রাণ খুলে হাসতে থাকে।

—কেমন তোদের ঠকিয়ে দিলাম,—দেখলি ত' ?

ওদিকে উঁচু পাড়ের ওপর থেকে মায়ের ডাক শোনা যাচ্ছে—

ওরে কুশু, ঘাটলা থেকে তাড়াতাড়ি চলে আয়—বিষণ এসেছে। গাইয়ের দুধ পানাতে বসেছে।

কুশল লাফে লাফে উঠে এলো উপরে।

গোয়ালঘরের কাছে এসে দেখে বিষণখুড়ো দিব্যি উবু হয়ে বসে একটি বড় হাঁড়িতে করে দুধ পানিয়ে নিচ্ছে।

মা আর ছেলে—ওরা ত' মোটে দু'জন—তাই পরিমাণে অনেক দুধ ওদের বেশী হয়। মা নানা রকম ক্ষীরের সাজ, আর পিঠে-পায়েস তৈরি করেন এই দুধ থেকে। ওদের গাইয়ের দুধে ত' এক ফোঁটা জল মেশানো হয় না। তাই সে দুধের স্বাদের তুলনা নেই।

মায়ের ব্যবস্থা মত গরম দুধ, মুড়ির মোয়া আর কলা মেখে মজা করে ফলার করে কুশল পাঠশালায় রওনা হ'ল।

গাঁয়ের কয়েকটি ছেলে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল পথের ধারে।

এক বন্ধু জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে কুশল, আজ তুই আসতে এত দেরী করলি কেন?

কুশল চোখ পিট্ পিট্ করে ওর দিকে তাকালে। বললে, হুঁ! হুঁ! সে এক ভারী মজার ব্যাপার।

সবাই এগিয়ে এলো, কি রে কি?

কুশলের মুখে সেই দুষ্টুমীর হাসি লেগেই আছে।

উত্তর দিলে, আজ আমার পুকুরের মাছগুলোকে ভালো করে দেখে এলাম।

আর এক বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, রাঙা মূলো, বিজলী আলো, ঢেউ খেলানো আর মনভোলানো?

কুশল বললে, হ্যাঁরে ওরাই। দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে পুকুরের টল্‌টলে জলে। আরো অনেক বেড়ে গেছে। দেখতে শুন্‌তেও ঝক্‌মকে হয়েছে!

ছেলের দল শুনে খুব খুশী হ'ল। বললে আর একদিন দল বেঁধে গিয়ে তোর মাছগুলোকে ভালো করে চিনে আস্‌বো। রাঙা মুলোটাকেই বেশ চেনা যায়। আর সব মাছগুলো যে সবার সঙ্গে মিশে পড়ে।

ওরা গল্প করতে করতে পাঠশালার দিকে এগিয়ে গেল।

যেতে যেতে পথের ধারে একটা পোড়ো বাড়ির উঠোনে একটা পেয়ারা গাছে অনেকগুলি পেয়ারা পেকে আছে দেখা গেল।

ছেলের দলের তখন কি আর পাঠশালার কথা মনে থাকে? একবার সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকালো, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঙ্গপালের মতো।

দেখতে দেখতে গোটা গাছটা একেবারে সাফ্ হয়ে গেল। আর ছেলেদের কোঁচড় আর পকেট ভর্তি হয়ে উঠল।

এতক্ষণে বাছাধনদের মনে পড়ল যে অনেক দেরী হয়ে গেছে, এইবার পাঠশালায় গেলে পণ্ডিতমশায়ের বেত নিশ্চয়ই পিঠের ওপর পড়বে।

তখন ছেলের দলের মধ্যে দু'টো ভাগ হয়ে গেল। এক দল বলছে, আর পাঠশালায় গিয়ে কাজ নেই। তার চাইতে চল—সোজা নদীর পথে চলে যাই। সেখানে যেতে যেতে দিব্যি পেয়ারাগুলো সাবাড় করা যাবে।

আর এক ভাগ কিন্তু ওদের কথায় রাজী হ'ল না।

তারা বললে, চল ত' আগে দেখা যাক—ইস্কুল বসেছে কি না। তারপর অবস্থা বুঝে পাঠশালার পেছন দিক দিয়ে সট্‌কান দিলেই হবে।

আবার দু'দল একমত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে গেল।

একটি ছেলে গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেল। পাঠশালার দরজা ত' বন্ধ।

তখন সে পাঠশালার পেছনে পণ্ডিতমশায়ের ঘরের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। পণ্ডিতমশায়ের ভাইপো আর দু'টি ছেলের সঙ্গে মারবেল খেলছে। তাদের কাছে জানা গেল পণ্ডিতমশায়ের জ্বর হয়েছে। আজ আর পাঠশালা বসবে না।

এই সুখবরটি দেবার জন্যে ছেলেটি ছুটতে ছুটতে নিজেদের দলে ফিরে এলো।

তখন সবাই মিলে হল্লা করে নদীর পথে রওনা হ'ল। এমন সুখবরটি যে ওরা সকালবেলা পাবে—সে কথা ভাবতেই পারেনি !

সকলেরই কোঁচড় ভর্তি টস্‌টসে পাকা পেয়ারা। সেইগুলো চিবুতে চিবুতে দারুণ কোলাহলে ওরা যেন বিশ্ব জয় করতে এগিয়ে চললো।

ছেলের দলের উল্লাসের নমুনাই আলাদা। ওরা পেয়ারা যত না খাচ্ছে—তার বেশী ছড়িয়ে ফেলছে। কয়েকজন কিষাণ ভাই গরু নিয়ে ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিল—জমি চাষ করতে।

ওরা দল বেঁধে তাদের পথের মাঝখানে থামিয়ে দিলে। তারপর নিজের নিজের কোঁচড় থেকে পেয়ারাগুলি বের করে দিয়ে বললে, কিষাণ ভাইরা, এই পাকা পেয়ারাগুলো সঙ্গে নিয়ে যাও। লাঙল চালাতে চালাতে যখন খিদে পাবে—এইগুলো খেও।

কিষাণ ভাইরাও খুশী হয়ে পেয়ারাগুলো নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল।

তখন ক্ষুদে পড়ুয়ার দল গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে গাঁয়ের পথ ধরে এগিয়ে চলল।

আরো কিছু দূর চলে যাবার পর ছেলেদের চোখে পড়ল—গাছের উঁচু ডালে কয়েকটি পাখী বাসা বাঁধছে ! কোথা থেকে খড়-কুটো সব কুড়িয়ে এনেছে।

পাখীর দল আপন মনে চেঁচামেচি করছে আর বাসা বেঁধে চলেছে।

ছেলের দল পথের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে ওদের নিপুণ কাজ দেখতে লাগলো।

একটি ছেলে বললে, এই পাখীর বাসা ভাঙতে হবে। আর কয়েকটি ছেলে তার ওই কথায় আপত্তি তুলল।

বললে, ওরা আপন মনে কেমন সুন্দর কাজ করে চলেছে। সেগুলো ভেঙে ফেলবার কি দরকার শুনি ?

আর একদল ফোড়ন কেটে উত্তর দিলে, আরে বোকচন্দর, ভেঙে ফেলাতেই ত' মজা। দেখবি ওরা কেমন চেঁচামেচি করে ; আর একটি ছেলে বললে, ঠুকরে দিতেও ত' পারে ?

ইস্ ! অমনি ঠুকরে দিলেই হ'ল। আমাদের হাতে ছুরি থাকবে না?

দু'টি উৎসাহী ছেলে লাফিয়ে উঠল গাছে।

বেশীর ভাগ ছেলে দাঁড়িয়ে রইল নীচে, কি ঘটে মজা দেখবার জন্যে।

বেশ পুরোনো,—অনেক দিনের গাছ।

ছেলে দু'টো সবে ডাল বেয়ে খানিকটা উঠেছে এমন সময় গাছের কোটরের ভেতর ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনে সবাই চমকে গিয়ে মাথার ওপর দিকে তাকালো।

সেই আঁধার কোটরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে—একটি কালো সাপ।

ফণা তুলেছে উঁচু করে। এই বুঝি ছোবল মারে। একটি ছেলে ভয় পেয়ে গাছের ডাল ছেড়ে দিয়েছে।

অমনি ধপাস্ করে পড়ে গিয়েছে নীচে। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছেলেদের সোরগোল।

পা ভাঙল নাকি ছেলেটার ? চ্যাং দোলা করে তুলে ধরলে তাকে সবাই মিলে।

তিন

সেই কোন সকালে বেরিয়ে গেছে ছেলে—এখনো বাড়িতে ফেরবার নামটি নেই ! রান্নাঘরে মার মন টিকছে না ! কেবলি ঘর-বার করছেন মা !

ছেলে হেলেঞ্চা শাক খেতে ভালোবাসে। মা বিষণকে দিয়ে সে শাকের ব্যবস্থা করেছেন। ছেলে বেতের আগা দিয়ে তেতো ডাল পছন্দ করে। মায়ের সে দিকেও নজর আছে।

পটল পাঁতার বড়া কুশুর ভালো লাগে। কিন্তু কার জন্যে এ-সবের ব্যবস্থা করা ?

ছেলে ত' কখনো পাঠশালা থেকে ফিরতে এত দেরী করে না ?

মায়ের কত আশা এই ছেলে বড় হবে,—মানুষ হবে—দশজনের একজন হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে,—তবেই ত' মায়ের বুকে শান্তি ফিরে আসবে।

কিন্তু ছেলে যদি দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে মিশে মন্দ হয়ে যায়—তা হলে ত' ভস্মে ঘি ঢালা হবে।

মায়ের দু'চোখ জলে ভরে আসে। কিন্তু কি যে তাঁর বেদনা—কাউকে মুখ ফুটে বলা যায় না। মা বলতেও পারেন না, আবার সইতেও পারেন না, আপন মনে গুম্‌রে কেঁদে মরেন।

শেষকালে অনেক তেতেপুড়ে—যেন দুপুর বেলার গন্‌গনে রোদ সাঁতরে মুখ লাল করে ছেলে বাড়িতে ফিরে এলো।

মা একবার ছেলের মুখের দিকে তাকালেন, কিন্তু কিচ্ছু তাকে বললেন না।

কুশল বুঝতে পারলে মা ভারী চটে গেছেন। তাই এখন আর কোনো কথা নয়।

সোজা গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে মা। আগে আমায় খেতে দাও—

ছেলে জানে মায়ের কাছে ক্ষিদের কথা বললে, মায়ের সব রাগ জল হয়ে যাবে।

মা-ও কোনো কথা বললেন না, ছেলেকে খেতে বসিয়ে দিলেন। ছেলে তখন একটুখানি মনের জোর পেয়ে বললো, 'মা তুমি খেয়ে নাও, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

মা ছেলের মুখের দিকে একবার তাকালেন। কিন্তু কোনো কথা বললেন না। চুপচাপ নিজের কাজ সেরে নিলেন।

তারপর হেঁসেলে ঢুকে কোনো রকমে নিজের খাওয়া সেরে চলে এলেন।

কুশল মনে মনে ভাবছে, মা আজ খুব রেগে গেছে। তাঁকে আগে ঠাণ্ডা করতে হবে। অন্যান্য দিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর দিব্যি এক ঘুম লাগায়। কিন্তু আজ মায়ের মনকে নরম করতে হবে। তাই এদিক-ওদিক না তাকিয়ে খাতা খুলে বসল—অঙ্ক কষতে হবে।

ইতিমধ্যে মা হাত মুখ ধুয়ে মুখ-শুদ্ধি করে, নিজের খাটের ওপর গিয়ে বসলেন।

কুশল নিজের খাট থেকে তাকিয়ে সেটা দেখলে। তারপর বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে অঙ্ক কষতে শুরু করে দিলে।

খানিকটা সময় একেবারে চুপচাপ। তারপর মা ডাকলেন—খোকা, শুনে যা আমার কাছে।

কুশল ডাক শুনে চম্‌কে উঠল। মা যখন কুশু বলে ডাকেন—বোঝা যায় সেটা আদরের ডাক—। কিন্তু যখন খোকা বলে মা গম্ভীর গলায় আদেশের সুরে কিছু বলেন, ছেলে বোঝে সেটা শাসনের সুর।

কুশল তখন চুপচাপ খাতা-পত্র বন্ধ করে মায়ের খাটের কাছে হাজির হ'ল।

খোকা বুঝলে, মা তাকে সত্যি কিছু বলবেন, আর সে কথার ওপর কোনো আপিল চল্‌বে না।

মা ছেলের দিকে একবার তাকালেন। ছেলেও অপরাধীর মতো মায়ের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলে।

কুশল হঠাৎ মায়ের গা ঘেঁসে বসে পড়ে বললে, তুমি রাগ কোরো না মা। আজ পণ্ডিতমশায়ের জ্বর হয়েছে বলে পাঠশালা বসেনি। ভাবলাম, তখুনি বাড়িতে ফিরে আসবো। কিন্তু পাঠশালার একটি ছেলে পাখীর বাসা নিতে একটা গাছে উঠেছিল। সেখানে একটা সাপ ওকে তাড়া করে। ভয় পেয়ে ও গাছ থেকে পড়ে যায়। পা-টা বুঝি ভেঙেই গেছে ! তাই নিয়ে ত' এতক্ষণ ধরে সবাইকার হুজ্জুৎ চল্‌ছিল। ওদের বাড়িতে ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হ'ল। কবরেজমশাই এসে দেখে কি সব পায়ে বেঁধে দিয়ে গেছেন।

এক সঙ্গে অনেকগুলি কথা বলে কুশল হাঁফাতে লাগ্‌লো।

মা সব কথা শুনে বিরক্ত হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন—খোকা, আমি তোমায় বলেছি না, পাঠশালার পড়া শেষ হলে সোজা বাড়িতে চলে আস্‌বে। রাস্তায় রাস্তায় দুষ্টুমি করে ফিরবে না ?

কুশল মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে আবদারের ভঙ্গীতে বললে—আর কখনো দুষ্টুমী করবো না মা। তুমি আমায় কিচ্ছু বোলো না মা !

তারপর হঠাৎ নিজের গলার স্বরে একটা আহ্লাদে ভাব এনে বললে—মা, তোমার বেতাগের তেতো ডাল আজ এত স্বাদের হয়েছে যে কী বলব !

এইবার মা হেসে ফেললেন। বললেন—হুঁ ! ওই সব বলে আমায় ভোলাবার চেষ্টা ! কিন্তু আজ আমি কিছুতেই ভুলছি নে।

খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে চুপচাপ রইলেন মা।

তারপর বললেন—খোকা, তুই একটু একটু করে বড় হচ্ছিস—আমার চোখের সাম্‌নে। তুই নিজে বুঝতে পারিস নে। কিন্তু আমি রোজ ভোরে তোকে দেখি। অনেক রাত্তিরে যখন তুই ঘুমিয়ে থাকিস আমি মাটির প্রদীপ ধরে তোর মুখখানি দেখি—

খোকা, তুই কি মানুষ হয়ে তোর এই দুখিনী মায়ের দুঃখ দূর করতে পারবি নে ?

খোকা চেয়ে দেখল—মায়ের দু'টি চোখে জল টল টল করছে।

সে লজ্জা আর অনুশোচনায় মায়ের বুকে মুখ লুকোলো। তার গলার ভেতর দিয়ে কিসের একটা পিণ্ডি পাকিয়ে ওপরের দিকে ঠেলে আসতে চাইল।

কিন্তু সে মনে মনে ঠিক করল—কিছুতেই কাঁদবে না। মা ছেলের কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুলের মধ্যে হাত বোলাতে লাগলেন।

তারপর বললেন,—আমরা চিরকাল এমন গরীব ছিলাম নারে খোকা। তোর বাবা যখন বেঁচে ছিলেন—তখন আমাদের অনেক ধানী জমি ছিল ! কত পুকুর আর গোলাবাড়ী ছিল।

পাকা ধানে ভর্তি থাকত সেইসব গোলাঘর। সারা বছর ধরে চালান যেত ধান—নৌকো করে।

তারপর তুই এলি আমার কোলে। তখন আমাদের বাড়-বাড়ন্ত সংসার।

তোর বাবা ঠিক করলেন, পাকা দালান তৈরি হবে—ইট পোড়ানো হ'ল নদীর ধারে।

তোর বাবার কত আশা পাকা দোতলা দালান হবে। বাড়ির সামনে থাকবে ফুলের বাগান, আর পেছনে থাকবে ফলের বাগান।

দিন-রাত শুধু নক্সা তৈরি করতেন তোর বাবা। আমায় দেখাতে এলে বলতাম—ওসব আমি কি বুঝি ? তোমার খোকাকে দেখাও।

শুনে তোর বাবা হাসতেন। তখন তুই কতটুকু ! ঠিক যেন একটা পুতুলের মতো।

তোর বাবা তোকে কোলে তুলে নিয়ে নাচাতেন, আর কেবলি জিজ্ঞেস করতেন—তুই কোন ঘরটায় থাকবি রে খোকা ? সেই ঘরে তোর ভালো কাঁঠাল কাঠের টেবিল তৈরি করে দেবো। তুই পড়াশোনা করে একেবারে বিদ্বান হয়ে উঠবি। চাই কি জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে পড়বি।

কথা বলতে বলতে মা খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, সেই খোকা যদি দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে মিশে মন্দ হয়ে যায়—পড়াশোনা না করে, তাহলে আমি আর কি করতে পারি বল ? তোর বাবা ত' স্বর্গ থেকে সবই দেখছেন ! তুই কোথায় যাচ্ছিস—আর কার সঙ্গে মিশছিস—সব কিছু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন তিনি।'

খোকা মাকে জড়িয়ে ধরে বললে 'আর আমি কখনো দুষ্টু হবো না মা ! কখনো আর মন্দ কাজ করবো না। দেখো—কেমন মন দিয়ে আমি এখন থেকে পড়াশোনা করি।

কারো মুখে আর কোনো কথা নেই।

মা আর ছেলের চোখের জলের দুটি ধারা এক সঙ্গে মিশে গেল।

অনেকক্ষণ বাদে ছেলে মুখ তুলে তাকালো। মাকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা মা, বাবার কি অসুখ করেছিল ?

মার মুখখানি একেবারে বেদনায় মাখামাখি হয়ে গেল। কোনো দিন ত' ছেলের কাছে এসব দুঃখের কথা বলেন নি। তবু আজ বুকে বল এনে ছেলের কাছে সব কিছু বল্‌বেন ঠিক করলেন।

ধীরে ধীরে মা বলতে লাগলেন :

দিন রাত ছুটোছুটি আর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তোর বাবার শরীরটা ক'দিন থেকে

বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না। তারপর একদিন আবার দারুণ বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরে এলেন।

সেই দিন রাত থেকেই খুব জ্বর শুরু হয়ে গেল। কয়েকদিন গেল যমে-মানুষে টানাটানি।

আমি তখন একা মানুষ সংসারে। কোন্‌দিক যে সামলাবো—বুঝে উঠতে পারলাম না।

গাঁয়ের পুরোনো কব্‌রেজ মশাইকে খবর দেওয়া হ'ল।

তিনি ভালো করে পরীক্ষা করে নানা রকম বড়ি আর ওষুধের ব্যবস্থা করলেন।

এই বলে মা একটু নীরব রইলেন।

তারপর যেন চোখের সাম্‌নে কি একটা ঝাপ্‌সা ছবি দেখতে পাচ্ছেন—এইভাবে বলতে লাগলেন—

সে রাত্তিরের কথা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। সন্ধ্যে থেকে যেমন ঝড় যেমনি বৃষ্টি!

যত রাত বাড়ে তত ঝড়ের তাণ্ডব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সেই সঙ্গে তোর বাবার জ্বরের তাপও বাড়তে শুরু করে। কাউকে যে একটা খবর দেবো, সে উপায়ও নেই।

এই ঝড়ের দাপাদাপিতে কব্‌রেজ মশাই এসে আর দেখে যেতে পারেন নি।

আমি ওই রোগীকে নিয়ে তখন অকূল পাথারে পড়লাম।

একবার ভাবলাম, নিজেই ভিজতে ভিজতে গিয়ে কব্‌রেজ মশাইকে ডেকে নিয়ে আসি! আবার তখুনি মনে হ'ল—এই রোগীকে একা ফেলে আমি বাড়ি ছেড়ে কি করে যাবো? সেই সময়ে যদি একটা কিছু বিপদ ঘটে?

কি করি,—কোন্ দিকে যাই—আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। মনে হ'ল—পৃথিবীর শেষ দিন যেন ঘনিয়ে এসেছে।

এমন মুষলধারে বৃষ্টিও আর কখনো দেখি নি।

সেই একলা বাড়িতে—সেই জল-ঝড়ের রাত্রে নিতান্ত অসহায়ের মতো ভগবানকে ডেকে বললাম—'আমি আর কিচ্ছু চাইনে, তুমি এই মানুষটির প্রাণটিকে বাঁচিয়ে রাখো—'

তারপর আমি হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। সেই আচ্ছন্নভাব কেটে গেল বিষণের ডাকাডাকিতে—

ওই দারুণ ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে বিষণ ছুটে এসেছে আমার এই চরম বিপদে।

তখন মনে হ'ল ভগবান যেন আমার কথা শুনতে পেয়েছেন। তাই ঠিক দেবদূতের মতো বিষণকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আমাকে এই চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করতে।

বিষণ আমায় বললে, 'হঠাৎ আচম্‌কা ঘুমটা ভেঙে গেল। তারপর মনে হ'ল তোমাদের এই সাঙ্ঘাতিক বিপদের কথা। বাড়িতে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই সে-কথা ত' আমি জানি।'

একা একা তুমি মা কি করবে ? রোগী যদি তোমার কথা না শুনে বিছানা ছেড়ে উঠতে চায়—তা হলে তুমি খুবই মুস্কিলে পড়বে—তাকে সামাল দিতে।

ওদিকে মাথার ওপর কাল-ভৈরব যেন মরণের শিঙা বাজিয়ে চলেছে!

কিন্তু আর কিছু ভাববারও সময় ছিল না। যে কোনো সময় সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। তাই আমি ওই জল-ঝড় মাথায় নিয়ে মহাদেব আর নন্দী-ভৃঙ্গীর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার চোখের সামনে কত বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ল। জাত গোয়ালার ছেলে—বড় কঠিন প্রাণ। তাই কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে ছুটতে ছুটতে এসেছি—

মা বলছিলেন,—সেই কাল-রাত্তিরে বিষণ নিজের জীবনকে যেন বাজি রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল—

প্রথমে গেল—কব্‌রেজ মশায়ের বাড়ি।

কিন্তু তিনি বুড়ো অথর্ব মানুষ। তাঁর বাড়ির লোকেরা তাঁকে কিছুতেই ওই দুর্যোগের মধ্যে বেরোতে দিলে না। তিনি বিষণের হাতে মকরধ্বজ, কস্তুরী-ভৈরব আরো কি সব ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু বৃষ্টির তোড়ে সেই ওষুধ কোথায় ভেসে গেল।

বিষণ কিন্তু একটু দমে নি।

তারপর ছুটেছিল তোর জ্যাঠা-মশায়ের বাড়ি। কিন্তু তাঁরাও কেউ ওই জল-ঝড়ে বেরোতে পারলেন না।

শেষ রাত্তিরে তোর বাবার জীবন-দীপ যেন দম্‌কা হাওয়ায় নিবে গেল !

চার

এর পর কারো মুখে আর কোনো কথা নেই।

মা আর ছেলে যেন পাথরের মূর্তির মতো নীরব নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল।

অনেকক্ষণ বাদে কুশল মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, "মাগো, এমন করে আমার বাবার কথা ত' তুমি কখনো আমায় বলো নি !"

মা উত্তর দিলেন, " ভেবেছিলাম, তোকে আগে আমার মনোমত করে মানুষ করে তুলবো। তারপর তোর বাবার আশা-আকাঙ্খার কথা সব খুলে বলব। কিন্তু খোকা, তুই যদি দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে মিশে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাস—তা হলে কোন্ আশা নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো ?"

মায়ের চোখে জল—

খোকার চোখেও জল—!

কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারছে না !

খোকা মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে বললে, "আর আমার ভুল হবে না। আজ থেকেই আমি আমার পড়বার টেবিলটা ঠিক করে জানলার ধারে বসিয়ে নেবো। আমার বই-পত্তর, খাতা-পেন্সিল, সব গুছিয়ে নেবো। তুমি দেখে নিও মা, এখন থেকে আমি রোজকার পড়া রোজ করবো। কোনো দিন অঙ্ক কষতে ভুল হবে না।" খোকার কথা শুনে মায়ের মুখ-চোখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মা বললেন, "শোন খোকা, তুই খুব ভালো কথা বলেছিস। আমাদের কিছু নেই। আমরা গরীব মা আর ব্যাটা। সব আবার নতুন করে শুরু করবো। যা কিছু ক্ষুদ-কুঁড়ো আছে আমাদের, আবার নতুন করে গুছিয়ে নেবো।"

একটু থেমে মা বললেন, "ভালো কথা, আজই ত' লক্ষ্মীবার। আজ আমাদের আঁধার ঘরে লক্ষ্মীপূজো করে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নতুন জীবন শুরু করবো।"

খোকা জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা মা, লক্ষ্মীপূজো করবে, আর সেই সঙ্গে সরস্বতী পূজো করবে না?

মা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন, " তোর রোজকার পড়াশোনাই ত' সরস্বতী পূজো। জ্ঞান লাভই ত' সরস্বতীর আরাধনা। তাও শুরু হবে আজ থেকে।"

মা তার পুরোনো ট্রাঙ্ক বের করে সব মেঝেতে ঢেলে ফেলে ধুলো-বালি ঝেড়ে গুছিয়ে গুছিয়ে তুলতে লাগলেন।

মা মৃদু হেসে খোকার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জানিস খোকা, এটা আমার বিয়ের ট্রাঙ্ক। আমার বিয়ের পর আমার মা সব কিছু ট্রাঙ্কে গুছিয়ে দিয়েছিলেন।

খোকাও এগিয়ে গেল দেখবার জন্য "এই তোমার বিয়ের ট্রাঙ্ক—? দেখি কি কি আছে এর ভেতর।"

মা উত্তর দিলেন, "অনেক কিছুতে ঠাসা ছিল এই ট্রাঙ্ক। দু'টি মানুষ চাপা দিয়ে এটাকে বন্ধ করতে পারত না। আজ একেবারে খালি—শূন্য বাক্স ঢল ঢল করছে।"

মা এই ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে লক্ষ্মীর পট আর লক্ষ্মীর ঝাঁপি খুঁজে পেলেন।

মা বললেন, "জানিস খোকা, তোর বাবা যখন আমায় ছেড়ে চলে গেলেন—আমি লক্ষ্মী পূজো বন্ধ করে দিলাম। ভাবলাম, আমিই অলক্ষ্মী, আর এ বাড়িতে লক্ষ্মীপূজো করে কি হবে? কিন্তু আজ ভাবছি, তোর কল্যাণের জন্য আবার মা লক্ষ্মীর ঘট বসাতে হবে। লক্ষ্মীর পট আর লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন করতে হবে।"

—"মা এটা কার ফটো?"

কুশল বাক্সের একেবারে তলা থেকে একটি ছোট ফটো হাতে তুলে নিলে।

দেখেই মনে হ'ল অনেকদিনের তোলা ফটো। প্রায় আবছা হয়ে এসেছে। তবু মুখটিকে চেনা যায়।

মা কোনো কথা বলছেন না। কুশল আবার জিজ্ঞেস করলে, "কার এই ফটো তোমার ট্রাঙ্কে লুকিয়ে রেখেছ ? আমায় বলো না।"

মৃদু স্বরে মা উত্তর দিলেন, " তোর বাবার ফটো। " দেখি-দেখি—আমার বাবার ফটো ?" কুশল সচকিত হয়ে উঠল।

খানিকক্ষণ আগেও এই ফটোটির কোনো মূল্য ছিল না কুশলের কাছে। কিন্তু যে মুহূর্তে তার মায়ের মুখে শুনলে যে, ওটা তার বাবার ছবি, তক্ষুণি সমস্ত মন-প্রাণ উন্মুখ হয়ে উঠল—সেই ছবিটি ভালো করে দেখবার জন্যে।

একদৃষ্টে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কুশল সেই ফটোখানার দিকে।

ওর বন্ধু-বান্ধব, খেলার-সাথী যত আছে—সবাইকার বাবা আছে। কিন্তু কুশলের বাবা নেই।

সেই জন্যে ওর মনে একটা অজানা বেদনা জমাট বেঁধে আছে। দেখে চোখ আর ফেরাতে পারে না কুশল।

অনেককালের তোলা পুরানো ফটো—তবু মুখখানা দিব্যি বোঝা যায়।

কুশলের হঠাৎ মনে হ'ল—তার নিজের মুখটাও অনেকটা এই রকম দেখতে।

কুশল তার দুখিনী মায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা মা, তুমি বাবার ফটোটা সুন্দর করে বাঁধিয়ে কেন ঘরে টানিয়ে রাখো নি ? তা হলে ত' এমন আবছা হয়ে যেতো না।"

মা উত্তর দিলেন "কে আমায় বাঁধিয়ে দেবে ?" মা আর ছেলের বুকে কত কথা ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগলো—কেউ কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারে না !

কিছুক্ষণ বাদে বিষণ এসে উঠোনে ঢুকলো। বললে, 'মা-ব্যাটাতে চুপ-চাপ ঘরের ভেতর বসে থাকলেই হবে ? আজ আর রান্না-বাড়া কিছু হবে না ? আমি বাজারে যাচ্ছি—কি আনতে হবে বলো—"

মা এগিয়ে এসে বললেন, " শোন বিষণ, আজ লক্ষ্মীবার। আজ আর মাছ এনে দরকার নেই। খোকা আজ আমার হেঁসেলেই খাবে। লক্ষ্মীপূজোর জন্যে কিছু ফলমূল নিয়ে আসিস্। এই নে পয়সা—"

সারাদিন ধরে মা-আর ছেলেতে ঘরের সব জঞ্জাল সাফ করলে।

কুশল তার বাবার ফটো কোথায় লুকিয়ে রাখলে ওর মাকে আর দেখালে না।

ঘরের কোণে কোণে অনেক মাকড়শার জাল জমেছিল—মা সেগুলো ঝেঁটিয়ে বিদায় করলেন।

ঘরে লক্ষ্মীর পট আর লক্ষ্মীর ঝাঁপি বসাতে হবে। এখন কি আর ঘরে জঞ্জাল জমিয়ে রাখা চলে ?

মালকোঁচা মেরে খোকাও মায়ের সঙ্গে ছুটোছুটি করে কাজ করতে লাগল। ওর মনটা খুব খুশী খুশী হয়ে উঠল।

কুশলের পড়ার টেবিলের আশে-পাশেও অনেক জঞ্জাল জমেছিল। ছেঁড়া কাগজের টুকরো, ঘুড়ি তৈরির লাল-নীল কাগজ, কাঠি আর লেই। পুরোনো বছরের ক্যালেণ্ডার, আরো কি সব আছে বাজে জঞ্জাল। মাথার ওপর ঝুলও জমেছিল বিস্তর।

ঝাঁটা চালিয়ে কুশল সব সাফ করে ফেললে। তারপর নিজের পড়বার বইগুলি খুঁজে খুঁজে বের করল। শ্লেট আর পেন্সিল যে কোথায় গড়িয়ে পড়েছিল, নতুন করে তার সন্ধান করল কুশল।

ওর পড়ার টেবিলের ওপর মায়ের একটা পুরোনো খদ্দরের চাদর পেতে নিল। তারপর একধারে বই, অন্যদিকে শ্লেট-পেন্সিল, হাতের লেখার খাতা, অঙ্কের খাতা সব গুছিয়ে রাখল।

মা ইতিমধ্যে ঘরের জঞ্জাল সব সাফ করে ফেলেছেন। তারপর একটি মাটির হাঁড়িতে গোবর আর মাটি গুলে নিয়ে সারাটা ঘর সুন্দর করে নিকিয়ে ফেললেন মা।

মা ডেকে বললেন, "এখন আর ঘরের ভেতর আনাগোনা করিস নে কুশু।"

কুশল জিজ্ঞেস করলে, " কেন মা, যেতে বারণ করছ কেন ? আমিও না হয় তোমার সব কাজ হাতে-হাতে করে দিতাম !"

ওর কথা শুনে মা হেসে উঠলেন।

বললেন, "ওরে বোকা ছেলে সেজন্যে বারণ করি নি !"

—"তবে ?"

—"এখন ঘরটা নিকিয়ে ফেললাম ত'? এই সময় ঘরে ঢুকলে পায়ে পায়ে কাদার চাপড়া উঠে উঠে আসবে। তাই খানিকক্ষণ ঘরটাকে শুকোতে দিতে হবে। মেঝেটা না শুকোলে আলপনা দেবো কি করে?"

কুশলের মুখ-চোখ আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, "তুমি আজ আলপনা দেবে মা ?"

মা কুশলের হাসি-খুশী মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, "আজ নতুন করে লক্ষ্মীপূজো শুরু করেছি ত' ! লক্ষ্মীর পট বসাবো, লক্ষ্মীর ঝাঁপি বসাবো। তাই আজ আলপনা দিতে হয়। সেই জন্যেই ত' ঘরের মেঝেটা গোবর জল দিয়ে ভালো করে নিকিয়ে নিলাম।"

সব দেখে আর মায়ের মুখের কথা শুনে কুশলের বেশ ভালো লাগছে।

তাই সে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা মা, তুমি আলপনা দিতে পারো ? কার কাছে শিখলে শুনি ?"

মা খোকার কথা শুনে এত দুঃখেও হি-হি করে হেসে উঠলেন।

বললেন, "বোকা ছেলে। আমিও ত' একদিন ছোট্ট মেয়ে ছিলাম। জানিস খোকা, আমার মা খুব ভালো আলপনা দিতে পারতেন। কি সুন্দর কাঁথা সেলাই করতে পারতেন। আমি আমার ছেলেবেলায় তাঁর কাছেই সব শিখেছিলুম।"

কুশল বললে, "তুমি ভারী মজার কথা বলেছ মা ! তুমি তখন ছোট্ট মেয়ে, ডুরে শাড়ী পরে মায়ের সঙ্গে ঘুরঘুর করে ঘুরছ, ছোট্ট হাতে আলপনা দিচ্ছ এমনি একটি ছবি যদি থাকতো, তা হলে খুব মজা হত। আমি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দিতাম। আমার সব খেলার সাথীদের দেখাতাম।"

মায়েরও কেমন খুশী খুশী ভাব।

ছোট্ট মেয়ের মতো কলকলিয়ে উঠলেন যেন মা।

বললেন, "তোর কি বুদ্ধি খোকা ! আমাদের ছেলেবেলায় ফটো তোলার রেওয়াজ ছিল নাকি ? আর মায়ের ছেলেবেলাকার ফটো এতদিন থাকত নাকি ?"

মা মুখে কথা বলছেন, আর হাতে-হাতে সব কাজ সেরে নিচ্ছেন।

তারপর মা এক সময় বললেন, "খোকা, আজ তুই দুপুর বেলা এতটুকু ঘুমুতে পারিস নি। যা, এই বেলা একটু গড়িয়ে নে। বিকেলের দিকে আবার অনেক কাজ।"

খোকা মায়ের গা ঘেঁসে বসে বললে, "আজ আর ঘুম পাচ্ছে না মা। আজ তোমার কাছে কাছেই থাকি।"

মা খুশি হয়ে বললেন, "সেই ভালো। অবেলায় ঘুমিয়ে কাজ নেই।"

এমন সময় বাড়ির দোরগোড়ায় বিষণের গলা শোনা গেল।

—"এই ধরো মা, লক্ষ্মীপূজোর সব ফল নিয়ে এসেছি। শশা, কলা, শাঁকআলু, পেঁপে, তা ছাড়া বাতাসা, গুড়, ধূপকাঠি, যা যা হাতের কাছে পেয়েছি সব নিয়ে এসেছি।"

মা দাওয়ায় বেরিয়ে এসে বললেন, "বেশ করেছ বিষণ। তুমি যে গুছিয়ে সব কিছু আনবে তা আমি আগেই জানতাম।"

বিষণ পোট্‌লা বাঁধা সব সওদা দাওয়ার ওপর রেখে বলে, "আর কি করতে হবে মা, চট্‌পট বলে ফেল। আমাকে আবার এক্ষুণি ঘরে ফিরতে হবে। গাইগুলোকে মাঠ থেকে ফিরিয়ে আনা হয় নি।"

মা বললেন, "দু'টো ঝুনো নারকেল বের করে ছুলে দিতে হবে যে বিষণ।"

বিষণ উত্তর দিলে, "ও আমি এক্ষুণি করে দিয়ে যাচ্ছি। দা-খানা কোথায় আছে তুমি আগে আমায় বের করে দাও।"

মা ঘরের ভেতর থেকে দা-খানা বের করে দিলেন নারকেল দু'টি ছুলে ফেলবার জন্যে।

মা যে কখন চাল ভিজিয়ে রেখেছিলেন খোকা জানতেই পারে নি।

সেই চাল বেটে নিয়ে একটুখানি জল মিশিয়ে সুন্দর আলপনা দিতে শুরু করেছেন মা।

মেঝেটা শুকিয়ে ঝক্ ঝক্ করছে। আর তার ওপর মায়ের দেওয়া আলপনা দেখে খোকার দুই চোখ জুড়িয়ে গেল।

মায়ের দু'টি হাত এক জায়গায় থেমে নেই।

পূজোর ফলগুলি কেটে সুন্দর করে সাজানো হ'ল—ছোট ছোট থালায়।

লক্ষ্মীর পট বসেছে, তারই পাশে লক্ষ্মীর ঝাঁপি। মাটির প্রদীপ জ্বলে উঠল ঘরের কোণে। ধূপকাঠির গন্ধে বাতাস সুরভিত হয়ে উঠল।

মা একটা আসন বিছিয়ে নিয়ে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তে শুরু করে দিলেন।

খোকাকে বললেন, "তুই এইখানে বসে শোন।" খোকাও চোখ দু'টি বন্ধ করে মনে মনে কল্পনা করলে—আজ থেকে মা এখানে করবেন লক্ষ্মীপূজো, আর খোকা পড়ার টেবিলে বসে মা সরস্বতীকে আহ্বান জানাবে।

পাঁচ

পরদিন সকালবেলা পাঠশালায় যেতে আবার রাস্তার মোড়ে ছেলেদের সেই জটলা।

একজন বললে, "পণ্ডিতমশায়ের ত' অসুখ করেছে, একদিনেই কি আর ভালো হয়ে গেছেন ?"

আর একজন সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনি কাটলে, ঠিক কথা বলেছিস। আজও পণ্ডিতমশাই পাঠশালায় পড়াতে আসবেন না।

পরামর্শ দেবার ছেলের অভাব নেই দলে। সে সোজা এগিয়ে এসে বললে, তাহলে আর পাঠশালায় গিয়ে কি হবে ? চল, সোজা একটা নিরিবিলি বাগানে ঢুকে পড়ি। পেয়ারা, কলা, পাকা পেঁপে যা জোটে—

ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন এই লোভনীয় প্রস্তাব শুনে নেচে উঠল !

এমন মজা পেলে কে আর পাঠশালায় পড়তে যায় ? কিন্তু বাড়িতে মারের ভয় আছে—এমন ছেলেরও ত' অভাব নেই দলে।

তারা বেঁকে দাঁড়ালো।

ওরা বললে, আগে পাঠশালায় গিয়ে দেখবো—পণ্ডিতমশাই এসেছেন কিনা, তারপর অন্য কথা—

কুশলও সেই মতে মত দিলে।

সে বললে, হ্যাঁ, ঠিক কথা। সকালবেলা আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি পাঠশালায় গিয়ে পড়াশোনা করবো বলে। এখন বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়ালে চলবে কেন ?

তখন ছেলে মহলে দু'টো দল হয়ে গেল।

একদল বাগানের ফল-ফলারির লোভে অন্যদিকে এগিয়ে গেল। আর একদল ইস্কুলের পথে চলে গেল।

পাঠশালায় পৌঁছে দেখা গেল, ছেলেদের আশঙ্কাই সত্যি। পণ্ডিতমশাই আজও পড়াতে আসেন নি।

তখন যারা দলভ্রষ্ট হয়ে পাঠশালায় এসে ঢুকেছিল—তারা আবার দ্বিগুণ উদ্যমে হারা উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে পড়ল।

কয়েকটি ছেলে এ সময় ঠিক কি করবে—বুঝে উঠতে পারছিল না।

যাদের বাড়িতে মা-বাবা খুব কড়া, তারা সোজাসুজি বাড়ি ফিরে যাবার পক্ষে। অকারণ পথে পথে ঘুরে বাড়ি গিয়ে বকুনি খাবার ইচ্ছে তাদের আদৌ নেই।

কুশল মনে মনে ভাবছিল,—পণ্ডিতমশাই যখন আসেন নি, তখন মায়ের কাছেই ফিরে যাই,—তার কাছে বসে বাবার গল্প শুনি।

আর কয়েকটি ছেলে—অন্য একটি উদ্দেশ্য নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ করে কি সব পরামর্শ করছিল।

কুশলকে ডেকে ওরা বললে, চল, তোদের পুকুরে গিয়ে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা যাক। যে সব মাছ ধরা পড়বে—সবাই মিলে ভাগ করে নেবো—। না হয় তোর ভাগে কিছু বেশীই পড়বে।

কুশল আপত্তি করে বললে, না না, আমার মা রাজি হবেন না। মিছিমিছি তোরা কেন যাবি আমাদের পুকুরে ?

ছেলের দল নাছোড়বান্দা।

তারা বললে, চল না তোর মার কাছে। বেশী ছেলে সঙ্গে নেবে হলে ? চারজন আছি। তোর মাকে রাজি করার ভার আমাদের।

কুশল আর বেশী আপত্তি করতে পারল না।

তখন এই ছোট্ট দল মহা উৎসাহে কুশলের মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল।

দলের ভেতর যে চটপটে সে এগিয়ে গিয়ে বললে, মাসিমা, আজ আমরা আপনার পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরবো। আমাদের কিন্তু অনুমতি দিতে হবে।

কুশলের মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি কথা ? তোমরা সকাল বেলায় গেলে পড়াশোনা করতে। এখন বলছ, পুকুরে মাছ ধরবে ?

ছেলেটি এতটুকু লজ্জা পেল না। চট্‌পট্ উত্তর দিলে, আমরা ত' পাঠশালাতে

পড়তেই গিয়েছিলাম। কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের অসুখ আজও সারেনি। তাই পাঠশালা বসবে না। আর একটি ছেলে বললে, এই খবর পেয়েই একদল ছেলে গেল বাগানে-বাগানে ফল-ফলারি খেতে, আর আমরা চারজন এলাম পুকুরে মাছ ধরতে।

মা এইবার হেসে ফেললেন

বললেন, তাই তোমরা ঠিক করেছ—

লিখিব পড়িব মরিব দুখে
মৎস্য মারিব খাইব সুখে।

এইবার বোধ করি ছেলেটি লজ্জা পেল। সে মাথা চুলকে জবাব দিলে, না-না, তা কেন, পড়ার সময় আমরা ঠিক পড়ব। তবে মাছ ধরাটাও ত' একটা খেলা। আজ না হয় আপনার পুকুরে সেই খেলাই খেলি—

মা হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, আমি তোমাদের মাছ ধরতে অনুমতি দিতে পারি, কিন্তু তোমাদের একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করলে, কি প্রতিজ্ঞা? ও, বুঝতে পেরেছি। যে মাছ ধরা পড়বে তার অর্ধেক বুঝি কুশলের জন্য দিয়ে যেতে হবে?

মা তেমনি হেসে উঠলেন ওর কথা শুনে। বললেন, দূর বোকা ছেলে, তা নয়। তোমাদের আজ প্রতিজ্ঞা করতে হবে— পরের বাগানে ঢুকে আর কখনো ফল-ফলারি চুরি করতে পারবে না।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, না-না মাসিমা, আমাদের এই ফল পাড়া ঠিক চুরি করা নয়। আমরা ত' দিনের বেলা সকলের চোখের সামনেই ফল পেড়ে খাই। ওটাকে কি ঠিক চুরি করা বলে?

মা জোর দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই বলে। যার বাগান—তার কাছ থেকে ত' তোমরা অনুমতি নাও না। না বলে অপরের জিনিস নেওয়া মানেই চুরি করা। বুঝলে ত'? আজ আমার কাছে যেমন অনুমতি চাইলে তেমনি যদি অনুমতি চাও—সে
পাঠ
...া কথা।
পরামর্শ
উত্তর দিলে, আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি মাসিমা। আমরা সেই
তাহলে আর পাঠ-
প্রতিজ্ঞাই করলাম।

মা খুশী হয়ে বললেন, আচ্ছা যাও, তোমরা পুকুরে মাছ ধরো গে। কিন্তু শুধু হাতেই তোমরা মাছ ধরবে নাকি?

ছেলেরা খুশী হয়ে উত্তর দিলে, না-না, তা কেন? আপনার অনুমতি পেলাম। এইবার আমরা বাড়িতে বই শ্লেট রেখে ছিপ নিয়ে আসবো।

সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ছুট্ লাগালো যে যার বাড়ির দিকে—

মা পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন, সবাই বাড়িতে বলে এসো কিন্তু। নইলে মা-বাবা আবার ব্যস্ত হয়ে থাকবেন।

ছেলেরা হাত নাড়তে নাড়তে চলে গেল। মুখে কথা বলবার সময় তাদের নেই—তারা এত খুশী হয়েছে।

এইবার মা কুশলের মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন, ছেলের মুখেও মৃদু হাসি!

কুশল এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম মা, তুমি অনুমতি দেবে না!

মা আগের মতোই হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, তা' কেন? ওরা বড় মুখ করে মাসিমা বলে আমার কাছে এসেছে, আমি কি অনুমতি না দিয়ে পারি?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আজ অনুমতি না দিলে কাল ওরা চুরি করত! সেটা কি ভালো হ'ত?

ছেলেদের উৎসাহের অন্ত নেই।

খানিকক্ষণ বাদেই ওরা ছিপ-টিপ নিয়ে এসে হাজির। পুকুরের একটা নিরিবিলি কোণ দেখে ওরা বসে পড়ল।

ছেলেরা বললে, আয় কুশল, তোর জন্যেও একটা সুন্দর ছিপ নিয়ে এসেছি। আমাদের সঙ্গে বসে যা—

কুশলের ত' ছিপ দিয়ে মাছ ধরবার অভ্যাস নেই। তাই বন্ধুদের কথায় গাঁইগুঁই করতে লাগলো।

কিন্তু বন্ধুর দল ওকে সহজে ছাড়বে কেন? বললে, সেটি হচ্ছে না। আজ সবাই মিলে মজা করে মাছ ধরবো। তা ছাড়া মাসিমার অনুমতি যখন পাওয়া গেছে—তখন আর ভয়টা কি শুনি?

কুশল কুণ্ঠিত হয়ে উত্তর দিলে, কিন্তু আমি যে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে শিখি নি!

বিষণ ততক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল।

সে এগিয়ে এসে বললে, তুমি ভাবছ কেন খোকাবাবু? আমি তোমায় ছিপ দিয়ে মাছ ধরা শিখিয়ে দিচ্ছি—

কুশল কৌতুক করে উত্তর দিলে, তাহলে তুমি আমার গুরুমশাই হলে?

বিষণও তেমনি মজার মানুষ। বললে, ঠিক! ঠিক! আমি হচ্ছি মাছ মারার গুরুমশাই—

তারপর বিষণ পুকুরের ধারে গিয়ে ঘাসের ওপর আরাম করে বসে খোকাকে মাছ ধরার কলা-কৌশল সব শিখিয়ে দিলে।

—ঠিক এমনি করে ছিপটাকে বাগিয়ে ধরবে। তারপর বঁড়শীতে টোপ গেঁথে নেবে—

কুশলের একটুতেই অধৈর্য্য।

শুধালো, কি টোপ গাঁথবো তাই বলো না।

বিষণ ছেলেমানুষের কাণ্ড দেখে হাসতে লাগলো। বললে, আমি মাটি খুঁড়ে এক্ষুণি কেঁচো তুলে আনছি। সেই কেঁচো বঁড়শীতে গেঁথে নিলেই দিব্যি টোপ হবে।

কেঁচোর কথা শুনে কুশলের গা ঘিন্-ঘিন্ করতে লাগলো। বললে, অ্যাঁ। ছিঃ ছিঃ ! ওই কেঁচোগুলোর গায়ে হাত দিতে হবে?

বিষণ খোকার কথা শুনে হাসতে লাগলো। বললে, এত ঘেন্না-পিত্তি থাকলে মাছ ধরা যায় না। এখন আমি যা বলছি শোন,—মাছ ধরতে গেলে সক্কলের আগে ধৈর্য্য চাই। ঘন্টার পর ঘন্টা চুপচাপ ফাৎনার দিকে চেয়ে বসে থাকতে হবে। তবে তোমার যদি বরাৎ ভালো থাকে তাহলে—চট করে বঁড়শীতে মাছ ধরতে পারে। সবাইকার বরাৎ ত' এক রকম নয়। কেউ ছিপ ফেললেই মাছ ওঠে, আবার সারাদিন ঠায় বসে থাকলেও কারো কপালে কিছু জোটে না। আজ তোমার বরাৎ দেখা যাবে।

ইতিমধ্যে ছেলের দল বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। বিষণ বললে, দেখ দাদাবাবুরা সবাই মিলে এক জায়গায় জড় হয়ে বসো না। পুকুরের চারদিকে ছড়িয়ে বসো, তাহলেই মাছ এসে বঁড়শীতে ঠোক্কর দেবে।

বিষণ খোকাকেও সব ভালো করে বুঝিয়ে দিতে লাগল।

বিষণ বললে, শোনো খোকা,—নানারকম মাছ এসে বঁড়শীতে ঠোক্কর মারবে। দেখে দেখে বুঝে নিতে হবে—কোন্টা আসল ঠোক্কর। ফাৎনার দিকে সব সময় নজর রাখতে হবে। তারপর সুযোগ বুঝে ছিপে টান মারতে হবে! যদি বঁড়শীতে আট্‌কাতে পারো তবেই বুঝবো বাহাদুর।

মাথা চুলকে কুশল বললে, আচ্ছা বিষণখুড়ো, তুমি একটা মাছ ধরে আমায় দেখিয়ে দাও,—তারপর দেখনা আমি ছিপে কত মাছ আট্‌কে ফেলছি—

বিষণ হো-হো করে হেসে উঠল!

—ওরে দুষ্টু ছেলে, তোমার চালাকি আমি বুঝতে পেরেছি। পরের হাত দিয়ে মাছ মেরে নিজে বাহাদুরী নিতে চাও ? সেটি হতে দিচ্ছি না। তোমার নিজের হাতে মাছ ধরতে হবে।

বিষণখুড়ো খোকাকে আবার সব ভালো করে হাত ধরে বুঝিয়ে দিলে।

মাটি খুঁড়ে অনেকগুলো কেঁচো বের করে একটি মাটির খুরিতে রেখে দিলে।

তারপর বললে, এইবার এই ঘাটের কিনারায় ঘাসের ওপর বোসো। ছিপটাকে এইভাবে বাগিয়ে ধরো। বঁড়শীতে কেঁচো আমি গেঁথে দিয়েছি—

খোকাকে বসিয়ে দিয়ে বিষণ চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

ছেলেরাও তৎপর হয়ে চার কোণে নিরিবিলি জায়গা দেখে বসে পড়েছে।

মাছ ধরার একটা দারুণ নেশা আছে। ওদেরকে আজ সেই নেশায় পেয়ে বসেছে।

বিষণ তখন বাড়ির ভেতর একবার চলে গেল।

মা বললেন, শোনো বিষণ, ছেলেরা যখন মাছ ধরতে এসেছে — তখন ওদের মাঝে মাঝে খাবার দিতে হবে। নইলে ছেলেমানুষ ত' ওরা — অনেকক্ষণ ধরে মন লাগিয়ে বসে থাকতে পারবে কেন?

মাথা নেড়ে বিষণ বললে, সে ত' সত্যি কথাই। আমাদের এতখানি বয়েস হয়ে গেছে, এখনো মাছ ধরতে বসলে ঘড়ি-ঘড়ি ক্ষিদে পায়। ক্ষুদে মানুষদের ক্ষিদে আরো বেশী।

মা উত্তর দিলেন, ঘরে মুড়ি আছে, খৈ আছে, আর গুড়ও আছে হাঁড়িতে। আমি ওদের জন্যে মোয়া তৈরী করে দি। আর আমাদের শশার মাচায় শশা ফলেছে। বিষণ, তুমি বরং কয়েকটা কচি শশা কেটে দাও—

বিষণ খুশী হয়ে উত্তর দিলে, সেই ভালো মাঠান সেই ভালো। তুমি মোয়া তৈরী করতে থাকো, — আমি এই ফাঁকে বাড়ি থেকে আর একবার ঘুরে আসি—

ছয়

পাড়া-গাঁয়ের নিশুতি রাত। সারাটা অঞ্চল যেন অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে।

কোথায়ও এতটুকু সাড়া-শব্দ নেই।

মাঝে মাঝে বাদুড়ের ডানা ঝট্‌পটানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনেক পরে পরে দু-একটি নিশাচর পাখীর ডাক কানে ভেসে আসছে।

কুশলও নিজের খাটে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

মায়ের ঘুম খুব পাতলা।

কিন্তু মা আজ রাতে স্বপ্ন দেখছেন। দুঃস্বপ্ন দেখে মায়ের পাতলা দেহটা মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে।

মা স্বপ্ন দেখছেন, একটা কালো মেঘ সারা আকাশটা ছেয়ে ফেলেছে। কোথা থেকে একটা অশুভ বাতাস ছুটে আসছে তাদের কুটিরের দিকে। এখুনি বুঝি ঘরটাকে ভেঙে ফেলে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

মা প্রাণপণে তাঁর খোকাকে বুকে চেপে ধরেছেন। কিন্তু কিছুতেই তাকে ধরে রাখতে পারছেন না। এলোমেলো বাতাসের মাতামাতি এত বেড়ে উঠেছে যে ঘরের সব কিছু জিনিস-পত্র খড়কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছে এদিক-ওদিক।

অন্ধকারে কিছুই ভাল করে চোখে পড়ে না। মনে হচ্ছে আর বুঝি কখনো আলো জ্বলবে না।

এই বিপদ থেকে কি করে রক্ষা পাবেন মা? ছেলেকেই বা কি করে বাঁচাবেন?

সেই গাঢ়, মিশকালো আঁধারের ভেতর ফুটে উঠল দুটি জ্বলন্ত চোখ। সেই আগুনের হল্‌কা বয়ে নিয়ে আসা চোখ দুটি ক্রমশঃ বড় হচ্ছে।

সেই চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে মা শিউরে উঠলেন। অন্ধকারের মধ্যে কার ওই চোখ দুটি তাকে ভয় দেখাচ্ছে? চোখ দু'টি কি তাদের গ্রাস করতে চায়?

অবশেষে মা বুঝতে পারলেন, অশুভ এক কালো বেড়াল তাদের বাড়িটিকে যেন গ্রাস করতে চাইছে।

ওই জ্বলন্ত চোখ দু'টি সেই কালো বেড়ালের। নিমেষের মধ্যে সেই কালো বেড়াল কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

মা হঠাৎ তাকিয়ে দেখলেন, কোথায় ঝড়—কোথায় বৃষ্টি? ওদের বাড়িতে যেন আগুন লেগেছে।

দাউ দাউ করে বাঁশের বেড়াগুলো যেন জ্বলছে। আরো অবাক কান্ড পুকুরের জলও যেন আগুনে জ্বলছে। মাছগুলো প্রাণের দায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ডাঙ্গায় এসে পড়ছে। কিন্তু সেখানেও কি নিস্তার আছে? আগুন ক্ষ্যাপা মোষের মতো তাদের তাড়া করছে।

ওদের গোয়ালঘরেও আগুন জ্বলে উঠল। গাভীরা হাম্বা হাম্বা রবে আর্তনাদ করতে লাগলো। হাঁসের দল পুকুরে যেতে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো। কোন্ দিকে যাবে? পুকুরের জলেও আগুন লেগেছে। কেরোসিন তেলে আগুন লাগলে যে অবস্থা হয় অবিকল সেই দৃশ্য।

পায়রাগুলো আকাশের বুকে উড়তে গিয়ে ঝলসে গেল। আশে-পাশে আম-জাম-কাঁঠাল নারকেল গাছগুলি দাউ দাউ করে জ্বলছে। দূরে ঐ গাছের ন্যাড়া ডালে বসে আছে ও-সব কি! কাক নাকি?

মায়ের মুখে আর কোনো শব্দ নেই। খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা আতঙ্কে যেন পাথর হয়ে গেলেন।

কতক্ষণ ওইভাবে তিনি বসে ছিলেন—তার আদৌ খেয়াল নেই।

হঠাৎ মা সভয়ে তাকিয়ে দেখেন—একদল শকুনি তার উঠোনের মাঝখানে উড়ে এসে বসেছে।

অমঙ্গলের অগ্রদূত শকুনিগুলি কিন্তু এই লেলিহান-অগ্নিদাহে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে না।

শকুনিগুলির কোন্ দিকে নজর মা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

কতকগুলি কাল-প্যাঁচা কি এধার-ওধারে উড়ে উড়ে বিশ্রী সুরে ডাকছে?

গাইগুলি কেবলি হামলাচ্ছে কিন্তু ধোঁয়ার জন্যে তাদের চোখে দেখা যাচ্ছে না।

মা বার বার প্রদীপ জ্বালবার জন্যে চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোথা থেকে দম্‌কা হাওয়া এসে সেই প্রদীপ নিবিয়ে দিচ্ছে।

খোকা কি তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে? মা কি করবেন, কোন দিকে যাবেন—কিছুই বুঝতে পারছেন না।

কোথা থেকে এই অমঙ্গলের আগুন ছড়িয়ে পড়ল—তাদের বাড়ির চারদিকে এটা সত্যি বিস্ময়ের ব্যাপার।

ওদের খাটেও সেই লেলিহান অগ্নিশিখা এসে তার থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে।

আর বুঝি বাঁচবার কোনো উপায় নেই। এইবার মা-ছেলে দুইজনকেই এক সঙ্গে পুড়ে মরতে হবে।

খোকার একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল। হঠাৎ ছেলেকে জড়িয়ে ধরে মা পাগলের মতো ছুটতে সুরু করে দিলেন। কোথায় যাচ্ছেন—কোন দিকে পা বাড়াচ্ছেন সে ব্যাপারে এতটুকু খেয়াল নেই।

তারপর মা বিহ্বলের মতো খাট থেকে মেঝেতে পড়ে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দুঃস্বপ্ন ভেঙে গেল। থর্‌থর্ করে মায়ের সারা দেহটা যেন কাঁপছে। দুই হাত দিয়ে মা তার বুক চেপে ধরলেন। তবু সেই কাঁপুনি থামে না।

এইভাবে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। তারপর খাটের পায়া ধরে মা উঠে বসলেন।

কোথায় আগুন, কোথায় কি? আগাগোড়াই তিনি দুঃস্বপ্ন দেখছিলেন।

খোকা নিশ্চিন্ত মনে বিছানার ওপর অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

কিন্তু মায়ের মনে দারুণ দুশ্চিন্তা।

তিনি এই দুঃস্বপ্ন দেখলেন কেন? নিশ্চয়ই খোকার কোনো অমঙ্গল হবে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, ভোর হবার আর বেশী বাকি নেই।

আশে-পাশে আবছা-আঁধারে এখুনি ঊষার আলো ছড়িয়ে পড়বে। চারদিকে গাছগুলির শাখায় শাখায় ভোরের পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে।

মা দুর্গা-দুর্গা বলে প্রণাম জানালেন, তারপর কাপড় আর গামছা নিয়ে দ্রুতবেগে দরজা খুলে বেরিয়ে—স্নানের উদ্দেশ্যে পুকুর ঘাটের দিকে চলে গেলেন।

মায়ের প্রাতঃস্নান শেষ হবার কিছু পরেই বিষণ এসে হাজির।

খোকা তখনো ঘুম থেকে ওঠে নি।

বিষণ ওকে বিছানা থেকে তুলতে যাচ্ছিল।

মা ওকে বাধা দিয়ে বললেন—থাক্, ও ঘুমুচ্ছে ঘুমুক। আমি তোমার সঙ্গে দরকারী কথাগুলো সেরে নি।

বিষণ শুধোলে, আমার সঙ্গে আবার কি দরকারী কথা শুনি? হাটে যেতে হবে বুঝি?

মা জবাব দিলেন, হাটে ত' যেতে হবেই। তার আগে আমাকে কয়েকটি জিনিস

তাড়াতাড়ি এনে দিতে হবে বিষণ। শোনো, তুমি খোকাকে আবার যেন কিছু বলো না। আমি আজ সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত করবো—

বিষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, সে আবার কি ? মা বললেন, শোনো বিষণ, কাল সারারাত বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি। মনে হচ্ছে, আমার খোকার কিছু অমঙ্গল হবে। তাই আগে থেকেই সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত করবো। অমঙ্গল সব কেটে যাবে।

বিষণ বললে, তাই নাকি ? তুমি এতও জানো বৌঠান। সঙ্কট-নারায়ণের ব্রতের কথা ত' আগে শুনি নি।

ম্লান হেসে মা উত্তর দিলেন, আমরা যখন খুব ছোট—সেই সময় আমার ঠাকুমা এই সঙ্কট-নারায়ণ ব্রত করতেন। একটু বড় হতে আমি সেই ব্রতের সব নিয়ম শিখে নিয়েছিলাম। জীবনে সঙ্কট ঘনিয়ে এলে এই ব্রত করতে হয়। তাহলে সব অমঙ্গল দূর হয়ে যায়।

বিষণ শুধোলে, তাহলে কি কি আনতে হবে আমায় চট্‌পট বলে দাও। আমি এক ছুটে গিয়ে নিয়ে আসি—

মা বললেন, আমি একটু আগেই একটা ফর্দ্দ লিখে রেখেছি। বিষণ, তুমি একটু কষ্ট করে আগে এনে দাও।

বিষণ উত্তর দিলে, তোমার কাজে আমার কষ্ট কি ? আমি যাবো আর আসবো। এর ভিতর তুমি ব্রতের সব জোগাড়-যন্ত্র করে নাও।

মা বিষণের হাতে একটি ফর্দ্দ আর টাকা এনে দিলেন। আর বিষণ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেল।

এতক্ষণে কুশলের ঘুম ভাঙল। সে চোখ কচ্‌লে বিছানার ওপর উঠে বসল।

সে মাকে মেঝের ওপর কি জোগাড়-যন্ত্র করতে দেখে শুধোলো, এত বেলা হ'ল আমায় ডাকো নি কেন মা ? আর মেঝের ওপর এ-সব কি কাণ্ড করছ তুমি ?

মা শুধু একবার ছেলের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর মনে-মনে ভাবলেন, খোকার কাছে আসল কথাটা লুকিয়ে রাখা ঠিক হবে না। সোজাসুজি বলে ফেলাই ভালো। তাই তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, দেখ খোকা, আমি আজ সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত করবো। আমার মানত ছিল। পরে তোমায় সব খুলে বলব।

খোকাও আবদার করে উত্তর দিলে, আমিও তাহলে আজ সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত করবো—

মা খোকার চোখের দিকে তাকালেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন,—খোকা তুই ইস্কুলে যাবি নে ? মিছিমিছি ইস্কুল কামাই করা কাজের কথা নয়।

খোকা খিল্-খিল্ করে হেসে উঠল। হাততালি দিয়ে বললে, হুঁ। হুঁ। কেমন

ঠকিয়ে দিয়েছি তোমায় ! আজ আমাদের পাঠশালা নেই। তাই আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত করবো—

মা বললেন, শোন খোকা, ছেলেদের এ ব্রত করতে নেই। মায়েদের এ ব্রত করতে হয়। আমি পরে তোকে সব বুঝিয়ে বলব।

ইতিমধ্যে বিষণ ব্রতের সব সওদা নিয়ে এসে হাজির হ'ল।

মা বললেন, খোকা যাও, পুকুর ঘাটে গিয়ে মুখ-টুখ ধুয়ে এসো। আমি তোমার খাবার ধামা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। তাই খেয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ পড়াশোনা করো—

খোকা নাচতে নাচতে পুকুর ঘাটের দিকে চলে গেল। সেখানে ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাঁত্ মেজে, ভালো করে পুকুরের জলে মুখ ধুয়ে ওপরে উঠে এলো।

মা বললেন, বারান্দায় গামছা রয়েছে দড়িতে ঝোলানো,—আগে ভালো করে হাত-মুখ মুছে নাও। ধামার নীচে চিঁড়ের মোয়া আর নারকেল-কোরা রেখেছি। খেয়ে নিয়ে পড়তে বসো—

খোকা খেতে খেতে মায়ের ব্রতের নিয়ম পালন করা দেখছিল।

খোকা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে, মা সব কাজ হাঁটুর তলা দিয়ে হাত গলিয়ে দিয়ে কষ্ট করে করছে।

তাই খোকা শুধোলে, আচ্ছা মা, তুমি হাঁটুর তলা দিয়ে হাত গলিয়ে এমনভাবে কষ্ট করে কাজ করছ কেন ? সোজাসুজি সব কাজ করলে হবে না ?

মা মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, নারে বোকা ছেলে—সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত এইভাবে সঙ্কটের ভেতর দিয়েই সম্পন্ন করতে হয়।

মা সারাদিন ধরে এই নিয়ম পালন করে—সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত সমাধা করলেন। তারপর উনুনে নিজের ভাত-তরকারী রান্না করে নিলেন। সে কাজটাও সঙ্কটের ভেতর দিয়েই সম্পন্ন করতে হ'ল।

সব শেষে খোকা মায়ের প্রসাদ পেলে।

সেইদিন গভীর রাত্রে খোকা মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা মা, এখন ত' ব্রত শেষ হয়ে গেছে, এখন আর তোমার বলতে বাধা নেই। তুমি হঠাৎ সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত করতে গেলে কেন ?

মা খোকার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, শোন খোকা, কাল রাত্রে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। তাই ব্রত করলাম। সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত করলে—সব অমঙ্গল দূর হয়ে যায়। তোর চলার পথে আর কোনো বিপদ-আপদ আসবে না, 'তুই মানুষ হয়ে উঠতে পারবি—এই ত' মায়ের কামনা।

সাত

কুশলের বন্ধুর দল একদিন এসে উপস্থিত হ'ল ওর মায়ের কাছে।

মা জিজ্ঞেস করলেন—কি খবর তোমাদের? একেবারে সকালবেলায় দল বেঁধে এসে হাজির?

বরুণ এগিয়ে এসে বললে—মাসিমা, আমরা আজ বনভোজনে যাবো। একটা বড় নৌকো পাওয়া গেছে, কোনো-ভাড়া দিতে হবে না। কুশলও আমাদের সঙ্গে যাবে, আপনি অনুমতি দিন।

মা একবার ছেলেদের মুখের দিকে তাকালেন। সকাল বেলার সোনালী রোদে ওদের হাসি মুখগুলি আনন্দে আর উৎসাহে উদ্দীপ্ত।

মা খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। ছেলের দলের এই আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে তিনি দমিয়ে দিতে চাইলেন না। তাই তিনি ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন—আচ্ছা, অনুমতি না হয় দিলাম কিন্তু জানো ত' খোকা আমার সাঁতার জানে না?

বন্ধুদের সামনে খোকা বলায় কুশল বেশ একটু লজ্জা পেলো। ওর মুখখানি, লাল হয়ে উঠল।

সে খাটো গলায় অনুযোগের সুরে বললে—মা তুমি যেন কি! আমি কি এখনো খোকাই আছি নাকি?

মা হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন—সব মায়ের কাছেই ছেলেরা চিরকাল খোকাই থাকে রে। আর তোর বয়েসটাই বা এমন কি হয়েছে শুনি?

অনুমতি পেয়ে ছেলের দল মহা খুশী।

সত্য বললে—ফিরে এসে মাসিমার সঙ্গে ঝগড়া করা যাবে। আমরা ত' আর 'খোকা' বলি নি। শোন্ কুশল, শুধু একটা ধুতি আর একখানা গামছা নিলেই হবে। তেল-টেল আমরা যোগাড় করে শিশিতে ভরে নিয়েছি।

হিতেন-ফোড়ন কাটলে—আর কিছু দরকার হবে না। আমরা চড়ুই-ভাতির সব কিছু কালই যোগাড় করে রেখেছি।

মা ওদের বাধা দিয়ে বললেন—দাঁড়াও—দাঁড়াও—তোমাদের চাল-ডাল, আলু-আনাজ, তরকারী এ সব যোগাড় হয়েছে?

বরুণ উত্তর দিলে—সব বাড়ী থেকেই চাল-ডাল, আনাজ-তরকারী চাঁদা হিসেবে চেয়ে নিয়েছি। আর বোধ করি দরকার হবে না।

কুশল এইবার আপত্তি জানিয়ে কইলে—বাঃ! তা কেন? আমার ভাগটা আমাকে দিতেই হবে। মা, তুমি আমার জন্যে চাল-ডাল, আনাজ-তরকারী সব দিয়ে দাও। নইলে আমি কার ভাগ খেতে যাবো ?

ওর কথা শুনে ছেলের দল হাসতে লাগ্‌লো।

সত্য বললে—ওরে বোকা ছেলে, এতগুলি লোকের মধ্যে দু'চার জনের খাবার এমনিতেই বেশী হয়ে যায়।

কিন্তু কুশল সে কথা শুনবে কেন ? তার ভাগ সে চাঁদা হিসেবে দেবেই, নইলে বন্ধুদের মধ্যে তার মুখ থাকবে কেন ?

মা ওদের কথা-বার্তা শুনে মিটিমিটি হাসছিলেন। এইবার এগিয়ে এসে বললেন—একটু দাঁড়াও তোমরা, আমি খোকার ভাগটা দিয়েই দি। নইলে সারাদিন আবার ওর মন খুঁত-খুঁত করবে। মনে হবে—কার ভাগটা যেন খেয়ে ফেললাম।

মায়ের কথা শুনে ছেলের দলও হাসতে লাগলো। ততক্ষণে কুশল ধুতি আর গামছা গুটিয়ে নিয়ে একটি পুঁটলি তৈরি করে ফেলেছে।

ঘরের ভেতর থেকে মা চাল-ডাল, আলু-বেগুন, কুমড়ো ইত্যাদি যা পেলেন সুন্দর করে সাজিয়ে সত্যেব হাতে দিয়ে বললেন—এই নাও আমার খোকার ভাগ। এখন ওর খেতে লজ্জা পাবার কথা নয়।

ছেলেরা হুল্লোড় করে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

মা জিজ্ঞেস করলেন—কখন ফিরবি তোরা ?

বরুণ জবাব দিলে—আমরা নৌকো নিয়ে ষোলআনীর চর অবধি যাবো। এদিকে নৌকোর ভেতর রান্না হতে থাকবে। একটা ভালো জায়গা বাছাই করে নিয়ে আমাদের চড়ুইভাতি হবে। সঙ্গে কলাপাতা, মাটির গেলাস রইল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধেই হবে না।

হিতেন বললে—একটা সুবিধে মত জায়গায় নেমে ভালো করে সরষের তেল গায়ে মেখে দুপুরবেলা স্নান সেরে নেওয়া যাবে। আমাদের ফিরতে ফিরতে একেবারে সন্ধ্যের মুখে।

ছেলের দল আবার বললে—আপনি কুশলের জন্যে কোনো ভাবনা চিন্তা করবেন না মাসিমা। আমরা ত' সবাই এক সঙ্গেই রইলাম।

মা জবাব দিলেন ····· আর কোনো ভাবনা নেই। সাঁতার জানে না কিনা, তাই ভয় করে। তোমরা একটু চোখ রেখো ওর ওপর। আর খোকা, জলের ধারে যাস নি যেন। না হয় নৌকোর ওপর ঘটি দিয়েই স্নান সেরে নিস।

খোকা উত্তর দিলে—আচ্ছা মা·····

সবাই হুল্লোড় করে রওনা হলো নৌকো করে।

সকাল বেলার ঝিলমিলে রোদে ওদের মন-প্রাণ যেন একেবারে নেচে উঠল। খাল পেরিয়ে নদীর বাঁক ধরে নৌকো এগিয়ে চললো।

নদীর তীরের দৃশ্য ওদের মনকে টেনে নিলে। কোথাও সাজানো বাগান, কোথাও বাঁধানো ঘাটলা, কোথাও ছেলের দল সার বেঁধে স্কুলের পথে চলেছে।

কোন অঞ্চলে যেন হাট হবে, হাটুরেরা মাল-পত্তর নিয়ে কিছু যাচ্ছে নৌকো

করে, আবার একদল মাথায় বোঝা নিয়ে নদীর পারে-পারে ছুটছে। হয়ত সুবিধে মত জায়গায় খেয়া পার হয়ে যাবে।

এক জায়গায় ছেলেরা দেখলে—জেলের দল নদীর বুকে জালা ফেলে মাছ ধরছে। চক্‌চকে রূপোলী মাছগুলো যখন ধরা পড়ছে—দেখে ছেলেরা আর চোখ ফেরাতে পারছে না।

বরুণ আনন্দে নৌকোর পাটাতনের ওপরই লাফাতে শুরু করল। বললে—দেখ ভাই, এখানে থেকে আমরা কিছু টাটকা মাছ কিনে নিয়ে যাই। ভারী মজা হবে। বেশ ঘন করে সরষে-পাতুরী রান্না হবে।

সত্য ওকে ঠাট্টা করে বললে—তুই যে এখন থেকেই মুখ চোটকাতে শুরু করলি। ও মাছ খেলে কি আর কারো হজম হবে।

শেষ পর্যন্ত ছেলেদের আগ্রহে জেলেদের কাছ থেকে অনেক মাছ কেনা হ'ল। আড় মাছ, পাবদা মাছ, রুইয়ের পোনা, বেশ কিছু টাটকা চিংড়ি মাছও পাওয়া গেল।

একজন বামুন ঠাকুর ওদের সঙ্গে ছিল।

মাছ পেয়ে তার আনন্দ দেখে কে? সে আগেই সোনামুগের ডাল চাপিয়ে দিয়েছিল। এইবার টাটকা তাজা মাছগুলি কেটে নিয়ে সরষে-পাতুরী রাঁধবার জন্যে তৈরি হ'ল।

ছেলেদের মধ্যে একজন বললে,—এসো আমরা ধাঁধার জবাব বের করি। দেখি কে কাকে ঠকাতে পারে।

নানারকম মজার ধাঁধা ওদের মুখস্থ। ঠাকুমা-দিদিমার কাছ থেকে শিখে নিয়েছে।

হিতেন বললে—আচ্ছা জবাব দাও দেখি—

"পৃথিবীটা কার বশ ?"

সবাই চেঁচিয়ে উঠল—"পৃথিবীটা টাকার বশ !"

হিতেন মাথা দুলিয়ে বললে—এটা তোমরা সবাই জানো দেখছি। আচ্ছা বলো দেখি—

" ছোট্ট ছোট্ট ছেলেগুলো—
নদীর বুকে আছে—
তপ্ত তাপের কামড় খেয়ে
তিড়বিড়িয়ে নাচে।"

কেউ এ-ধাঁধার জবাব দিতে পারলে না। ছেলের দল এ-ওর মুখের দিকে বোকার মতো তাকাল।

খানিকবাদে কুশল লাফিয়ে উঠে বললে—আমি জানি এ-ধাঁধার উত্তর—

সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—কি-কি-কি ?

কুশল সকলের মুখের দিকে একবার তাকালে। তারপর ভারিক্কি চালে জবাব দিলে, এই ধাঁধার উত্তর হচ্ছে—খৈ।

ছেলের দল হুল্লোড় করে উঠল—খৈ ? কেমন করে হ'ল শুনি ?

কুশল বললে—খৈ ভাজা দেখেছিস ত ? খৈয়ের ধানগুলো প্রথমে চুপচাপ শুয়ে থাকে কড়ায়ের মধ্যে। সেইটে হ'ল নদীর বুকে থাকা। তারপর খোলা গরম হলে আগুনের তাপে ওরা তিড়বিড়িয়ে নাচতে শুরু করে দেয়। ছেলের দল জবাব শুনে সবাই এক সঙ্গে চিৎকার কার উঠলে—সাবাস ! সাবাস ! সাবাস !

ইতিমধ্যে নৌকো নদীর বুকের ওপর দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

নদীর পারে একটা সুন্দর ছায়া ঢাকা অঞ্চল সকলের চোখে পড়ল। ওটা একটা আম বাগান। নীচে যেন একেবারে সবুজ গালিচা পাতা। নিরিবিলি জায়গা। একেবারে লোকজনের ভীড় নেই।

ছেলের দল নৌকোর ওপরেই লাফাতে শুরু করল।

বরুণ বললে—এইখানেই আমরা আমাদের চড়ুইভাতির পালা শেষ করবো—

সকলেরই পছন্দ হ'ল জায়াটা।

নৌকো কিনারায় ভেড়ানো হলে ছেলের দল লাফিয়ে লাফিয়ে পারে নামতে শুরু করল।

সত্যি জায়গাটা মনোরম।

ওপরে সব ঝোপড়া আমগাছ। তাতে গোটা জায়গাকে ছায়ায় ঢাকা করে রেখেছে। আমগাছগুলির ফাঁক দিয়ে দিয়ে রোদ্দুর এখানে-সেখানে ঝিলিমিলি তৈরি করেছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন, আলো-ছায়ার আলপনা।

দিব্যি সমতল বনভূমি। তক্‌তকে পরিষ্কার।

একদল ছেলে গিয়ে আমগাছের শক্ত ডালে দোলনা তৈরি করে দোল খেতে শুরু করে দিলে।

আর কয়েকটি ছেলে আমগাছের ছায়ায় বসে নানারকম কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করল। ওরই ভেতর দিয়ে ছুটোছুটির বিরাম নেই।

ইতিমধ্যে নৌকোর ওপরেই রান্না অনেক দূর এগিয়ে গেছে। যেটুকু বাকি আছে বামুনঠাকুর হাত চালিয়ে শেষ করতে শুরু করল।

যেসব কলাপাতা কেটে নিয়ে আসা হয়েছিল—নদীর ঘাটে মাটির গেলাসের সঙ্গে সেগুলিও পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা হ'ল।

ছেলের দল তখন তেল মাখতে বসে গেল গাছতলায়।

সত্য চেঁচিয়ে বললে—যারা সাঁতার জানো, তারা আমার সঙ্গে এসো নদীর জলে। দেখি, কে কেমন সাঁতরাতে পারো ?

বরুণ সেই সঙ্গে কুশলকে সাবধান করে দিয়ে বললে—তুমি যেন আবার ওদের সঙ্গে নদীর জলে নামতে যেও না। মাসিমার বারণ আছে।

কুশল উত্তর দিলে—না-না, আমি কিছুতেই নদীর জলে নাম্‌বো না। একেবারে সাঁতার জানি না, নদীর তলে তলিয়ে যেতে আমি রাজি নই।

সত্যের ডাকে একদল ছেলে কোমরে শক্ত করে গামছা বেঁধে নৌকো থেকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা সত্যি সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল!

কুশল চারদিক ভালো করে দেখে নিলে। একটা জায়গা একেবারে নদীর পারে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। কুশল এক-পা দু-পা করে সেইখানে গিয়ে হাজির হ'ল।

বামুন ঠাকুরের কাছ থেকে একটা ঘটি আগেই চেয়ে নিয়েছিল। সেই ঘটিতে জল ভরে ভরে কুশল দিব্যি স্নান করতে লাগলো।

স্নানের পরই সত্যিকারের চড়ুইভাতি।

ধোয়া কলাপাতাগুলো সার সার লম্বা করে সাজিয়ে নিল ছেলের দল। তারপরই বসে গেল সবাই।

বামুন ঠাকুর একে একে পরিবেশন করছে, আর ওরা বিপুল আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠছে।

বাড়িতে বসে খেলে কি আর এমন আনন্দ হয় ? বামুন ঠাকুর পরিবেশন করছে— গরম গরম ভাত, তার মাথায় তপ্ত ঘি, ব্যাসন দিয়ে বেগুন ভাজা, মাছ ভাজা, মটরশুঁটি শাক, মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, মাছের ঝোল, আর পাতুরী। সবার শেষে আশে দই আর রসগোল্লা। দু'টি ছেলে কোন্ ফাঁকে জোগাড় করে এনেছে এই মিষ্টি তা কেউ জানে না।

ছেলেদের কলরবে নীরব বনভূমি সচকিত হয়ে উঠল। একদল কাক খাবারের লোভে গাছের ডালে বসে—কাঁ-কাঁ চিৎকার শুরু করে দিলে।

তারপর অনেক খাওয়া-দাওয়া, অনেক গান, অনেক খেলাধূলা আর হুল্লোড়ের পর ওরা নৌকো করে আবার বাড়ির দিকে রওনা হ'ল।

আট

ওদের নৌকো যখন নদীতে ভেসে আসছে—তখন পশ্চিম আকাশে কত বিচিত্র রঙের খেলা শুরু হয়ে গেছে।

লাল, হলুদ, সবুজ আর সোনা-রূপোয় যেন পশ্চিম দিকের আকাশটা মাখামাখি হয়ে গেছে।

সারাদিন আলো দেবার পর সূর্যিমামা বিদায় নিচ্ছেন। বিদায়ের ঘটা দেখে চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। বিধাতা-পুরুষের রঙের পাত্র বুঝি আচমকা ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। আর সুরলোকের শিল্পীদল বুঝি মনপ্রাণ খুলে হোলি খেলছে সেই রঙ গড়িয়ে নিয়ে।

ছেলের দল অবাক হয়ে সেই রঙের খেলার দিকে তাকিয়ে রইল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাইকার ঠোঁটে যেন কেউ এসে বোবাকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে।

তারপর ধীরে ধীরে সেই রঙের বন্যার ওপর একটা কালো কুয়াশার আবরণ নেমে এলো।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এলো।

ওরা সমবেত সুরে গান ধরলে—

"আমি ভয় করবো না—
দু'বেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না।"

নদীর ছল্ ছল্ শব্দ, নৌকোর দাঁড় ওঠা-পাড়ার আওয়াজ, দূরের নদী তীরে মন্দিরের শঙ্খঘন্টার শব্দ, উর্দ্ধ আকাশে অজানা পাখীর ঘরে ফেরার ক্লান্ত সুর তাঁদের সবাইকার মনে যেন এক বিষণ্ণ আবেশ জাগিয়ে তুললো। তবু ওরা গান গেয়ে চলেছে—

"শক্ত যা তাই সাধতে হবে—
মাথা তুলে রইবো ভবে—
বিপদ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে সরবো না
আমি ভয় করবো না।"

সবাই যখন গানে-গানে মাতোয়ারা কুশল নদী থেকে এক ঘটি জল তুলতে গেছে মাথা নীচু করে—

হঠাৎ ঝুপ করে একটা শব্দ হ'ল—বরুণ, সত্য, হিতেন চিৎকার করে উঠল, আরে আরে—কী সর্বনাশ ! আমাদের কুশল যে নদীর জলে পড়ে গেল।

সবাই হায় হায় করতে লাগলো, কিন্তু কেউ নদীর জলে নামতে রাজি নয়।

ওদের বামুনঠাকুর কাউকে কিছু না বলে চট্ করে মালকোঁচা মেরে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে কুশলের মাথার চুল শক্ত করে আঁক্‌ড়ে ধরেছে। নইলে কুশল যদি আবার ওকে জাপটে ধরে তাহলে দু'জন শুদ্ধ অতল তলায় তলিয়ে যাবে।

ছেলের দল তখনো প্রাণপণে চীৎকার কবছে—নৌকো থামাও—নৌকো থামাও—

যারা দাঁড় টানছিল আগে তারা কিছুই বুঝতে পারেনি। এইবার ছেলের দলের চিৎকারে ওরা দাঁড় টানা বন্ধ করে দিলে।

বামুনঠাকুরের চেহারাটাও যেমন বিশাল—সে জলের সঙ্গে যুঝে চলেছে দারুণভাবে হাত চালিয়ে।

ছেলের দল বুক-ফাটা চিৎকার করছে—উঠিয়ে দাও ওকে নৌকোর ওপরে—

কিন্তু বললেই কি আর চট্ করে নৌকোর ওপরে একটা মানুষকে তুলে দেওয়া যায়। হোক না ছোট ছেলে। তার দেহের ভারও কম নয়।

বামুনঠাকুর একদিকে জলের সঙ্গে আর একদিকে কুশলের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝে চলেছে। যে জলে ডুবতে চলেছে, কাছে গেলে সে যাকে হোক জাপটে ধরতে চায়।

ফলে, যে উদ্ধার করতে যায় তার হয় সমূহ বিপদ। সেই বিপদ কাটিয়ে নিজের আর অপরের প্রাণ বাঁচিয়ে অনেক কৌশলে উদ্ধারকারীকে এগিয়ে আসতে হবে।

ততক্ষণে নৌকোর গতি থেমে গেছে।

যারা দাঁড় টানছিল—তারাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। ছেলের দল বললে, বামুনঠাকুর, আর একটু এগিয়ে এসো—আমরা সবাই ধরাধরি করে ওকে নৌকোর ওপর টেনে তুলবো।

বামুনঠাকুরের দম বুঝি আর থাকে না। তবু প্রাণপণে যুঝছে সে। এইবার কুশলকে ঠেলে দিল নৌকোর দিকে।

ছেলের দল প্রস্তুত হয়েই ছিল। ওরা চটপট তার দু'টোই হাত ধরে ফেলে। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে কুশলকে একেবারে নৌকোর পাটাতনের ওপর তুলে ফেললে।

কী সর্বনাশ ! জল খেয়ে কুশল যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে ! ওর জ্ঞান কি করে ফিরিয়ে আনতে হবে ছেলের দল তা জানে না।

কেউ এসে মাথায় পাখা শুরু করল, কেউ হাত-পা টিপে দিতে লাগলো, আবার কেউ চোখে-মুখে জলের ছিটে দিতে লাগলো।

কিন্তু কুশলের জ্ঞান কিছুতেই ফিরে আসে না।

ছেলেরা মহা বিপদে পড়ে গেল।

একজন বললে, তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে হবে—

কিন্তু এই নদীর মাঝখানে নৌকোর ওপর ডাক্তার পাওয়া যাবে কোথায় ?

ওদিকে বামুনঠাকুরের অবস্থাও খুব কাহিল। তার ওপর দিয়েও কম ধকল যায় নি।

ওইরকম করে ঝাঁপিয়ে জলে পড়া, তারপর নদীর বুকে প্রাণপণে সাঁতার কেটে কুশলকে টেনে আনা, অবশেষে সেই দেহকে নৌকোর ওপর ঠেলে তুলতে সাহায্য করা, আর নিজেরও উঠে আসা।

এই সব কিছু জড়িয়ে পরিশ্রম কম হয় নি। চায়ের জন্যে যে দুধ ছিল নৌকোতে—তারই খানিকটা দুধ গরম করে একটি ছেলে এসে বামুনঠাকুরকে খাইয়ে দিলে। তাতে বামুনঠাকুর অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল।

কিন্তু বিপদ ঘটল কুশলকে নিয়ে। ছেলেদের সেবা করবার আগ্রহ কম নয়।

কিন্তু জলে ডোবা মানুষের জ্ঞান কিভাবে ফিরিয়ে আনতে হয় ওরা তা জানে না।

তখন ছেলের দল মরিয়া হয়ে বললে, তাড়াতাড়ি নৌকো চালাও। আমাদের এক্ষুণি ওদের বাড়িতে ফিরে যেতে হবে—

অনেকগুলি হাতে দাঁড় পড়ে—ছপ্‌-ছপ্‌ শব্দে এগিয়ে যায় মন-পবনের নাও। কিন্তু কুশল কথা কইছে না, নড়ছে না, চোখ মেলে তাকাচ্ছে না।

ছেলের দল সত্যি ভয় পেয়ে গেল। একটা যদি সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটে তা হলে ওদের মাসিমার কাছে, মানে কুশলের মার কাছে আর মুখ দেখাতে পারবে না।

যাই হোক সকলের সমবেত চেষ্টায় নৌকো খুব দ্রুতবেগে নদী ছাড়িয়ে খাল বেয়ে একেবারে কুশলদের বাড়ির পেছন দিকে এসে হাজির হ'ল।

ছেলেরা ধরাধরি করে কুশলকে নামিয়ে আনলে নৌকো থেকে।

কয়েকজন ছেলে সঙ্গে সঙ্গে এলো একজন ডাক্তারের খোঁজে। ডাক্তারকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে গাঁয়ে যে প্রবীণ কবরেজ মশাই আছেন—তাঁকে ডেকে নিয়ে আসতে হবে।

কুশলের ওই অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো বিষণখুড়ো, দাওয়াতে একটি মাদুর পেতে দিলে। ওকে সবাই মিলে শুইয়ে দিলে যত্ন করে।

মা তখন ঘরের ভেতর সন্ধ্যা-আহ্নিক নিয়ে ব্যস্ত। বিষণখুড়ো চোখ আর হাতের ইসারায় বললে, চুপ ! এখন ওর মাকে ডেকো না। তাহলে ভারি ভয় পেয়ে যাবে। জলে ডোবা মানুষকে জ্ঞান কি করে ফিরিয়ে আনতে হয় আমি জানি। তোমরা আমাকে একটু সাহায্য করো—

ছেলেরা যারা উপস্থিত ছিল, সকলেই এগিয়ে এলো। তখন বিষণখুড়ো কুশলের পেটে চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে একবার বসায়, আর একবার শোয়ায়।

এই করতে করতে গল্‌ গল্‌ করে বেশ খানিকটা জল ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিষণখুড়োর দৃষ্টি এখন ওর মুখের দিকে। এইবার ধীরে ধীরে কুশল চোখ মেলে তাকালো।

বিষণখুড়োর মুখেও হাসি ফুটে উঠল। বললে, যাক আর কোনো ভয় নেই প্রাণে বেঁচে গেছে। ছেলের দল তখন আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে মা প্রদীপ হাতে ঘর থেকে বেরোলেন। উঠোনে তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে যাবেন। ছেলেদের সাড়া পেয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

তারপর আর্তনাদ করে উঠলেন, এ কি ব্যাপার? আমার খোকা বেঁচে আছে ত'?

বিষণখুড়োর মুখে তখন আর হাসি ধরে না। বললে, আর ভয় নেই। জ্ঞান ফিরে এসেছে।

মা সেইখানে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। আপন মনে বিড় বিড় করে বললেন, এইজন্যেই বুঝি আমি দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম !

বিষণখুড়ো ব্যাপারটাকে সহজ করে তোলবার জন্যে বললে, তুমি আবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে কেন বৌঠান ? তাড়াতাড়ি তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে খোকার জন্য দুধ গরম করে নিয়ে এসো—

মা-ও যেন অথৈ জলে পড়ে গিয়েছিলেন। নাকি দিবা স্বপ্ন দেখছিলেন আপন মনে ?

হঠাৎ যেন নিজের হুঁস ফিরে এলো। বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ত'। তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে হবে।

মা উঠোনে নেমে গেলেন। মনে ওঁর কিসের ঝড় বইছে কে জানে!

ইতিমধ্যে দুই দল ছেলে, ডাক্তার আর কবিরাজ দুইজনকে ডেকে নিয়ে এলো। ওরাও ত' ব্যাপার দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বন-ভোজনের পরিণাম যে এমন হবে, সে কথা ছেলের দল ভাবতেই পারেনি।

এইবার কুশল চোখ মেলে তাকাচ্ছে দেখে ওদের মুখেও হাসি ফুটে উঠল।

ডাক্তার আর কবিরাজ মশায় দু'জনেই এসে বসে পড়লেন।

তারপর ভালো করে কুশলকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। প্রবীণ কবিরাজ মশাই নাড়ি দেখে বললেন, আর কোনো ভয় নেই। আমি একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি—

ডাক্তার বয়েসে প্রৌঢ়। এই গ্রামেরই লোক। তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

কবিরাজ মশাই বললেন, খানিকটা কুসুম-কুসুম গরম দুধ খাইয়ে দিতে হবে।

বিষণখুড়ো উত্তর দিলে, হ্যাঁ কোবিরেজ মশাই, ওর মা গরম দুধ আনতে গেছে—

খুশী মনে ডাক্তার আর কবিরাজ বিদায় নিলেন।

গভীর রাত।

সারা প্রকৃতি যেন স্তব্ধ হয়ে প্রহর গণনা করছে।

খোকা নিজের বিছানায় অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মা অপলক নেত্রে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ওই আকাশের তারা, গাছের পাতা, রাতের বাদুড়, কোটরে বসা লক্ষ্মী-পেঁচা সবাই যেন পরম আগ্রহ নিয়ে খোকার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

কখন খোকা জাগবে, কখন খোকা আগের মতো কথা বল্‌বে, হেসে উঠবে, আর এই উঠোনে ছুটোছুটি করবে।

গোয়ালের গাইগুলো, খোপের পায়রা আর হাঁসগুলোও কি ডাক্‌তে ভুলে গেছে? খোকা কথা বললে ওরা আবার নতুন করে ডাক্‌তে শুরু করবে।

মার চোখে আজ ঘুম নেই কেন?

মায়ের মনে প্রশ্ন জাগে—কেন দুঃস্বপ্ন দেখলাম? খারাপ স্বপ্ন দেখেও কেন ছেলেকে যেতে দিলাম? কেন খোকা নদীতে ডুবে গেল?

এ কি ভাগ্যের নির্মম খেলা ? তবু মায়ের মনে এই সান্ত্বনা—সঙ্কট-নারায়ণ-ব্রত তার খোকাকে আবার কোলে ফিরিয়ে দিয়েছে।

নয়

এই ঘটনার মাসখানেক পরের কথা।

মা রোজই খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন। সেদিন আরো আগে মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। চারদিকে কালো একটা কুয়াশা যেন ছড়িয়ে আছে আকাশে ; সূর্য ওঠার তখনো অনেক দেরী।

সেই আঁধারের মাঝে পিদিম জ্বেলে মা ঘরের অনেক কাজ শেষ করলেন।

ঘরের মেঝেতে ঝাঁট দিয়ে ভালো করে নিকিয়ে নেয়া হ'ল। তারপর বাইরের আকাশের কালো পর্দাটা একটু ফিকে হতে মা কাপড় গামছা, ঘটি নিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে চলে গেলেন।

ঘর থেকে বেরুবার আগে মা ধীরে ধীরে খোকাকে ডাকলেন—ওঠ খোকা, আজ সকালে উঠতে হবে।

খোকা একবার চোখ পিট্‌-পিট্‌ করে তাকালে। তারপর শুধোলে, কেন মা? এখনো ত' রাত রয়েছে। এত সকাল উঠে কি হবে ?

মা যেন কানে-কানে বলার মতো করে বললেন—ওরে খোকা, আজ তোর বাবার মৃত্যুদিন।

কথাটা শুনেই খোকা একেবারে বিছানার ওপর উঠে বসল। ওর দু'চোখ থেকে ঘুম একেবারে পালিয়ে গেল। ওর বুকের মাঝখানটিতে কে যেন হঠাৎ একটা বাণ ছুঁড়ে মারলে।

এই দিনটিতে তার বাবা মারা যান।

সে তখন কতটুকু ছিল ? মা ত' সেই দুঃখের দিনটিকে ঠিক মনে করে রেখেছেন। কাউকে জানতে দেন নি। অথচ প্রতিটি দিন তাঁর এই কথা মনে পড়েছে। নীরবে তিনি রোজ এই দিনটির জন্যে যেন মনের মন্দিরে ধ্যান করেছেন।

মা ত' খোকাকে জাগিয়ে দিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে চলে গেলেন।

কিন্তু খোকার ছোট্ট মনে যে সব ভাবনা-চিন্তার ঢেউ জাগল, তারই উত্তাল তরঙ্গে সে যেন একা একাই হাবুডুবু খেতে লাগলো।

এই ঘরটিতেই ত' বাবা থাকতেন ! তিনি কখন ঘুম থেকে উঠতেন, আর কখনই বা ঘুমোতে যেতেন? সারাটা দিন তিনি কি কি কাজ করতেন?

কি খেতে ভালোবাসতেন তার বাবা? বাবা আর মা দু'জনে মিলে সামনের ফুলের বাগানটার মাটি কুপিয়ে, জল ঢেলে, সার দিয়ে সুন্দর করে গড়ে তুলেছিলেন।

বাবা মরার পর আর মায়ের সেই বাগান করার দিকে যত্ন নেই। যে কটি গাছ আপনা থেকে ফুল ফোটায়, মায়ের পূজো তাই দিয়েই কোনো রকমে সারা হয়ে যায়।

এই দিনটিতে বাবা তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হয়ত তাদের অসহায় করে ফেলে রেখে যেতে চান নি, মৃত্যুর কঠিন হাত তাঁকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

আজ এতদিন পর বাবার আত্মা কি তাঁর মৃত্যুদিনে এই ধূলির ধরণীতে ফিরে আসবে? তিনি কি দেখতে আসবেন—আমরা কত কষ্টে আছি?

এই সব প্রশ্ন ছোট্ট খোকার মনে জাগছিল। আজ তার বাবার মৃত্যু দিনে সে কি ভালো কাজ করতে পারে যাতে ওর বাবার আত্মা তৃপ্ত হবে?

নানা কথা খোকা আপন মনে ভাবছিল। বাবা যেখান দিয়ে হাঁটাচলা করতেন, যেখানে বসে আপন মনে পড়াশোনা করতেন, যেখানে তাকে আদর করতেন, যে খাটে তিনি ঘুমোতেন, যে পুকুরে তিনি স্নান করতেন — সবই হয়ত সেই রকম আছে —কিন্তু সেই মানুষটি আর তাদের মাঝখানে নেই।

এই রকম দুঃখের ঘটনা জগতে কেন ঘটে? বিধাতা পুরুষ কি ইচ্ছে করেই মানুষের মনে কষ্ট দেন?

ছোট খোকা ঠিক ঠিক কিছু বুঝতে পারে না। তবু তার অন্তরে প্রশ্নের বিরাম নেই! ইতিমধ্যে মা পুকুর ঘাট থেকে ফিরে এসেছেন।

খোকা তার মাকে শুধোলে—আচ্ছা মা, আমিও কি গিয়ে পুকুর ঘাটে স্নান করে আসবো?

মা উত্তর দিলেন—আর একটু বেলা হোক, তখন তুমি স্নান করবে। নইলে তোমার আবার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।

খোকা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, মা কি করেন? স্নান করে ফেরবার মুখে মা বেশ কিছু ফুল তুলে নিয়ে এসেছেন। সেই ফুল দিয়ে মা বোধহয় এখন মালা গাঁথবেন।

ঠিক তাই।

খোকা বুঝতে পেরেছে। ওই মালা বাবার ফটোতে লাগিয়ে দেবেন মা। তারপর মনে মনে বাবার ধ্যান করবেন।

এই সময়টায় খোকা পুকুর ঘাটে গিয়ে মুখটুখ ধুয়ে এলো।

তারপর যে বাগানটা এক সময় মা-বাবা দিনরাত খেটে তৈরী করেছিলেন সেইখানে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো। অনেক গাছই এর মধ্যে মারা গেছে। তবু কতকগুলো ফুল গাছে এখনো ফুল ফুটছে।

খোকা আপন মনে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। ইতিমধ্যে মা বেরিয়ে এলেন বাইরে।

খোকা বাগানে ঘুরছে দেখে মা-ও দাওয়া থেকে নীচে নেমে এলেন।

বললেন— জানিস খোকা, এই বাগানে আগে কত ফুল ফুটত। তোর বাবা এই বাগানটা বড় ভালোবাসতেন। এই যে দেখছিস কৃষ্ণচূড়া আর আমলকী গাছ, ওখানে তিনি সুন্দর একটি দোলনা তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেই দোলনাতে তুই কত দোল খেতিস।

খোকা চোখ পিট-পিট করে বললে—হ্যাঁ মা, কী মজা যে হতো!

মা বাগানের একটা কোণে গিয়ে খোকাকে দেখিয়ে বললেন—আচ্ছা বল ত' খোকা, এটা কি গাছ?

খোকা উত্তর দিলে—আমায় ঠকাতে পারবে না। আমি জানি, ওটা বকফুল গাছ—

মা বললেন—জানিস খোকা, এই বকফুল গাছটা তোর বাবা নিজে হাতে পুঁতে ছিলেন। এক সময় এই গাছে প্রচুর ফুল ফুটত। সাদা সাদা ফুলে সারা গাছটা ছেয়ে থাকত।

খোকা বললে—এখনো ফুল ফোটে, কিন্তু অনেক কম। মা হাসতে হাসতে বললেন, কিন্তু মজার কথাটা ত' এখনো বলি নি।

খোকা শুধোলে—কি মজার কথা মা?

মৃদু হাসিতে মার মুখখানি ভরে গেল। জবাব দিলেন—তোর বাবা এই বকফুল বেসন দিয়ে ভাজা খুব ভালো বাসতেন।

খোকা হঠাৎ উল্লসিত হয়ে বললে—আচ্ছা মা, একটি কাজ করলে ত' হয়—

মা খোকার চোখের দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—কি রে?

খোকার মুখে মিষ্টি হাসি।

—একটা কথা আমার মাথায় এলো। তুমি আগে শোনো, হেসো না যেন।

—আহা, তুই বল না শুনি—

—আমি বলছিলাম কি, বাবা যা-যা খেতে ভালোবাসতেন—তুমি আজকের দিনে তাই রান্না করো! আমি আমার দু'চার জন বন্ধুকেও নেমন্তন্ন করি—

মা উত্তর দিলেন—তা মন্দ কি! বাল্য ভোজ ত' ভালই। ওতে আত্মার তৃপ্তি হয়।

খোকা শুধোলে—আচ্ছা মা, তুমি আত্মা বিশ্বাস করো?

মা জবাব দিলেন—নিশ্চয়ই। আত্মার ত' ক্ষয় নেই। আত্মা আছে বৈকি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন—তোর কাছে ত' আমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প বলেছি। তিনি যখন দেহ রক্ষা করলেন—শ্রীশ্রীমা শাঁখা আর চুড়ি খুলে রাখতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে ঠাকুর দর্শন দিয়ে বললেন—এগুলো খুলে রাখছ কেন ? আমি কি মরেছি ? জীবন আর মৃত্যু—এত' শুধু এ-ঘর আর ও-ঘর।

খোকা উত্তর দিলে—হ্যাঁ মা, ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা তোমার কাছেই শুনেছি—

মা বললেন—তারপর শোন্—যীশুখৃষ্টকে যখন ক্রুশে বিদ্ধ করে মেরে ফেলা হ'ল—তারপরেও তিনি বহুবার তাঁর শিষ্যদের দেখা দিয়েছিলেন। তা ছাড়া হিন্দুরা আত্মার তৃপ্তির জন্যে গয়ায় পিণ্ড দেয়।

খোকার কৌতূহলী মন অনেক কিছু জানতে চায়। সে হঠাৎ মায়ের কাছে প্রশ্ন করে বসল—আচ্ছা মা, আমার বাবাও ত' আমাদের দেখছেন—আমরা কিভাবে আছি, চলছি-ফিরছি—সব দেখছেন। তিনি কেন আমাদের দেখা দেন না ?

মা খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকলেন। তারপর বললেন—তা ত' বলতে পারবো না বাবা ! তবে এইটুকু জানি, তিনি আমাদের সব সময় দেখছেন, আমাদের দুঃখ কষ্টের কথা সব তিনি জানেন। হয়ত এই বাড়িতে ঠিক এই সময় তাঁর আত্মা উপস্থিত রয়েছে, আমাদের সব কথা শুনছেন, কিন্তু আমরা কিছুই টের পাচ্ছি না। দেহ ধারণ করবার শক্তি হয়ত সব আত্মার নেই। কিন্তু আত্মা সব জায়গায় চলাফেরা করতে পারে এ কথা আমরা বিশ্বাস করি—

—ঠিক আছে মা। খোকা বললে—বাবা কি কি খেতে সাধারণত ভালোবাসতেন তুমি আজ তাই রান্না করো। তাঁর আত্মার তৃপ্তি হবে।

মার মুখে বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এলো। কিছুক্ষণ তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর অনেকটা আপন মনেই বললেন—শাক খেতে তোর বাবা খুব ভালোবাসতেন। ঘন ছোলার ডাল ওর প্রিয় ছিল। বেসন দিয়ে বেগুন ভাজা আর বক ফুল ভাজা তাঁর কাছে বেশ মুখরোচক ছিল ! এ ছাড়া লাউয়ের তরকারী, পাবদা মাছ পেলে তিনি খুব খুশী হতেন।

—পাবদা মাছ না হয় আমি যোগাড় করে নিয়ে আসবো—

মা আর ছেলে তাকিয়ে দেখ্লে বিষণখুড়ো ওই কথা বলতে বলতে উঠোনে এসে ঢুক্‌ছে।

খোকা আনন্দে হাততালি দিয়ে বললে—তাহলে তোমার আর কোনো ভাবনা রইল না। ছোলার ডাল ঘরে আছে। শাকের জন্যে ভাবনা নেই। বেগুন, বক ফুল আর লাউ নিজেদের বাগানেই ঝুলছে। এক বাকি ছিল পাবদা মাছ—তা' বিষণখুড়ো যোগাড় করে নিয়ে আসবে। আমি যাই মা, আমার চার জন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে আসি—

সঙ্গে সঙ্গে খোকা ছুট লাগিয়েছিল। পেছন থেকে মা ডেকে বললেন—শুনে যা একটা কথা—

খোকা ফিরে এসে বললে—আবার পেছু ডাকলে ত' ?

মা হেসে বললেন—খনার বচন জানিস ত' ? মা পেছন ডাক্‌লে কিছু হয় না—! আগে থেকে পিছু ভালো যদি ডাকে মায়—'

খোকা শুধোলে—কি বলবে বলো।

মা মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলেন—' শোন্ বলি, সেই যে বামুনঠাকুর তোদের বনভোজনের দিন যে তোকে নদী থেকে তুলে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন—তাকেও নেমন্তন্ন করে আয়। অমন উপকারী মানুষ আমার আর কে আছে ? তা ছাড়া ব্রাহ্মণ মানুষ ওকে নেমন্তন্ন করলে তোর বাবার আত্মা খুশী হবে—'

খোকা জবাব দিলে—আচ্ছা, আমি এখুনি গিয়ে বলে আসছি—

সেদিন সারা সকাল মা মনের মত করে রান্না করলেন। রান্না করতে করতে তাঁর দুই চোখ বারে বারে জলে ভরে উঠল।

আজ মানুষটি বেঁচে থাকলে কত আনন্দ করতেন, কত রসিকতা করতেন।

কিন্তু কে বললে, তিনি নেই ? হয়ত আশে পাশে ঘুরছেন, হয়ত লাউয়ের ডগাটা মাচার ওপর তুলে দিচ্ছেন। বেগুন গাছের পোকা ছাড়িয়ে দিচ্ছেন, না হয় পুকুর ঘাটে গিয়ে বিষণের মাছ ধরা দেখছেন !

মায়ের চোখের সামনে এই সব ছবিগুলো ভেসে উঠল। সেদিন দুপুর বেলা সবাই খুব তৃপ্তির সঙ্গে মায়ের রান্না খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগ্‌লো—

মা মনে-মনে ভাবলেন, আর একটি কলাপাতার সামনে আর একটি মানুষ বসে চেটে-চুটে কি সব খাবার খেয়ে নিল। হয়ত তাকে চোখে দেখা যায় নি। তবু একেবারে মিথ্যে হয়ে যায় নি। হয়ত সে এসেছিল—

হঠাৎ একটি গানের কলি—মায়ের কানে ভেসে এলো—"তুমি নির্মল করো মঙ্গল করো—মলিন মর্ম মুছায়ে"।

খোকার বাবা অনেক সময় গানটি গুণ গুণ করে গাইত !

দশ

সারাটা দিন মায়ের এতটুকু বিশ্রাম ছিল না।

একদিকে ঘরের সব কাজ—অন্যদিকে এতগুলি মানুষের রান্না।

মা যে সারাদিন না খেয়ে এই অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন—এ কথা কাউকে জানতে দেন নি !

রান্না করবার সময় একবার মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন। ভাগ্যিস কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছিলেন। নইলে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয়ে যেত।

ছেলেদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলে তিনি বিষণকে দাওয়ার ওপর বসিয়ে দিলেন।

নিজের হাতে পরিবেশন করে তিনি বিষণকে তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ালেন। বর্তমানে তাঁর যা নিঃসহায় অবস্থা সেই সময় বিষণের মতো একটি উপকারী সুহৃদ তাঁর আর কেউ নেই।

বিষণও সব কটি পদ চেয়ে নিয়ে তার খাওয়া শেষ করল।

বললে—বৌঠান, তোমার রান্না যেন একেবারে অমৃত। পেট ভরে ডিগ্ ডিগ্ করে তবু মনে হয় আরো একটু চেয়ে নি।

মা বললেন—আজ তুমি পাব্দা মাছ খুব ভালো এনেছিলে বিষণ। রান্না করে, তোমাদের পাতে দিয়ে আমিও খুব তৃপ্তি লাভ করেছি।

মা আর বিষণ দুই জনেই জানে যে, এই বাড়ীর কর্তাটি পাব্দা মাছ খুব পছন্দ করতেন। তাই কেউ আর সে কথা উল্লেখ করলেন না।

বিষণ দাওয়াটা নিকিয়ে হাঁসগুলোকে ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

বললে—আজ সারাদিন বাড়ির কোনো খোঁজ নিতে পারি নি। এইবার একটু পা চালিয়ে চলে যাই—

মা কিছু মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা ওর কোঁচড়ে ঢেলে দিলেন।

বললেন—আর ত' কিছু দিতে পারলাম না। এইগুলোই ছেলে-মেয়েদের হাতে দিও।

বিষণ বললে—তুমি ত' সব সময়ই কিছু-না-কিছু দিচ্ছ বৌঠান। আজ আবার এত কিন্তু কিন্তু হচ্ছ কেন ?

বিষণ গান গাইতে গাইতে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল।

এইবার মা একটু নিজের দিকে তাকাবার অবসর পেলেন।

খোকা বন্ধুদের এগিয়ে দিতে গেছে।

আর ওই বাচ্চা ছেলেটা সারাদিন কি করে ঘরের ভেতর আবদ্ধ থাকে। ওর-ও ত' বন্ধু-বান্ধব আছে, খেলার মাঠ আছে—বাইরের জগৎকে বাদ দিলে ওই বা বাঁচবে কি করে?

মা চুপ করে দাওয়ার ওপর একটু বসলেন।

চাঁদের মৃদু জোছ্না উঠেছে। বাগান থেকে কয়েকটি ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। এইরকম নিরিবিলি পরিবেশে বাড়ির মানুষটি কতদিন মাদুর পেতে বসেছেন, আপন মনে গুণ-গুণ করে গান করেছেন, আর বারে বারে ওঁকে ডেকেছেন সেই মাদুরের ওপর এসে বসতে।

কিন্তু তখন ওঁর সময় হয় নি। সংসারের কত কাজ ওর হাতে। দু'দণ্ড বসবার সময় কোথায় ?

আজ এই নিরিবিলি সন্ধ্যাবেলায় মায়ের মনে হচ্ছে কত অবসর ! ওই মলিন চাঁদের আলো, বাগানের কয়েকটি গাছের ফুল, নীড়ে ফেরার কয়েকটি পাখী যেন তাকে ডাক দিয়ে বলে গেল, আর কি তোমার কাজ রইল ঘরে ?

সারাদিন উপবাসে গেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ক্ষিদে-তেষ্টা একেবারে নেই ! যেন এমনিভাবে চুপচাপ বসে থাকতেই ওর ভালো লাগছে !

কিন্তু একেবারে উপোস করে থাক্‌লে, কাল সকালে উঠে সংসারের কাজে লাগবেন কি করে ?

খানিকটা সাবুদানা ভিজে আর নারকেল কোরা ছিল। তাই গুড় দিয়ে মেখে খেয়ে—চক্‌চক্‌ করে এক ঘটি জল খেলেন মা। তারপর নিজের ক্লান্ত দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিলেন।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল।

খোকা কখন ফিরে এলো, ঢাকা দেওয়া খাবার খেয়ে সে কখন নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল,—মা কিচ্ছু জানতে পারেন নি।

গভীর রাত্রে ওর মনে হ'ল—তার নিজের নাম ধরে কে যেন ডাকছে।

এমনভাবে কাতর কণ্ঠে কে ওকে ডাকছে—কিছুতেই তিনি বুঝতে পারছেন না। দুই চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে,—ডাক শুনছেন—তবু বিছানা ছেড়ে কিছুতেই উঠতে পারছেন না !

এর পর আবার স্পষ্ট ভাষায় চেনা গলা শোনা গেল।

—এখনো ঘুম ভাঙল না ? শীগ্‌গির উঠে পড়ো, ঘরে যে আগুন লেগেছে ! তোমার খোকাকে বাঁচাও !

অ্যাঁ ! আগুন?

কোথায় লাগলো ? কখন লাগলো ?

সেই দুঃস্বপ্নই কি এতদিন সত্যি হ'ল ?

এইবার ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলেন মা।

তাই ত' !

চারদিকে আগুন তার লেলিহান শিখা বিস্তার করেছে।

কতক্ষণ ধরে তিনি সাবধান বাণী শুনছেন—তিনি ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না !

এই আগুনের বেড়াজাল থেকে তাকে বেরুতেই হবে। একদিকে যেমন আগুন,—অন্যদিকে তেমনি ধোঁয়ার কুণ্ডলী। খোকা এখনো অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে !

সারাটা দিন ওরও খাটাখাটুনি আর পরিশ্রম কম হয় নি।

তাই খোকাও এই দারুণ বিপর্যয়ের কথা বিন্দুমাত্র জানতে পারে নি !

—ডান দিকে দরজা—খোকাকে কোলে নিয়ে খিল খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো—

সেই চেনা মানুষটির গলা আবার স্পষ্টভাবে শোনা গেল।

মা আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলেন না।

দু' চোখ ধোঁয়ায় জ্বলে যাচ্ছে। তবু তিনি মনে সাহস আর বল নিয়ে খোকার বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন।

খোকাকে কোনো রকমে টেনে তুলে জড়িয়ে ধরে তিনি প্রাণপণে ছুটলেন দক্ষিণ দিকের দরজার খিল খুলতে।

ধোঁয়ার আর আগুনের তাপে সে দরজার খিল কি আর সহজে খুলতে চায় ?

কিন্তু হতাশ হলে চলবে না। যে করেই হোক খোকার জীবন রক্ষা করতেই হবে।

আর সেই চেনা গলার মানুষটি কি কোনো সাহায্যই করবে না ? দরজা তাকে খুলে ফেলতেই হবে—আগুনের তাপে খিলটা সত্যি আটকে গিয়েছিল।

মায়ের প্রাণপণ টানে সেই বন্ধ-দুয়ার খুলে গেল। খোকাকে জড়িয়ে ধরে, মা যেন ঘর থেকে একেবারে ছিটকে বেরিয়ে এলেন।

একটু বাদেই সেই জ্বলন্ত ঘরটি একেবারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

মায়ের কপালে একটা চোট লেগেছিল। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি দেবার মতো মনের অবস্থা তাঁর ছিল না।

মা শুধু একবার লেলিহান অগ্নি-শিখার দিকে দৃষ্টিপাত করে হতাশার সুরে বললেন, একটা জিনিসও বাঁচানো গেল না। আজ আমরা একেবারে পথের ভিখিরী হলাম।

এই ব্যাপারে খোকা একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তার মুখ দিয়ে আর কোনো কথাই বেরুচ্ছিল না।

ইতিমধ্যে এই সর্বগ্রাসী অগ্নির লেলিহান শিখা দেখে—গ্রামবাসী আর প্রতিবেশীরা অনেকেই ছুটে এলেন।

পড়ি-কি-মরি করে ছুটে এলো বিষণখুড়ো—বিষণখুড়ো ত' উন্মাদের মতো ঘরের জিনিস-পত্র বাঁচাবার জন্যে সেই আগুনের মধ্যেই ঢুক্‌তে যাচ্ছিল—

কিন্তু মা তার হাতখানি ধরে ফেললেন। বললেন, আমাদের ত' সর্বস্বই গেছে, তুমি কেন এই আগুনের মধ্যে প্রাণ দিতে যাবে ? কিছুই আর বাঁচানো যাবে না। তার চাইতে তুমি দূরে বসে আগুনের খেলা দেখো।

সেই শেষ রাত্তিরে আগুনের লক্—লক্ শিখা দেখে যারা আশ-পাশ থেকে এসে জুটেছিল—তারা সকলে হায়-হায় করতে লাগলো।

মা যে কত কষ্টে নিজের বুকের রক্ত জল করে একমাত্র ছেলেটিকে মানুষ করছিলেন, সে কথা গাঁয়ের কারো অজানা ছিল না।

এখন কি ওদের গতি হবে—কোথায় গিয়ে ওরা মাথা গুঁজে দাঁড়াবে সেই হ'ল গাঁয়ের মানুষের এক মস্ত বড় ভাবনা।

জ্বলন্ত ঘরখানি থেকে মাঝে মাঝে টিন, কাঠ, বাঁশের টুকরো, কোনো তপ্ত বাসন-কোসন ছুটে ছুটে বেরিয়ে আসছে—সবাই এসে মা আর খোকাকে একটু দূরে একটা গাছতলায় বসিয়ে দিল।

বিষণখুড়ো পাগলের মতো চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলো।

না, কোনো কিছুই আর বাঁচাবার উপায় ছিল না। অবশেষে শ্রান্ত, ক্লান্ত, সর্বহারার মতো বিষণখুড়ো একটা গাছতলায় বসে পড়ল।

দুই হাত দিয়ে সে কেবল তার মাথার চুলগুলি টানতে লাগলো।

তার দুই চোখ বেয়ে অজস্র ধারায় চোখের জল গড়িয়ে পড়তে থাকলো।

কিন্তু জলের আভাস মাত্র নেই মায়ের চোখে। যার সব গেছে—কান্নাটুকুও বুঝি তার অবশিষ্ট নেই।

মা এক দৃষ্টে সেই ধ্বংসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। খোকার মুখে যেন কে বোবাকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে।

সে না পারছে মায়ের মুখের দিকে তাকাতে, আর না পারছে—নিজে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিতে।

তাদের এই দুঃখের সায়র যে কত গভীর তা ওই ছোট ছেলেটি যেন অনুধাবন করতে পারছিল না।

খোকা আপন মনে ভাবছিল, এই যে মা দুঃস্বপ্ন দেখে সঙ্কট নারায়ণের-ব্রত করলেন—কি শুভ ফল হ'ল তার ?

তাদের দুঃখের পাথারে ডুবিয়ে মারাই কি বিধাতার ইচ্ছে ?

অথচ তারা ত' কারো কোনো ক্ষতি করেনি। আপন মনে মা আর ছেলে কোনো রকমে বেঁচে ছিল—গাঁয়ের এক প্রান্তে। তাদের দুঃখের ভাগ নিতেও কাউকে ওরা ডাকে নি। বিষণখুড়ো সব আপদে-বিপদে ওদের একেবারে আগলে রেখেছিল। আজ সেই মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

অবশেষে সেই কালরাত্রির প্রভাত হ'ল। কোনো কোনো প্রতিবেশী তাদের ডাকল—নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু মা যেন একেবারে পাথরের মূর্তি হয়ে গেছেন !

বিষণখুড়ো খোকাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে মাকে বললেন—চল বৌঠান, তুমি আমার বাড়ি চলো। সেখানে একটা বাড়তি ঘর ত' আমার আছে। কষ্ট হলেও সেইখানে তুমি খোকাকে নিয়ে মাথা গুঁজে থাকো। তারপর আমি তোমার নিজের ভিটেয় ঘর তুলে দিচ্ছি—

পাথরের মূর্তির মুখে যেন কথা ফুটল। মা ক্ষীণ কণ্ঠে বললে—না রে বিষণ, বিধাতা যখন সব কিছু কেড়ে নিয়ে আমায় পথের ভিখারী করে দিলে,—তখন আর এখানে থাকবো না। এখানে আমার স্বামীকে হারিয়েছি, তারপর আবার সব কিছু খোয়ালাম। এখন আমার একমাত্র কাজ হবে এই খোকাকে মানুষ করে তোলা। ওর এক পিসি আছে। আমি ভাবছি খোকাকে নিয়ে সেইখানেই চলে যাবো। কিন্তু তোমাকে আমাদের পৌঁছে দিতে হবে—

বিষণ বললে—সে না হয় পৌঁছে দেবো। খোকার পিসির বাড়ি কত দূর ?

মা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন—কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে বন তুলসী গ্রাম আছে না ? সেই গাঁয়েই খোকার বড় পিসির বাড়ি। ওই এক পিসিই বেঁচে আছেন—

মায়ের কথাটা লুফে বিষণ বললে—হ্যাঁ, বন-তুলসী গাঁয়ের নাম শুনেছি। ওখানে খুব বড় হাট হয়—

মা বললেন—গরুর গাড়ি করে যেতে হয় সেখানে। কিন্তু আমার হাতে ত' একটি আধলাও নেই !

বিষণ জবাব দিলে—গরুর গাড়ি করে না হয় আমি সেথায় তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবো। একটা গরুর গাড়ি ত' আমার নিজেরই আছে।

একটু চুপ করে থেকে বিষণ যেন আপন মনেই বললে—কিন্তু আমি বলছিলাম কি—দু'চার দিন বাদে একটু সুস্থ হয়ে রওনা হলে হত না ?

মা করুণ কাতর কণ্ঠে বললেন—আর থাকতে বলিস নে বিষণ। যদি তোর গরুর গাড়ি খালি থাকে ত' বেলাবেলি রওনা হয়ে পড়ি। হয়ত সূর্যাস্তের আগেই আমরা বন-তুলসী গাঁয়ে পৌঁছে যেতে পারবো।

বিষণ বললে—তা হলে তোমার এই ঘাটলার ওপরেই একটু বোসো বৌঠান, আমি গাড়িটা জুড়ে নিয়ে আসি—

গ্রাম ছেড়ে গরুর গাড়ি চলেছে বন-তুলসী গাঁয়ের দিকে—

মা আর ছেলে চুপচাপ গাড়িতে পাতা খড়ের গাদার ওপর বসে আছে।

মায়ের দু'টি চোখ এই গাঁয়ের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ; সবই ত' ঠিক আছে—। যে যার আপন কাজ করে চলেছে। চাষী ভায়েরা নিজ নিজ ক্ষেতের কাজে চলেছে, জেলেরা জাল ফেলতে চলেছে—খালের ধারে, গাড়ি বাঁক নিতে দেখা গেল—পাঠশালা বসেছে একটা গাছতলায়।

খোকা হঠাৎ বললে, 'আমার বইগুলোও সব পুড়ে গেল—

মা খোকার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আবার হবে। খোকা, মানুষ তোমায় হতেই হবে।

এগারো

সারাদিন ধরে গাড়ী চলেছে।

বিষণের মুখেও কোনো কথা নেই।

সে আপন মনে গাড়ী চালিয়ে চলেছে।

পেছন ফিরে যে একবার ওদের মুখের দিকে তাকাবে বিষণখুড়োর সে সাহসও নেই।

তাই বলে চাবি দেওয়া পুতুলের মতো সে শুধু সমুখ পানে চেয়ে রয়েছে, আশেপাশে কোনো দিকে তাকাবার যেন তার কোনো উপায় নেই। গাড়ীর ভেতর আরো দু'টি পুতুল যে নির্বাক হয়ে বসে রয়েছে—সে দিকে ভুলেও সে একবার চেয়ে দেখছে না।

এইভাবে গরুর গাড়ী চলেছে এগিয়ে এক গ্রাম ছেড়ে আর এক গ্রামে।

এরই মধ্যে গনগনে রোদ্দুর উঠে গেছে মাথার ওপর। আরো কিছুদূর চলবার পর একটা হাট পড়ল পথের পাশে।

এতক্ষণে বিষণখুড়োর বুঝি সম্বিৎ ফিরে এলো। সে এইবার গাড়ীর পেছন দিকে তাকালো।

বলল—কারো পেটে ত' কিছু পড়ে নি ! হাট যখন মিলল তখন মুড়ি-মুড়কি আর বাতাসা কিনে নিয়ে আসি। ওই ত' পাশেই টল্‌টলে পুকুর। গাড়ী থেকে নেমে ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে নাও বৌঠান। খোকার মুখটাও ত' কালচে মেরে গেছে।

তারপর হঠাৎ মায়ের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তে বিষণ যেন শিউরে উঠল।

বললে—একি বৌঠান, তোমার কপালে একটা চোট লেগেছিল কাল রাত্রে? কপালে যে রক্ত জমে আছে।

মা মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলে কাল রাত্রে খোকাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরুবার সময় চৌকাঠে লেগেছিল। সেকথা আগে বলবে ত'? বিষণ অনুযোগ করে বললে।

আমি এক্ষুণি গাঁদা গাছের পাতা নিয়ে আসছি। তারই রস কপালে লাগিয়ে দাও, এক্ষুণি সেরে যাবে। তোমরা গাড়ি থেকে নেমে পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি যাবো আর আস্‌বো।

বিষণ গরুর গাড়ীটাকে রাস্তায় একধারে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারপর কিছু খড় গাড়ী থেকে বের করে বলদ দু'টির সামনে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলো হাটের দিকে।

মা মনে মনে ভাবলেন, সব যার খোয়া গেছে পথই ত' তার একমাত্র সম্বল।

খোকাকে নিয়ে তিনি গরুর গাড়ী থেকে নেমে এলেন। এই দিকটা বেশ ঘাসে ঢাকা। ঘাট্‌লাটা নারকেল গাছের গুড়ি কেটে তৈরি করা হয়েছে। হাটটা একটু দূরে বসেছে।

খোকাকে নিয়ে মা ঘাট্‌লার কাছে নেমে গেলেন। দিব্যি টলটলে জল। মনে হয় এই শীতল জল দেহ-মনের সব ব্যথা-বেদনা ধুয়ে মুছে দেবে।

মা বললেন'—'খোকা, ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে নে। নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে। মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। বিষণ এক্ষুণি মুড়ি-মুড়িকি কিনে নিয়ে আসবে। ও আগের জন্মে নিশ্চয়ই তোর ভাই ছিল। নইলে এত দরদ কেন আমাদের

ওপর। তোর যে খুব ক্ষিদে পেয়েছে সেকথা গাড়ী চালাতে চালাতে ঠিক টের পেয়েছে। বুঝলি খোকা, একেই বলে প্রাণের টান।

খোকা কিন্তু তার ক্ষিদের কথা একবারও বললে না। শুধু মাকে জিজ্ঞেস করলে আচ্ছা মা, আমরা ত' পিসির বাড়ি যাচ্ছি, কিন্তু পিসি যদি আমাদের চিন্‌তে না পারেন ? যদি তাঁদের বাড়িতে আমাদের থাকতে না দেন ?

এত দুঃখেও মার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। মা বললেন, 'দূর বোকা ছেলে তা কেমন করে হবে ? তোর আপন পিসি যে ! বড় পিসি, বুঝলি ? তোর আরো দু'জন পিসি ছিলেন, তাঁরা অনেক কাল আগেই মারা গেছেন। তোর এই পিসিই তোর বাবার বড় বোন। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলাধূলা করেছেন, আদর সোহাগ সবই ত' এই বড় পিসির সঙ্গে। তোকেই না হয় দেখেন নি, কিন্তু আমায় ত' দেখেছেন, জানেন। কতবার ওঁদের বাড়িতে আসবার জন্যে আমায় নেমন্তন্ন করেছেন। কিন্তু নিজের সংসার ফেলে ত' আর আসা হয় নি।

খোকা জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা এখন এভাবে গেলে কি বড় পিসি তোমায় চিনতে পারবেন?

উত্তর দিলেন—তা কি ঠিক আর পারবেন না ? 'তবে এইভাবে পথের ভিখিরী হয়ে যে কারো দরজায় গিয়ে হাজির হবো সেকথা কি কোনো দিনের তরে ভাবতে পেরেছিলাম ?

কথা বলতে বলতে মা খোকাকে নিয়ে ওপরে উঠে এসেছেন।

ওদিক থেকে দেখা গেল বিষণখুড়ো ছুটতে ছুটতে আসছে। বিষণ বললে—এই নাও বৌঠান, গাঁদা গাছের পাতা। ভালো করে হাতে চট্‌কে কপালে লাগিয়ে দাও। একেবারে সেরে যাবে।

তারপর খোকার দিকে তাকিয়ে বিষণখুড়ো বললে—খুব ক্ষিদে পেয়েছে তোমার আমি বেশ বুঝতে পারছি। আরে আমারই ক্ষিদের চোটে পেটের নাড়ি চিন্ চিন্ করছে....আর তুমি ছেলে মানুষ, তোমার ত' ক্ষিদে পাবেই। শোনো, আমি কোঁচড় ভর্তি মুড়ি-মুড়কি আর বাতাসা নিয়ে এসেছি। একটা দোকানে গরম গরম জিলিপি ভাজ্‌ছিল তাও কিছুটা নিয়ে এলাম। তোমার ভালোই লাগ্‌বে। বৌঠান, তুমি খাবে ত ?

মা বললেন—পাগল, বাসি কাপড়ে রয়েছি, সারাদিন স্নান করি নি....আমি কি যেখানে-সেখানে খেতে পারি ? তার ওপর সন্ধ্যা-আহ্নিক হয় নি,—সারাটা দেহ অশুচি হয়ে রয়েছে। তোমরা দু'জনে খেলেই আমার খাওয়া হবে। না, না, তুমি কিছু ভেবো না বিষণ, উপোস করার অভ্যাস আমার চিরকালই আছে। ছেলেবেলায় শিব রাত্রির উপোস, বার-ব্রতের উপোস আমার ঠাকুমার সঙ্গে কত করেছি।

বিষণ বুঝতে পারলে বৌঠানকে অনুরোধ করা বৃথা। গরুর গাড়ীতে বসে কিছুতেই তিনি খাবেন না। তাই খোকাকে তার খাবার ভাগ করে দিয়ে নিজেও কোঁচড় ভর্তি মুড়ি-মুড়কি নিয়ে খেতে বসে গেল।

খোকা খেতে খেতে বললে—মুড়িগুলো খুব মুচ্‌মুচে এনেছ বিষণখুড়ো—

বিষণখুড়োও খুশী মনে জবাব দিলে—আরে খোলাতে গরম গরম ভাজছে যে।

তারপর একটু থেমে বললে—হ্যাঁ, ভালো কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম। পাকা সবরী কলা পেলাম কয়েকটা। নিয়ে এসেছি। নাও খোকা—তুমিও খাও, আমিও খাই। মুড়ি-মুড়কির সঙ্গে পাকা সবরী কলা বেশ ভালোই লাগ্‌বে।

খোকা কলা খেতে খেতে বললে—একটা মজা দেখেছ বিষণখুড়ো ? তুমি খাচ্ছ, আমি খাচ্ছি—সামনে বলদ দু'টো দিব্যি খড় চিবুচ্ছে, শুধু মা-ই চুপচাপ বসে আছে। তার কপালে আজ বিধাতা পুরুষ খাবার জোটায় নি।

মা উত্তর দিলেন—দূর বোকা ছেলে ; বললাম না, তোরা খেলেই আমার খাওয়া হ'ল।

ওদের দু'জনের খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর বিষণখুড়ো আবার বলদ দু'টিকে জুতে দিলে গাড়ীর সঙ্গে।

হেলতে দুলতে গাড়ী আবার এগিয়ে চললো, গাঁয়ের পথ ধরে।

পথের দুই ধারে হাট তখন খুব জমে উঠেছে।

গাড়ী চালাতে চালাতে বিষণখুড়ো বললে—শোনো খোকা এখানে পুকুরের জল নাই বা খেলে। পথে যেতে যেতে যদি 'টিপ-কল' পাওয়া যায় সেইখানে দিব্যি তেষ্টা মিটিয়ে নেবে।

খোকা উত্তর দিলে—সেই ভালো।

মা বললেন—কলা খাবার পর কিছুক্ষণ জল খেতে নেই। পরে সুবিধে মত জল খেলেই হবে।

গাড়ী আবার এগিয়ে চলে তার গতিতে। এইবার সকলেই বেশ সহজ হয়ে উঠেছে।

মনের বেদনাটা একটু যেন দূরে সরে গেছে। বিষণখুড়ো গাড়ী চালাতে চালাতে গান ধরল—

"এই ঘাটে লাগাইয়া নাও
দুঃখের কথা কইয়া যাও
ওরে ও রঙ্গীলা নায়ের মাঝি—ঈ—"

মা দেখ্‌ছেন—পথের দুই ধারে চির পরিচিত মানুষ জন।

ওদের ত' কোনো পরিবর্তন হয় নি !

তবে তাদের মাথায়ই বা কেন এমনভাবে বাজ ভেঙ্গে পড়ল?

বিধাতা পুরুষ কি কেবল দুঃখ দিতেই তাদের এই ভুবনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ?

ছোট্ট খোকার মনেও নানা কথা জাগছিল।

—এই ত' যতদূর চোখ যায় কত রকমের বাড়ি চোখে পড়ছে। কারো পাকা বাড়ি, কারো টিনের ঘর, কারো ছইয়ের ঘর, আবার কারো খড়ের ঘর। কারো ঘর একদিকে হেলে পড়েছে, দু'তিনটে বাঁশ দিয়ে প্যালা দিয়ে রেখেছে। সামনে বাগান, পেছনে পুকুর, মরাই ভরা ধান কারো বাড়িতে, সামনের পুকুরে দলে দলে হাঁস সাঁতার কাট্‌ছে। ছাগল, ভেড়া এখানে-ওখানে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে ; ছেলের দল উদোম গায়ে আপন মনে খেলাধূলা করে বেড়াচ্ছে। কোনো কোনো বাড়ির চালে অনেক লাউ-কুমড়ো ফলে আছে। সিম গাছ হাওয়ায় দুলছে। একটা গাছকে জড়িয়ে ধরে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। কোথায়ও বা পানের বরজ। কেমন সবুজ পানের পাতাগুলো। রোদ্দুরে ঝক্‌ঝক্‌ করছে। দাওয়ায় বসে বুড়োরা মনের আনন্দে তামাক টান্‌ছে, গল্প-গুজব করছে, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি রসিকতা করছে। কিন্তু ওদের মতো কারো বাড়ি ত' আগুনে পুড়ে যায় নি ! ভগবানের এ কি রকম বিচার খোকা বুঝতে পারে না। মা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল, সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত করল। কত কষ্ট করল, উপোস করল,—তাতে কি ফল হ'ল !

খোকা আপন মনে ভাবে, কিন্তু কোনো কূল-কিনারা পায় না।

ওদের গরুর গাড়ী অজানা পথে এগিয়ে চলে। পথে একটা টিপ-কল পাওয়া গেল। মেয়েরা কাপড় কাচছে, বাসন ধুচ্ছে। বিষণখুড়ো নীচে নেমে গেল। গাড়ীর ভেতর একটা লোটা ছিল, ভালো করে মেজে নিল, খোকাকে এনে জল দিল। বললে—টিপ-কলের জল, ভারী মিষ্টি আর ঠাণ্ডা ; এইবার খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে নাও।

খোকার খাওয়ার পর বিষণখুড়োও এক লোটা জল ঢক্‌ঢক্‌ করে খেয়ে ফেল্‌ল। বলদ দু'টোকেও জল খাইয়ে নিল।

তারপর আবার গাড়ী ছেড়ে দিল। গাড়ী এগিয়ে চলে ধীর মন্থর গতিতে—বিষণখুড়োর গলায় বেলাশেষের গান।

রোদের তেজ এরই মধ্যে অনেক নরম হয়ে এসেছে। বিষণখুড়ো গাড়ী চালাতে চালাতে একজন হাটুরেকে শুধোলে—হ্যাঁগো, বলতে পারো—বন-তুলসী গাঁ-টা আর কত দূর?

লোকটা একটু থেমে উত্তর দিলে—তোমরা বন-তুলসী গাঁয়ে যাবে বুঝি ? এই সামনের দীঘল মাঠটা পেরুলেই ত' বন-তুলসী গ্রাম। ওই যে দু'টো তাল গাছের ফাঁক দিয়ে একটা সাদা শিব-মন্দির মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—ওইটেই হ'ল গে তোমার বন-তুলসী গ্রাম। তা' বন-তুলসী গ্রামে কার বাড়িতে যাবে তোমরা ?

বিষণখুড়ো মায়ের মুখের দিকে তাকালো—

মা ধীরে ধীরে বললেন—ত্রিলোচন ঠাকুরের বাড়ি।

হাটুরে লোকটি বললে—ও, ত্রিলোচন ঠাকুরের বাড়ি ? তিনি ত' বহুকাল দেহ রেখেছেন। তা ছেলে দু'জন এখন দিব্যি লায়েক হয়েছে। রম্‌রমা সংসার। বড় ছেলে ইস্কুলের মাষ্টার, আর ছোট ছেলে ক্ষেত-খামার, জোত-জমি দেখে। ওদের অনেক ধানী জমি আছে। সংসারে মা লক্ষ্মীর কৃপা আছে।

মা কি নিশ্চিত হবার একটি নিঃশ্বাস ছাড়লেন?

বিষণখুড়োর গাড়ী দ্রুত বেগে এগিয়ে চললো। সেই বড় মাঠটা পেরোতে না পেরোতেই সূয্যিমামা পাটে বসলেন।

ত্রিলোচন ঠাকুরের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতে গাঁয়ের লোকেরা সদর দরজার দিকটা দেখিয়ে দিলে।

গাড়ী গিয়ে একেবারে বার-বাড়ির উঠোনের কাছে হাজির হ'ল।

একদল ছেলেমেয়ে খেলাধূলা করছিল। একটা গরুর গাড়ীকে ঢুকতে দেখে তারা এসে ভিড় জমালো। ঠিক সেই সময় বড় পিসি প্রদীপ নিয়ে উঠোনে নেমে আসছিলেন।

মা ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে প্রণাম জানালো। বললে—বড়দি, আমরা সব খুইয়ে এতদিনে তোমার কাছে ছুটে এসেছি—

এতক্ষণ বাদে বোধকরি মায়ের দুই চোখ জলে ভরে গেল। বড় পিসি প্রদীপ ধরে একবার মায়ের মুখখানি দেখলেন। তারপর একটি মেয়ের হাতে প্রদীপ দিয়ে তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠলেন।

—এ কি চেহারা হয়েছে তোর বৌ ? আমার সোনার ভাইটি যেদিন চলে গেল—সেইদিনই বুঝেছি তোদের কপাল পুড়ল। কতবার ভেবেছি ছুটে যাই। কিন্তু তোর ওই সাদা সিঁথি দেখতে যেতে পারি নি বৌ। তুই যে আপনার জন মনে করে ছুটে এসেছিস তাতেই আমি শান্তি পাচ্ছি—বৌমারা কোথায় গেলে গো ? আমার ভাইবৌকে একেবারে পুকুরঘাটে নিয়ে যাও। স্নান করে আসুক। মুখখানা যে একেবারে শুকিয়ে গেছে। এই বুঝি আমার সোনা ভাইটির ছেলে ? বড় পিসি খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'আমি তোর বড় পিসি'।

তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সব শুনবো সব বলব। আমাদের দুঃখের কি আর শেষ আছে ?'

বারো

মায়ের চোখের জল যেন বড় পিসির জন্যেই জমা হয়েছিল। বড় পিসি যত কাঁদেন, মা তত চোখের জল ফেলেন। রাত বেড়ে যায় তবু ওদের দুজনের কথা যেন শেষ হয় না।

সেদিন সন্ধ্যায় মা স্নান আহ্নিক করে সামান্য কিছু মুখে দিয়েছেন। খোকা গরম গরম মাছের ঝোল ভাত খেয়ে শুয়ে পড়েছে।

বড় পিসি রাগ করে বলেছেন, এরকম পাখীর আহার করলে ত' চলবে না বাপু। তোমাদের দুজনকেই শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমার গোয়ালে কত গরু, কাল সকালে সব দেখাবো। বুঝলে খোকা, দুধ খেলেই দু'দিনে শরীর মোটা-সোটা হয়ে উঠবে। খোকা, আজ তুই ঘুমিয়ে পড়। কাল সকালে বাড়ির সবাইকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের বাড়ির সব কিছু দেখাবো। এখন আমরা দুটিতে একটু সুখ-দুঃখের কথা কই।

খোকা তো ঘুমুতেই চায়।

কিন্তু কিছুতেই ওর ঘুম আসে না। জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেখানে আলাদা হয়ে একটি তারা জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে।

ওইটি কি ওর বাবার চোখ ?

ওদের দুঃখের শেষ নেই দেখে ওই তারার চোখও কি জলে ভরে উঠেছে? খোকা কিছুতেই বুঝতে পারে না !

বাইরে একটানা ঝিঁঝিঁ পোকা ডেকে চলেছে।

ঝোপে-ঝাড়ে—গাছের মাথায় অগুন্তি জোনাকীর আলো। ওই জোনাকীর দল কি খুঁজে বেড়াচ্ছে কে জানে !

এই যে বড় পিসির বাড়ি খোকা এলো, এখানে কত লোকজন, রম্‌রমা গম্‌গমা সংসার। সবাই খোকাকে কি চোখে দেখ্‌বে কে জানে ! ভালোবাসবে ত' খোকাকে সকলে?

একটা টিক্‌টিকি ডেকে উঠল, ঠিক্-ঠিক্-ঠিক্ ! টিক্‌টিকিরা কি সবসময় ঠিক কথা বলে ?

অনেক দূরে বোধ হয় গ্রাম ছাড়িয়ে জঙ্গলের ভেতর একদল শেয়াল ডেকে উঠল।

ওরা কি রাতের প্রহর গণনা করছে ? একদল বাদুড় ডানা ঝাপটে চলে গেল !

জানালা দিয়ে খোকা তাদের কালো ডানার ছবি দেখতে পেলে।

মা আর বড় পিসি তখনো মনের ব্যথা কথায় প্রকাশ করে চলেছে।

ওরা বোধহয় মনে করছে খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে, মা তখন বড় পিসিকে চুপি চুপি বলছে, শোনো বড়দি, আমি আর কিছু চাইনে। তুমি আমার খোকাকে শুধু মানুষ করে গড়ে তোলো। ও ত' তোমারও বাপের বাড়ির বংশের শেষ প্রদীপ। ওকে অকালে নিভতে দিও না তুমি। ও যেন লেখা পড়া শিখে মানুষ হতে পারে—এই ব্যবস্থা শুধু করে দিও বড়দি।

বড়পিসি শুধু মাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, তুই কিচ্ছু ভাবিসনে বৌ। তোরা যখন আমার কাছে এসে পড়েছিস, তখন তোদের আর কোনো ভাবনা নেই। আমার সোনা ভাইয়ের একমাত্র ছেলেকে কি আমি বানের জলে ভাসিয়ে দিতে পারি?

রাত গভীর হয়েছে।

কারো মুখে আর কোনো কথা নেই।

ঘরের কোণের ভীরু-প্রদীপটি রজনীর শেষ প্রহরের শীতল হাওয়ায় কখন নিভে গেছে কেউ তার খোঁজ রাখে না।

কয়েকটি ছেলেমেয়ের কলহাস্যে খোকার ঘুম ভেঙে গেল। খোকা তাকিয়ে দেখলে, অনেক রোদ্দুর উঠে গেছে। বাইরে সোনালী আকাশ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আর তার বিছানার চারপাশে একদল ছেলেমেয়ে কোলাহল করে বলছে, চল, আমাদের সঙ্গে আমাদের নতুন খেলাঘরে।

বড় পিসি এগিয়ে এসে বললেন, দাঁড়া, আগে তোদের সবাইকার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দি—

ছেলেমেয়ের দল হুল্লোড় করে বললে, পরিচয় আর কি করিয়ে দেবে ঠামা ? আমাদের একজন খেলার সাথী বাড়ল এই ত'—

বড় পিসি বললেন, সে ত' ঠিক কথা। তবে কে কাকে কি বলে ডাক্‌বি সেটা ঠিক করে নিতে হবে না ?

বড় পিসি ফোক্‌লা দাঁতে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, খোকা হচ্ছে তোদের একটা ছোট্ট কাকু। আচ্ছা, তোরা সবাই ওকে সোনা কাকু বলে ডাকিস।

কি মজা ! কি মজা ! একেবারে সোনা কাকু ! ছেলেমেয়ের দল একেবারে আহ্লাদে আটখানা।

বড় পিসি বললেন, দাঁড়া, তোরা অমন ছট্‌ফট্‌ করিস নে। শোন খোকা এদিকে আয়, এই যে দেখছিস লক্ষ্মী মেয়েটি, এর নামও লক্ষ্মী।

খোকা শুধোলে, 'আমি কি ওকে লক্ষ্মীদি বলব ?'

বড় পিসি ফোক্‌লা দাঁতে আবার হেসে উঠলেন। বললেন, 'দুর বোকা ছেলে,তুই তো সোনাকাকু হলি ওদের। ওরা তোর ভাইপো ভাইঝির দল। আচ্ছা আমার সঙ্গে আয় সবাইকে চিনিয়ে দিচ্ছি। আমার দুই ছেলে, ভবন আর লগন।

ছেলেমেয়ের দলও একটা মজা পেয়ে গেল।

ওরাও ওদের নতুন-পাওয়া সোনাকাকুকে কেন্দ্র করে, ঠামার সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল করতে করতে এগিয়ে চললো।

বড়পিসি বললেন, 'এই আমার বড় ছেলের ঘর। ভবন আছিস রে—

ভবন বেরিয়ে আসতে বড়পিসি বললেন, খোকা, ভবনকে প্রণাম কর। ও হ্ল তোর বড়দা। ওদের ইস্কুলেই তোকে ভর্তি হ্তে হবে। ভবন খোকাকে কাছে ডেকে আদর করলেন, বললেন আমাদের মামাতো ভাই। বেশ, বেশ, ভর্তি করে দেবো আমাদের ইস্কুলে।

ছোট ভাই লগন উঠোনে দাঁড়িয়ে। কামলারা উঠোনে চাল শুকোতে দিয়েছে। তিনি তাই তদারক করছেন। মহা ব্যস্ত বাগিস মানুষ। চারদিকে তার দৃষ্টি। পায়রা, হাঁস, ছাগলের দল এসে চাল না খেয়ে ফেলে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন।

বড়পিসি বললেন, খোকা। এই তোমার ছোড়দা,—প্রণাম করো।

লগন বললে, থাক্ ,থাক—কাল সন্ধ্যায় এলে বুঝি তোমরা ? যাও ওদের সঙ্গে খেলাধুলো করো গে।

বড় পিসি এইবার খোকাকে নিয়ে অন্দর মহলের দিকে এগিয়ে চললেন।

এটাকে রান্না বাড়িও বলা চলে।

তখনি রান্না বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেছে।

বামুনদিদি দুটো উনোনে রান্না সুরু করে দিয়েছে। বড়পিসি খোকাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন।

বললেন—এই তোমার বড় বৌঠান, আর এই তোমার ছোট বৌঠান। দুজনকে প্রণাম করো—

খোকা এগিয়ে গিয়ে দুই বৌঠানকে প্রণাম করলে। বড় বৌঠান বললে তোমরা সবাই বসে যাও। সকাল বেলার জল খাবার খেয়ে নাও। ভাত খেতে দেরী হতে পারে। লক্ষ্মী ছুটে গিয়ে খোকার হাতে একটি ঘটি এনে দিলে। খোকা দাওয়ার এক কোণে গিয়ে ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে নিলে।

প্রত্যেকের নামে একটি করে বেতের ছোট ধামা, আর একটি করে বাটি।

সার সার কাঠের পিঁড়ি পাতা আছে।

সবাই তাতে সার দিয়ে বসে গেল।

লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ বড়দার ছেলেমেয়ে, মন্টু আর সন্টু ছোড়দার ছেলেমেয়ে।

কে ওদের সোনাকাকুর গা ঘেঁসে বস্‌বে তাই নিয়ে ছোটদের মধ্যে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল।

বড় পিসি বললেন, খোকা তুই লক্ষ্মীর কাছে বোস। সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে। পিসির বাড়ি নতুন এসেছিস বলে লজ্জা করিস নি যেন।

লক্ষ্মী বললে, —মা, সোনাকাকুর ছোট বেতের ধামা আর বাটি দাও—

বড় বৌঠান উত্তর দিলেন, দেখে শুনে নে না লক্ষ্মী। আমার কি মরবার ফুরসৎ আছে ? কুট্‌নো কুট্‌তে কুট্‌তে উঠে এসেছি।

লক্ষ্মী গিয়ে ওদের সোনাকাকুর জন্যে বেতের ধামা আর কাঁসার একটা বাটি নিয়ে এলো।

ছোট বৌঠান সবাইকে খাবার ভাগ করে দিচ্ছেন। ছোট্ট বেতের ধামাগুলিতে মুড়ির মোয়া আর সবরী কলা। বাটিতে বাটিতে ঢেলে দেয়া হল গরম দুধ। মেখে নিয়ে খেতে হবে।

এই হল সকাল বেলার বাল্যভোজ। লক্ষ্মী গিন্নি বান্নির মতো বললে, 'বেশ ভালো করে বাটিতে মেখে নাও সোনাকাকু। খাওয়ার পর আমরা তোমায় ভালো করে গোটা বাড়িটা দেখিয়ে নিয়ে আস্‌বো—

ছোটদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বেশীক্ষণ সময় লাগেনি। বিশেষ করে যখন তাদের একটি নতুন সাথী জুটে গেছে। গোটা বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখাতে হবে ! কার কি সম্পত্তি আছে খেলাঘরে, সব নতুন মানুষটিকে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। এর মোহ কি কিছু কম ?

বড় পিসি বললেন, লক্ষ্মী, তোদের সোনা কাকুকে নিয়ে সব কিছু দেখিয়ে আনবি। এইবার আমি চলি—

খোকা মনে মনে ভাবলে, সকাল থেকে মাকে একবারও দেখেনি। নিশ্চয়ই বড় পিসির কাছে-কাছেই আছে মা ! হয়ত বা সন্ধ্যা-আহ্নিক করছে। কিন্তু এখন ছোটর দলকে এড়িয়ে একবার মার কাছে যাওয়া চল্‌বে না।

ওরা তাহলে হয়ত দুয়ো দেবে। তাই খোকা চট্‌পট্ ওদের সঙ্গে সকালবেলার খাওয়া শেষ করে নিলে।

হাত মুখ ধুয়ে একেবারে লক্ষ্মীর হাতের পুতুল হয়ে সবাইকার সঙ্গে বেরুতে হল পিসির বাড়ি প্রদক্ষিণ করতে।

বলা বাহুল্য, কার্তিক, গণেশ, মন্টু, সন্টু সবাই ওকে ঘিরে এগোতে লাগলো।

লক্ষ্মী বললে, চল সোনাকাকু, সকলের আগে তোমায় আমাদের শিব মন্দির দেখিয়ে আনি!

সুন্দর একটি সাদা শিব মন্দির একটি বিরাট জলাশয়ের ধারে তার ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।

লক্ষ্মী বলে, আমাদের বাড়ির সব কাজে আগে শিব মন্দিরে প্রণাম করে যেতে হবে। এ বাড়িতে কারো বিয়ে হলে নতুন বৌ এসে আগে এই শিব মন্দিরে প্রণাম করবে। কেউ যদি কোনো কাজে বিদেশে যায় তা'হলে এই শিব মন্দিরে প্রণাম করে রওনা হতে হবে। বাড়ির বৌরা রোজ সন্ধ্যায় এই শিব মন্দিরে প্রদীপ দেয়। শিব রাত্রির সময় এখানে তিন দিন ধরে মস্ত বড় মেলা হয়। বাড়ি শুদ্ধু সকলেই একদিন উপোস করে।

তারপর এই দিকে এসো সোনাকাকু। এই দেখ আমাদের অতিথিশালা। বাইরে থেকে অতিথি-ফকির-সাধু-সন্ন্যাসী এলে এইখানে থাকে। তিন দিন পর্যন্ত তার এই ঘরে থাকতে পারবে।

এইবার এইদিকে-ডাইনে এসো। এই হচ্ছে আমাদের মণ্ডপ ঘর। এখানে দোল দুর্গোৎসব-বাসন্তী-সরস্বতী সব রকম পূজো হয়। আমাদের পুরোহিত ঠাকুর আছেন তিনি এসে পূজো করেন। আমরা সব পূজোতে অঞ্জলি দিই। তুমিও আমাদের সঙ্গে অঞ্জলি দেবে ত' ?

—এই যে দেখছ সার সার সব গোল ঘর—এটা আমাদের গোলাবাড়ি। এখানে সারা বছরের ক্ষেতের ধান তোলা হয়।

এইবার আমাদের গোশালা দেখ্‌বে এসো। অনেক গাই-বলদ আছে আমাদের। ওদের বোধহয় মাঠে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গেছে। দু'জন রাখাল আছে তাদের দেখা শোনা করবার জন্য। একজনের নাম বিন্দু, আর একজনের নাম সিন্ধু। এমন হাসাতে পারে তারা! পরে ওদের দেখতে পাবে তুমি।

খোকা ছোটর দলের সঙ্গে এগিয়ে চলে। কিন্তু মনে নানারকম প্রশ্ন জাগে।

বিষণখুড়ো কোথায় গেল ? সে কি তার গরুর গাড়ি নিয়ে আজ সকালেই চলে গেছে ?

ওদের কাছে সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারে না খোকা। কেমন যেন লজ্জা করে। ওরা কি ভাববে।

ছেলেমেয়েদের দল ওকে নানান জায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছে।

—ওই যে খোপ খোপ কাঠের বাক্সগুলি দেখছ, ওখানে আমাদের পায়রাগুলি থাকে। নীচের দিকে থাকে হাঁসের দল। ওরা সব আমাদের সরোবরে সাঁতার কেটে বেড়ায়।

লক্ষ্মী বললে, কাকার ইচ্ছে ছিল, হাঁসের সঙ্গে অনেক মুরগীও পুষবে। কিন্তু ঠা'মা রাজী হয় নি বলে—মুরগীর খাঁচাগুলি অমনি খালি পড়ে আছে—

লক্ষ্মী ওদের রথতলাটাও ঘুরিয়ে নিয়ে এলো। কাঠের রথ একটি উঁচু টিনের ঘরের নীচে রয়েছে। রথের সময় বাইরে টেনে নিয়ে আসা হবে রথটিকে। কত লোক মিলে এই রথের রশি টানবে।

লক্ষ্মী বললে, আর যা কিছু বাকি রইল তোমায় পরে দেখাবো সোনাকাকু। এইবার তুমি আমাদের খেলাঘর দেখ্‌বে এসো।

বাড়ির একান্তে চারদিকে ইঁটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা সুন্দর নিরিবিলি একটি জায়গা। ওপরে খড়ের চালা। পাশে খানিকটা খোলা জায়গা একটি গাছের ডালে দোলনা ঝুলছে।

লক্ষ্মী বললে, আমরা এখানে রোজ দোল খাই। খেলাঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে খোকা দেখলে নানাধরনের মাটির আর কাঠের পুতুল থাক্-থাক্ সাজানো রয়েছে। রান্না বাড়ার জন্য ছোট ছোট থালা, গেলাস, বাটি, কুটনো কোটবার বঁটি, শিল, নোড়া—কোনো কিছুরই অভাব নেই। আর এক কোণে দুটো ছোট ছোট উনুন।

লক্ষ্মী বললে, ওখানে আমাদের খেলাঘরের রান্না হয়। তারপর একটু থেমে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, কিছুদিন বাদেই আমার মেয়ের সঙ্গে মন্টুর ছেলের বিয়ে। আমরা খুব ঘটা করেই বিয়ে দেবো। তখন কিন্তু সোনাকাকু তোমায় খুব খাটাখাট্‌নি করতে হবে।

তেরো

বিষণখুড়ো তার গরুর গাড়ী নিয়ে নিজের গাঁয়ে ফিরে গেছে। আর তার দেখা পাওয়া যাবে না।

যদিও মা বলে দিয়েছে, মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যেতে—কিন্তু বিষণখুড়োও ত' তার সংসারে একা মানুষ—তাকে ক্ষেত-খামার দেখতে হয়, হাট-বাজার করতে হয়, ছেলেপিলের অসুখ-বিসুখ আছে। তবু যে ওদের জন্য এত করত,—সেটা নেহাৎ প্রাণের টানে।

বড়পিসির বাড়িতে এসে মাকেও সব সময় কাছে পাওয়া যায় না। মস্ত বড় বাড়ি, বাড়ির লোক ছাড়াও, অনেক আত্মীয়-স্বজন, আশ্রিত মানুষ এই বাড়ির ভেতর নিত্যি পাত পাতে।

সেই জনারণ্যের মধ্যে খোকা কি তার মাকে হারিয়ে ফেলল ? এখানকার ছেলেমেয়েদের দল ছেড়ে আলাদা করে মায়ের কাছে দু'দণ্ড বসতে ওর লজ্জা করে।

তাই মার আর ওর মধ্যে ফাঁকটা একটু বেড়ে যেতে লাগ্‌ল।

খোকার নিজের গাঁয়ে যে সব ছেলেরা তার খেলার সাথী ছিল—তাদের কথা ওর সব সময়ই মনে হয়।

কিন্তু সে ভালো করেই জানে যে, ওদের সঙ্গে আর তার দেখা হবে না। যদিও অনেক দূরে সে চলে আসে নি, তবু সেটা খুবই সত্যি কথা—যেখানে তাদের একটি ঘরও নেই—সেই ছেলেবেলার খেলাঘরে ওরা ফিরে যাবে কি করে ? আপন মনে বসে বসে খোকা এই সব কথা ভাবে।

লক্ষ্মী এগিয়ে এসে শুধোয়, একি সোনাকাকু তুমি একা-একা বসে এত কি ভাবছ ? এদিকে আমার ছেলের বিয়ে যে এগিয়ে এলো। একটা বিয়ের পদ্য কিন্তু তোমায় লিখে দিতে হবে—

খোকা অবাক হয়ে বলে, কবিতা ? কিন্তু আমি ত' কবিতা লিখতে পারি না।

লক্ষ্মী কিন্তু নাছোড়বান্দা বলে, তা হলে একটি ছোট্ট পাল্‌কি তৈরি করে দাও। পাল্‌কি নইলে বর কি করে আসবে ? আমাদের সেই যে দুই রাখাল—বিন্দু আর

সিন্ধু তাদের বলেছিলাম। ওরা কি বললে জানো ? ওরা বললে, বর আসবার সময় ওরা দুটি ঢোলক আর ভেঁপু বাজাবে। কিন্তু বর আসবার পালকির কি হবে বলনা সোনাকাকু ?

খোকা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

বড় পিসি এসে তার বড় ছেলেকে বলেন, ওরে খোকা এই খোকাটাকে তুই আজই তোদের ইস্কুলে ভর্তি করে দে—

বড়দা হেসে উত্তর দেন, ঠিক ! ঠিক !! কার্তিক-গণেশের সঙ্গে গেলেও আজ আমার সাথে ইস্কুলে যাবে। ওকে আজই ভর্তি করে দেবে। মা, বড় বৌকে বলো, ওকে যেন তাড়াতাড়ি খাইয়ে দেয়—

বড়দা আর কার্তিক-গণেশের সঙ্গে খোকা দুপুর বেলা এখানকার ইস্কুলে গিয়ে হাজির হল।

খোকা তবেই বই-টই কিছু নিয়ে আসতে পারে নি। তাই এখানকার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মশাই ওকে ডেকে নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করে জেনে নিলেন—সে কোন ক্লাসে পড়বার উপযুক্ত।

বাঙলা বানান জিজ্ঞেস করলেন, কয়েকটা অঙ্ক কষতে দিলেন, আর দেখে নিলেন—হাতের লেখাটা কেমন ?

তারপর বড়দাকে ডেকে বললেন, ছেলেটি কার্তিক-গণেশের ক্লাসেই ভর্তি হতে পারবে।

শুনে বড়দা খুব খুশী হলেন।

হেডমাষ্টার মশাই খোকার নাম জিজ্ঞেস করলেন—খোকা জবাব দিল—শ্রীকুর্শল ভট্টাচার্য।

তখুনি ইস্কুলের কেরাণীকে ডেকে হেডমাষ্টার মশাই ওর ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর পাঠিয়ে দিলেন— কার্তিক-গণেশদের ক্লাশে।

কার্তিক আর গণেশ ওকে নিজেদের ক্লাসে পেয়ে খুব খুশী হল।

শুধোলে, সোনাকাকু, তুমি আমাদের সঙ্গে পড়বে ? তা হলে ত' ভারী মজা হবে। বসো এসে—আমাদের দু'জনের মাঝখানে এসে বোসো। আমাদের বইয়েতেই কাজ চলে যাবে তোমার। এই নাও না—ধরো—

বিকেলবেলা বাড়িতে ফিরে বড়দা সবাইকে শুনিয়ে দিলেন—খোকার ভর্তি হবার কথা। মাকে ডেকে খুশী হয়ে বললেন, বুঝলে মামী, তোমার ছেলে পড়াশোনায় খুব চট্‌পটে। হেডমাষ্টার মশাই যা-যা জিজ্ঞেস করেছেন—সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে। ওকে কার্তিক-গণেশের ক্লাসেই ভর্তি করে নেওয়া হল।

মা বললেন, তুমি একটু দেখো বাবা। ছেলেটাকে তোমরাই মানুষ করে গড়ে তোলো—আমি আর কি বলব ?

বড়দা আনন্দের সঙ্গে উত্তর দিলেন, সে তুমি কিচ্ছু ভেবো না মামী। তোমার ছেলেটা বেশ মেধাবী আছে। ও পড়াশোনাতে বেশ ভালো হবে বলেই মনে হয়।

ইতিমধ্যে লক্ষ্মীর পুতুল-মেয়ের বিয়ে খুব ধুমধাম করে শুরু হয়ে গেল।

ওদের খেলাঘরটা বেশ ভালো করে সাজানো হল। এ সব ব্যাপারে ছোড়দার খুব উৎসাহ। দেবদারু পাতা আর লাল নীল কাগজ রাশি রাশি এনে দিল ছোড়দা। তাই দিয়ে ছেলেমেয়েদের তোরণ দ্বার তৈরি করে, রঙীন কাগজের শেকল দুলিয়ে দিলে চার দিকে। বিন্দু আর সিন্ধু সব কাজ ফেলে ঢোল আর ভেঁপু বাজাতে শুরু করে দিল।

ছোড়দা বললে, ছোট ছোট রসমুণ্ডি তৈরি করিয়ে এনে দেবো ! তাই সবাইকার হাতে হাতে বিলি করে দিতে হবে—

লক্ষ্মী এসে তার কাকার কাছে আবদার ধরলে, কাকু, আমার মেয়ের বিয়েতে গরম গরম খিচুড়ি আর আলুর দম করতে হবে—নইলে নিমন্ত্রিতেরা সব খাবে কি ?

ছোড়দা অবাক হয়ে বললে, অ্যাঁ ! বলিস কিরে ? একেবারে গরম খিচুড়ি আর আলুর দম ? তা হলে চুপি-চুপি বলে দিচ্ছি তোকে—সোজা বামুন দিদিকে গিয়ে ধর। ও ছাড়া আর কেউ এই যজ্ঞ ব্যাপার সামাল দিতে পারবে না।

অবশেষে সত্যি ধুমধাম করে লক্ষ্মীর মেয়ের সঙ্গে মন্টুর ছেলের বিয়ে হল।

বাদ্যভাণ্ড বাজল, পথ পরিষ্কার করে সাজানো হল। সেই সরোবরে কাছ থেকে মিছিল করে—শিব মন্দির হয়ে বরের পালকি চলে এলো খেলা ঘরে। বিয়ের সময় কতরকম বাজী পোড়ানো হল। সবাইকে পাতা পেতে বসিয়ে খাওয়ানো হল—গরম খিচুড়ি, আলুর দম আর রসমুণ্ডি।

পুতুল মেয়ে যখন শ্বশুর বাড়ি চলে গেল—লক্ষ্মী কেঁদেকেটে একেবারে বুক ভাসিয়ে দিলে।

লক্ষ্মীর মা বললেন, আজকালকার মেয়েগুলো পেট থেকে পড়েই ডেঁপো হয়ে ওঠে। নইলে লক্ষ্মীর পেটে পেটে এত দুষ্টুমী! আমিও লক্ষ্মীর বিয়ের সময় এমন চোখের জল ফেলতে পারবো না।

তারপর মার দিকে তাকিয়ে বড় বৌঠান ফোঁড়ন দিলেন। আসলে ওর মাথা খাচ্ছে ঠাকুরপো। অত আদর দিলে মেয়ে ত' আহ্লাদী হবেই।

যাই হোক্—লক্ষ্মীর মেয়ের বিয়ে ত' বেশ ভালো ভাবেই চুকে গেল। পরদিন এঁটো পাতা নিয়ে কাক, বেড়াল আর কুকুরদের মচ্ছব শুরু হয়ে গেল।

তাই দেখতেও ছোটদের আবার ভীড় জম্‌ল।

কথাটা নাকি অনেকদিন থেকেই ঠিক হয়েছিল। বড়পিসি তীর্থ ভ্রমণে যাবেন। এক বছর ধরে তিনি ভারতবর্ষের বহু আসর ঘুরবেন। এইবার তীর্থ ধর্ম না করলে

পরে ত' তিনি আরো স্থবির হয়ে পড়বেন। পথের সাথী হবেন—বাড়ির বড়ছেলে। মানে খোকার বড়দা।

খোকা দেখল, মা আসতে বড় পিসি যেন হাতে চাঁদ খুঁজে পেলেন।

তিনি একদিন নিরিবিলি মাকে কাছে ডেকে বললেন, শোন বৌ, তুই এসে পড়েছিস্ বেশ ভালই হল। আমার তীর্থের পথে তুই আমার সঙ্গে থাকবি, তাই আমি বল-ভরসা পাবো। এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি ত' ছেলে কোন দিক সামলাবে বল !

মা বেশ কুণ্ঠিত হয়ে উত্তর দিলে, বড়দি, তোমার সঙ্গে তীর্থ করতে পারা ত' সত্যি ভাগ্যের কথা। আমি নিঃসম্বল অনাথা বিধবা। একটা কানাকড়িও আমার হাতে নেই। তোমার পথের সাথী হলে যে আমার স্বর্গসুখ হবে সেকথা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু বড়দি, আমায় তুমি ভুল বুঝনা, খোকাকে রেখে আমি স্বর্গেও যেতে পারবো না। এখন আমার ধ্যান-জ্ঞান-আরাধনা ওই বংশ-প্রদীপকে মানুষ করে গড়ে তোলা। তারপর তোমার দয়ায় সুদিন যদি সত্যি আসে তাহলে খোকাই আমাকে তীর্থ করিয়ে আনবে। তুমি আমায় ক্ষমা করো বড়দি, এখন আমি কোনো তীর্থেই যেতে পারবো না।

মায়ের মুখে এই কথা শোনার পর বড়পিসি আর মাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপিড়ি করে নি।

তারপর এক শুভদিন দেখে বড়পিসি তীর্থের পথে রওনা হল।

বড়দা মায়ের সঙ্গে গেলেন। তিনি ইস্কুল থেকেও লম্বা ছুটি নিয়েছেন। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ছুটি আরো বাড়িয়ে নেবেন। গ্রামের ইস্কুল—ধরতে গেলে একরকম নিজেদেরই বিদ্যালয় ! তাই ছুটি বাড়িয়ে নিতে কোনো অসুবিধে হবে না।

পুরোহিত ঠাকুর এসে শুভযাত্রার শুভ-লগ্ন ঘোষণা করলেন।

যাত্রার প্রাক্কালে বড়পিসি বাড়ির জনে জনে সবাইকে ডেকে আশীর্বাদ জানালেন।

বড়দা ছেলেমেয়েদের সকলকে ডেকে ভালো করে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে বললেন। ছেলেরা ইস্কুলে পড়ে। আর মেয়েরা পড়ে মাষ্টার মশায়ের কাছে বাড়িতে। বড়দা খোকাকে আলাদা করে বললেন, খুব মন দিয়ে সব বিষয় পড়বে। সামনেই ষান্মাসিক পরীক্ষা। ঐ পরীক্ষায় ভালো ফল দেখাতে হবে।

খোকা মুখে কোনো কথা বলতে পারলে না। মাথা নীচু করে বড়দার পায়ের ধূলো নিলে।

সারা বাড়ির লোক এসে বড় পিসিমা আর বড়দার পায়ের ধূলো নিলে।

ওঁরা দুজনে শিব মন্দির আর মণ্ডপে প্রণাম করে গরুর গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। মাল-পত্র আগেই তুলে দেওয়া হয়েছিল। এখান থেকে গরুর গাড়ি যাবে সোজা রেল ষ্টেশনে।

চৌদ্দ

সারা বাড়ির দায়িত্ব পড়ল এখন ছোড়দার ওপর। গাড়ি আস্তে আস্তে বড় সড়কের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছোড়দার কাজ যেমন বেশী—তেমনি তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে ভালো বাসেন।

কোথায় দল বেঁধে বেড়াতে যেতে হবে, কোন পুকুরে জল ফেললে বড় চিতল আর রুই মাছ ধরা যাবে, কোন্ নদীর ধারে বন-ভোজন করতে হবে—এই সব মজাদার ব্যাপারে তিনি নিজেই ছোটদের উস্‌কে দিতেন। তারপর তাদের নিয়ে হৈ-চৈ-এ মেতে উঠতেন।

বড় বৌঠান আবার এসব হুল্লোড় বেশী পছন্দ করতেন না। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার ক্ষতি করে তাদের কাকার সঙ্গে নানা তাণ্ডবে সময় নষ্ট করুক—এ ব্যাপারটা তার দুই চক্ষের বিষ। তবু তিনি বাড়ির ছোট কর্তার সঙ্গে পেরে ওঠেন না। শুধু বলেন, ঠাকুরপোই বেশী, আস্কারা দিয়ে দিয়ে ছেলেমেয়েদের মাথা খাচ্ছে।

ছোট বৌঠান কিন্তু মজা দেখেন আর আপন মনে হাসেন। নিজের বড় জায়ের সঙ্গে স্বামীর এই কপট-কলহ আর মান-অভিমান বাড়ির ছোট বৌ বেশ মজা করে উপভোগ করেন।

কিন্তু এই মান-অভিমান অনেক সময় তেতো হয়েও ওঠে।

কিছুদিন বাদেই বিদ্যালয়ের ষান্মাসিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হল।

কার্তিক আর গণেশ আনন্দে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরে এসে সবাইকে সমস্বরে জানিয়ে দিলে, আমাদের সোনাকাকু আমাদের ক্লাসে একেবারে প্রথম হয়েছে। কি মজা—কি মজা !

এর আগে ওরা দুভাই ক্লাসে প্রথম আর দ্বিতীয় হত। কিন্তু এখানে নতুন এসেই যে ওদের সোনাকাকু সবাইকে হটিয়ে দিয়ে বেশী নম্বর পেয়ে একেবারে প্রথম হয়ে গেছে—এইটেই দুই ভায়ের গর্বের কারণ। ও পাড়ার গোবিন্দ যে প্রথম হতে পারেনি—তাতেই ওরা মহা খুশী।

ছোড়দা এই খবর শুনে ছোটদের নিয়ে একটি আনন্দ আসর বসিয়ে দিলেন। রসগোল্লা কিনে এনে সবাইকার মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

ছোট বৌদিও খুশী হয়ে বললেন, আমি তোমাদের একদিন পরমান্ন খাওয়াবো।

খোকা মনে মনে ভেবেছিল—বড়বৌঠানও তাকে ডেকে আদর করবেন আর সবাইকার সঙ্গে এই আনন্দ ভাগ করে নেবেন।

কিন্তু ঘটনাটা ঘটল একটু অন্যরকম। একদিন সন্ধ্যাবেলা বড় বৌঠান খোকাকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা খোকা, তুই এখানে এসেই পরীক্ষায় একেবারে প্রথম হয়ে গেলি। কারো খাতা দেখে টুকিস নি ত' ?

খোকা এইরকম কথা শুনে অবাক হয়ে বড় বৌঠানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললে না, না টুকবো কেন ? আমি যা জানতাম—তাই লিখেছি—

ওর ছোট্ট মনে এই রকম একটি ধাক্কা যে খাবে খোকা তা আদপেই ভাবতে পারেনি।

যখন সবাই আনন্দ করছে, আশীর্বাদ জানাচ্ছে, আর মিষ্টি কথা বললে সেই সময় বড় বৌঠানের এই জাতীয় কথা খোকার চোখে জল এনে দিয়েছিল।

সে মাকেও এ সম্পর্কে কোনো কথা জানাতে পারল না ! তা ভারী লজ্জা করতে লাগ্‌লো। অথচ মজা এই যে কার্তিক-গণেশ কিন্তু তাদের সোনাকাকুর সাফল্যে মহা খুশী। ইস্কুলে আর বাড়িতে এই শুভ-সন্দেশ সকলকে জানিয়ে দিয়ে লাফাতে লাগ্‌লো।

গভীর রাত্রে যখন কেউ জেগে থাকে না—

সারা বাড়িটা একেবারে নিশুতি হয়ে যায়—তখন মা ওর চুলে আঙুল চালাতে চালাতে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন, শোন খোকা, তোকে মানুষ হতে হবে। এই বড়পিসি তোকে আশ্রয় দিয়েছেন, আমার মাথা গোঁজবার ঠাঁই দিয়েছেন, সে কথা কোনো দিনের তরে ভুলবি নে। লেখাপড়া শিখে তুই যখন সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠবি—তখনই তোর এই দুখিনী মায়ের সব দুঃখ দূর হবে। ওপর থেকে তোর বাবা আমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছেন। তার বড় ইচ্ছে ছিল—তাদের খোকা মানুষ হবে,—দশজনের একজন হবে,—আর সকলের দুঃখ দূর করবে।

খোকা শুধু মায়ের কথাগুলো চোখ বন্ধ করে শুনে যায়। কোনো উত্তর করে না।

তার নিজের আকাঙ্ক্ষাও বড় কম নয়। সে চায় প্রতি বছর ক্লাশে প্রথম হয়। ইস্কুলের পড়া শেষ করে শহরে যাবে, সেখানে কলেজের পড়ায় সকলকে ছাড়িয়ে একেবারে ওপরে উঠে যাবে। আরো ওপরে উঠবার সিঁড়ি তাকে খুঁজে নিতে হবে। সে যখন সত্যিকারের মানুষ হবে—তখন অনেক টাকা রোজগার করবে। গরীব-দুঃখীর সব অভাব দূর করবে ; আর মাকে নিয়ে ভারতের সব তীর্থে ঘুরে বেড়াবে। ওর জন্যেই মা বড়পিসির সঙ্গে তীর্থে যায় নি। সে কথা খোকা শুনেছে। বড় হয়ে মায়ের মনোবাঞ্ছা সে পূর্ণ করবেই।

মায়ের মুখের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে কখন যে খোকা ঘুমিয়ে পড়ে—নিজেই সে ভালো করে বুঝে উঠতে পারে না।

সকাল হতেই লক্ষ্মী এসে বলে, সোনাকাকু, আজ আমাদের খেলাঘরে নবান্ন উৎসব হবে, তোমায় কিন্তু পুরোহিত হতে হবে—

খোকা হাসতে হাসতে উত্তর দেয় আমি পুরোহিত, তাহলেই তোমাদের নবান্ন উৎসব হয়েছে আর কি ! তা কি করতে হবে শুনি ? টিকিতে জবাফুল বেঁধে ধেই ধেই করে নৃত্য করতে হবে ?

লক্ষ্মী উত্তর করে, বাঃ তা কেন ? আজ আমাদের বাড়ি নতুন ধান উঠবে। মা, কাকিমা যেমন ধানের শিষ বরণ করে নেবে, নবান্ন তৈরি করবে—নতুন চাল, নতুন গুড় আর নারকেল কোরা দিয়ে,—তেমনি আমরাও নবান্ন উৎসব করবো আজ আমাদের খেলাঘরে। কাকাবাবু বলেছেন, নতুন গুড়, ধানের শিষ, নারকেল-সব আমাদের আলাদা করে দেবেন। পুরোহিত ঠাকুরকে ত' মারা আট্‌কে রাখ্‌বে। কাজেই বুঝতে পারছ,—আমাদের খেলাঘরের জন্যে একজন আলাদা পুরোহিত চাই। আর তুমি ছাড়া আমাদের খেলাঘরের পুরোহিত আর কে হবে শুনি ?

লক্ষ্মীর এতগুলি দরকারী কথা শুনে খোকা হেসে ফেলে। তারপর উত্তর করে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। আজ আমাকে নামাবলী গায়ে দিয়ে, টিকিতে ফুল বেঁধে যাত্রার দলের পুরোহিত সাজতে হবে। তা সে ত' ও বেলার ব্যাপার। শোন লক্ষ্মী, আজ ইস্কুলে বেশ শক্ত শক্ত অঙ্ক আছে। সেইগুলো আগে শেষ করে ফেলি—

লক্ষ্মী খুশী হয়ে বললে, আচ্ছা সোনাকাকু, এখন তুমি শান্ত, সুবোধ ছেলে হয়ে পড়াশোনা করো—ও বেলা ইস্কুল থেকে ফিরে এসে কিন্তু না বলতে পারবে না।

খোকা উত্তর দিলে, না রে,—না বলব কেন ? যখন আমাদের লক্ষ্মী দিদিমণির আদেশ—

ভারী অসভ্য তুমি সোনাকাকু—ভারিক্কি চালে বেণী দুলিয়ে লক্ষ্মী জবাব দেয়।—জানো ত' নবান্ন উৎসবের পর আবার মায়ের সত্যনারায়ণের পূজো আছে। সে আবার মহা ঘটা করে পূজো। কত লোক প্রসাদ নিতে আসবে দেখো—! আমারও আজ অনেক কাজ—মাবার ফুরসৎ অবধি নেই।

লক্ষ্মী চোখে-মুখে গম্ভীর হবার চেষ্টা করে এবার সত্যি সত্যিই চলে যায়।

খোকা—মানে, ইস্কুলের কুশল—সেদিন-ইস্কুলে পৌঁছে দেখে—পড়াশোনার দিকে কারো বিশেষ দৃষ্টি নেই। সবাই মনের আনন্দে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কুশল এর কারণ কিছু বুঝতে পারলে না। কার্তিক, গণেশকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে তারা এক গাল হেসে ফেললে। বললে, তাহলে সোনাকাকু, আজ সারা গাঁয়ে নবান্নের উৎসব কিনা,—তাই ইস্কুলেও আজ পড়াশোনা আদৌ হবে না।

খোকা শুধোলে, তবে কি হবে শুনি ? কার্তিক-গণেশ চোখ টিপে বললে, আজ কবাডি প্রতিযোগিতা। একদিকে আমরা ছাত্রদল, আর অন্যদিকে মাষ্টার মশাইরা। বুড়ো বুড়ো মাষ্টার মশাইরা অবশ্য খেলায় নামবেন না। তবে যাদের বয়েস কম, তারা দেখো, কেমন মালকোঁচা মেরে এগিয়ে আসেন—

খোকা বললে, তোরা খেলগে যা, আমি বসে বসে সবাইকার খেলা দেখি—

কার্তিক-গণেশ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগলো। বললে, সেটি হচ্ছে না সোনাকাকু, মনিটর যে তোমার নাম আগেই দিয়ে দিয়েছে—

খোকা সত্যি অবাক হয়। সে কিছু জানল না, আর মনিটর দিব্যি তার নাম দিয়ে দিল খেলাতে। অবশ্য খোকা মনে-মনে জানে-কবাডি খেলা সে বেশ ভালোই জানে—

কার্তিক-গণেশ মিথ্যা কথা বলে নি ! তার খানিক বাদেই ছাত্র খেলোয়াড়দের নাম ডাকা হয়। আর তার মধ্যে কুশল ভট্টাচার্যর নামও আছে।

কুশল প্রথমে একটু আপত্তি জানিয়েছিল,—আমি নতুন এসেছি, খেলা ত' ভালো জানি না ! কিন্তু কি ছাত্রদল, আর কি মাষ্টারদল কেউ তারা আপত্তির কথা শুনলেন না!

কাজেই বাধ্য হয়ে কুশলচন্দ্রকে খেলার মাঠে-মালকোঁচা মেরে নামতেই হল।

একজন প্রবীণ মাষ্টারমশাই রেফারী হলেন। মাষ্টার মশায়ের দলে যারা নামলেন, তাঁদের বেশীর ভাগই কম বয়সে। আর ছেলের দলে-বড় ছোট মিশিয়ে আছে। খেলা শুরু হবার একটু পরেই কুশল একজন মাষ্টার মশায়ের ঠ্যাং পাক্ড়ে ধরে একেবারে শুয়ে পড়ল। তখন অন্যান্য ছেলেরা এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ফলে সেই মাষ্টার মশাই 'মার' হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুশলের জয়ধ্বনি উঠল গোটা খেলার মাঠে। কুশলকে দেখতে ছোট খাটো হলে কি হবে—কবাডি খেলায় পাক্ড়ে ধরতে সে একেবারে ওস্তাদ।

এর পর ছাত্রদলের কয়েকজন 'মার' হয়ে গেল। তখন সবাই চিৎকার করতে লাগল—কুশল কি করছ ? গায়ে মাটি মেখে চট্পট পাক্ড়ে ধরো—

সকলের সমবেত সোল্লাস ধ্বনিতে কুশলও বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

যে করেই হোক ছাত্রদলেব মান রাখতে হবে। তারপর খেলা আবার জমে উঠল।

কুশল পর পর কয়েকজন মাষ্টার মশাইকে কুপোকাৎ করে ফেললে।

তখন ওদের দলে ডাকবার আর কেউ নেই। রেফারী বাঁশি বাজিয়ে ঘোষণা করলেন—এই খেলায় ছাত্রদলেরই জয় হয়েছে।

তখন ছাত্রেরা সবাই মিলে কুশলকে কাঁধে করতে গেল। কিন্তু দেখা গেল, কুশলের একটি পা মচ্কে গেছে।

যাক্না পা মচ্কে—ও ত' এখন ছেলেদের কাঁধে উঠে প্রসেসনের সামিল হবে। নাই বা হাঁটতে পারল—ওকে এখন কাঁধে নিয়ে যাবে ছেলের দল।

কার্তিক আর গণেশ পাশে পাশেই চলছিল। ওরা ফোড়ন কেটে বললে, কেমন মজা সোনাকাকু—!

ছেলের দল সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে অবশেষে ত্রিলোচন ঠাকুরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। কার্তিক-গণেশ আগে থেকেই খবরটা দিয়ে রেখেছিল। তাই দেখা গেল—বাড়ি শুদ্ধু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ওরই আসার প্রতীক্ষায়।

ছোড়দা এগিয়ে ছিলেন—সবার আগে। তিনি হাসতে হাসতে খোকাকে বললেন, কিরে, দারুণ খেলে একেবারে পা মচ্‌কে এলি ? তা ভাবনা নেই। লক্ষ্মী চুন-হলুদ গরম করে বারে বারে লাগিয়ে দেবে'খন। পা মচ্‌কা দুদিনে পালাতে পথ পাবে না।

খোকা ছেলেদের কাঁধ থেকে নেমে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ভেতর বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো—

লক্ষ্মী এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরে বললে, কিন্তু এ কি কাণ্ড করে এলে সোনাকাকু, এখন এই ন্যাংড়া পুরোহিত নিয়ে কি করে আমাদের খেলাঘরের নবান্ন উৎসব হবে ?

ছেলের দল ভারী মজা পেলে লক্ষ্মীর কথায়। তারা সমস্বরে সোল্লাসধ্বনি করে উঠল—"জয় ন্যাংড়া পুরোহিতের জয়।"

ছোড়দা এইরকম হৈ-হুল্লোড়ই পছন্দ করেন। তিনিও চিৎকার করে সবাইকে ডেকে বললেন, ওহে ছেলের দল, তোমরা কেউ পালিয়ে যেওনা যেন। আমাদের এখানে আজ নবান্ন উৎসব। তারপর ন্যাংড়া পুরোহিতের পূজো। তারপর সত্য নারায়ণের পূজো। তোমরা সকলে প্রসাদ নিয়ে—তারপর বাড়ি ফিরবে।

ছেলের দল আবার ন্যাংড়া পুরোহিতের জয়ধ্বনি করে উঠল। লক্ষ্মী ততক্ষণে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে খোকাকে বসালে। বললে, তুমি এখানে চুপচাপ বসে থাকো সোনাকাকু। আমি চুণ-হলুদ গরম করে নিয়ে আসি। কয়েকবার লাগালেই সেরে যাবে'খন।

মা একবার এসে খোকাকে দেখে গেলেন। কিন্তু বাড়ি ভর্তি মানুষ। তা ছাড়া একই দিনে নবান্ন-উৎসব আর সত্যনারায়ণের পূজো। বাড়ির বৌয়েরাও ব্যস্ত। তাই তিনি তাড়াতাড়ি সেই দিকেই চলে গেলেন।

মায়েব ইচ্ছে ছিল-দু'দণ্ড ছেলের কাছে একটু বসেন। আর ছেলের বাসনা ছিল—মা একটু হাত বুলিয়ে দিক—তা হলেই ব্যথা অর্ধেক সেরে যাবে।

কিন্তু সব সময় সব মনোবাসনা পূর্ণ হয় না। তাছাড়া ছেলেমেয়ের দল—তাকে ঘিরে রয়েছে—

কার্তিক বললে, তুমি মাষ্টার মশাইদের খুব ঘায়েল করেছ সোনাকাকু—

গণেশ বললে, আচ্ছা, মাষ্টারদের মধ্যে আর কারো পা ভাঙেনি ?

কার্তিক বললে, ভাঙ্‌লেই কি আর কেউ মুখ ফুটে বলবে ? মন্টু জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা সোনাকাকু, তুমি যে কবাডি খেলায় এত নাম করলে-তা মাষ্টার মশাইরা তোমায় কোনো পুরস্কার দেবে না ?

সন্টু মুখ চট্‌কে ফোড়ন কাটলে, যদি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার থাকে, তবে কিন্তু আমাদের বাদ দিলে চল্‌বে না—

এমন সময় লক্ষ্মী এসে ঘরে ঢুকল। বললে, তোরা এখন সব ঘর খালি করে দে। আগে আমাদের ন্যাংড়া পুরোহিতকে ভালো করে তুলতে হবে।

লক্ষ্মী গরম গরম চুণ-হলুদ গোলা খোকার পায়ে লাগিয়ে দিলে। বললে, চুপটি করে এখন খানিকক্ষণ শুয়ে থাকো। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ঘর খালি করে দিলে।

একটু বাদে খোকা বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ বড়বৌঠান আর মায়ের কথা শুনে থমকে দাঁড়ালো। ওরা ঘরের ভেতর ছিলেন, তাই খোকাকে দেখতে পেলেন না। বড় বৌঠান বললেন, দেখ মামী, হঠাৎ বড় মুস্কিলে পড়ে গেছি। রান্নার বামুন দিদি এইমাত্র ঝগড়া করে পুঁটুলি নিয়ে চলে গেল। এদিকে কাজের বাড়ি—নবান্ন-উৎসব, তার ওপর আবার সত্যনারায়ণের পূজো। এখন হেঁসেলে কে যায় বলত ? আমি ত' মহা বিপদেই পড়ে গেলাম !

মা উত্তর দিলেন, তাতে তুমি এত কিন্তু কিন্তু করছ কেন বড় বৌ ? আমিই হেঁসেলে যাচ্ছি। তুমি সত্যনারায়ণের পূজোর দিকে চলে যাও।

খোকা আর ওখানে দাঁড়ালে না। কিন্তু কেন যেন তার দুই চোখ এই দুখিনী মায়ের জন্যে জলে ভরে এলো !

তবে কি সেই কথাই ঠিক যে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে ?

ওদিকে বাইরে থেকে ছেলের দল হল্লা করে কুশলকে ডাক্‌ছে। বলছে, ভারী ত' একটু পা মচ্‌কেছে—তারই জন্যে ওকে একেবারে বিছানা নিতে হবে নাকি ?

লক্ষ্মী এসে বললে, ইস্কুলের ছেলের দল তোমায় চিৎকার করে ডাক্‌ছে সোনাকাকু। তুমি এক কাজ কর—আমাকে ভর দিয়ে বাইরের ঘরে চলো। সেখানে তোমার জন্যে একটি চেয়ার দিয়ে এসেছি। ওদের সঙ্গে গল্প গুজব করলে ওরা শুন্‌বে বলছে !

খোকা উত্তর দিল, সেই ভালো লক্ষ্মী। একা একা এঘরে আর কতক্ষণ বসে থাক্‌বো?

লক্ষ্মী বললে, আমি মাঝে মাঝে গিয়ে গরম চুণ, হলুদ লাগিয়ে দিয়ে আসব। দেখবে, রাত্তিরের মধ্যেই ব্যথা একেবারে কমে গেছে।

বাইরের ঘরে ছেলেদের হুল্লোড়, গান, আবৃত্তি আর বক্তৃতা পুরোদমেই চলেছে। সে গিয়ে ওদের মধ্যে নিজের ঠাঁই করে নিল। কিন্তু মায়ের শুক্‌নো মুখখানি তার কেবলি মনে পড়তে লাগল।

পনের

বড় পিসির চিঠি এসেছে।

তারা প্রথমে গয়াধামে গিয়েছেন। সেখানে পূর্বপুরুষদের নমে পিণ্ডিদান করা হয়েছে। বড় পিসি মাকে জানিয়েছেন, তাঁর ভাইয়ের নামেও বড়দা পিণ্ডি দিয়েছেন। ভাগ্‌নের ত' শ্রাদ্ধের আর পিণ্ড দেবার অধিকার আছে।

বড় পিসি বাড়ির বৌদের আরো জানিয়েছেন যে, এখন তাঁরা নানা তীর্থে ঘুরতে থাকবেন ? তাই সব সময় চিঠি লিখতে পারবেন না। বাড়ির কেউ যেন সেজন্য ব্যস্ত না হয়। ছোড়দাকে লিখেছেন, বাড়ির কর্তা এখন সে। কাজেই সকল দিকে যেন তার দৃষ্টি থাকে। বড়দা খোকাকে আর বাড়ির ছেলেমেয়েদের মন দিয়ে পড়াশোনা করতে বলেছেন।

এদিকে লক্ষ্মীর কথাই সত্যি হয়েছে। বারে বারে চুণ-হলুদ গরম করে লাগানোর ফলে খোকার পা মচ্‌কানো একেবারে সেরে গেছে।

সে আবার কার্তিক-গণেশের সাথে ইস্কুলে যেতে শুরু করেছে।

ওদিকে ইস্কুলে একটা মজাদার ব্যাপার ঘটে গেল। মাষ্টারমশাইরা ছেলেদের কাছে কবাডি খেলায় হেরে গেছলেন বলে সবাই মিলে চাঁদা করে ছাত্র খেলোয়াড়দের একদিন ভোজ খাইয়ে দিলেন।

আর একটি ভালো খবর আছে। বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারমশাই কুশলকে একদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ওকে পড়াশোনার অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। ওর সব কথা শুনে তিনি ভারী খুশী হয়েছেন। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর নাকি যথাযথ হয়েছিল। সব শেষে ওকে আনন্দ সংবাদটি জানিয়ে দিলেন। কুশলের ষান্মাসিক পরীক্ষার ফল দেখে আর খেলাধূলার নমুনা দেখে ইস্কুল কমিটি খুব খুশী হয়েছে। তারা কুশলকে একটি ফ্রিশিপ দিয়েছেন। এখন থেকে কুশলের আর কোন মাইনে দিতে হবে না। যদিও তার বড়দা বলেছিলেন, কুশলের ইস্কুলের মাইনে তিনিই দেবেন। এখন হেডমাষ্টার মশাই আনন্দের সঙ্গে জানালেন, মাইনে আর ওকে দিতে হবে না। ও এখন থেকে ইস্কুলের ফ্রি ছাত্র হয়ে গেল।

সেইদিনই বাড়ি ফিরে কুশল তার মাকে কথাটা জানিয়ে দিলে। আর হেডমাষ্টার মশাই তার সঙ্গে কথা বলে যে খুব খুশী হয়েছেন সে কথাও জানিয়ে দিতে ভুললো না।

মায়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখে তিনি কোনো কথা বললেন না। তবে খোকা একবার তাকিয়ে দেখ্‌লে, মায়ের দু'চোখ আনন্দে আর গর্বে জলে ভরে উঠেছে।

বড়বৌঠানও খুব খুশী হয়েছেন বলে মনে হল। তিনি এগিয়ে এসে খোকাকে আদর করে বললেন, বাহাদুর ছেলে খোকা, সংসারের কয়েকটি টাকা কেমন কায়দা করে বাঁচিয়ে দিলে।

ছোড়দার উল্লাস কিন্তু অন্য রকম।

লাফিয়ে উঠে ছোড়দা বললে, খোকা বাহাদুর ছেলে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাকে ত' কিছু মিষ্টি মুখ করাতে হচ্ছে সবাইকে। বাজার থেকে ফেরবার সময় দেখে এলাম হরলাল ময়রার দোকানে গরম গরম রসগোল্লা ভাজ্‌ছে—! কি বলিস তোরা কার্তিক-গণেশ ?

কার্তিক-গণেশ লাফিয়ে উঠে বললে, তুমি ঠিক কথা বলেছ কাকু। সোনাকাকুর এই সাফল্যে আমাদের বাড়ির একটা সুনাম হল ত' ? কাজেই গরম-গরম রসগোল্লা যদি— মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লক্ষ্মী বললে, এ ব্যাপারে আমার দাবী সকলের আগে।

—কেন ? কেন ?

প্রশ্ন এলো চারদিক থেকে—

লক্ষ্মী গম্ভীর চালে উত্তর দিলে, আমিই ত' বারে বারে চুণ-হলুদ গরম করে সোনাকাকুর পায়ে লাগালাম। তাতেই ত' তার পা একেবারে ভালো হয়ে গেল। তার জন্যেই ত' সোনাকাকু ইস্কুল যেতে পারল। আর ইস্কুলে গেল বলেই ত' হেডমাষ্টার মশাই ওকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন নানা প্রশ্ন। আর তার ফলেই ত' এই ফ্রিশিপ।

লক্ষ্মীর কথা বলার ধরণ শুনে বাড়ি শুদ্ধু সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

এতক্ষণ সন্টু-মন্টু কোনো কথাই বলেনি। ওরা শুধু ঘরের এককোণে বোকার মতো দাঁড়িয়েছিল।

এইবার এগিয়ে এসে ফোড়ন কাট্‌লে, বা-রে ! আমরা বুঝি বানের জলে ভেসে এলাম ? সোনাকাকু, খেলা জিতে ফিরে আসবার পর আমরা জামা-জুতো খুলে রাখিনি ? পায়ে গরম তেল মালিশ করে দিইনি ?

মা এইবার বললেন, ঠিক ! ঠিক ! ওরাও ত' কাজের ছেলেমেয়ে—। অস্বীকার করবার কোনো যো নেই।

ছোড়দা তখন উঠে পড়ে বললেন, যে হেতু আমি এখন বাড়ির কর্তা, সেই জন্যে এই ছোটদের বাহিনী নিয়ে সোজা হরলালের দোকান আক্রমণ করবো— তারপর যা ঘটে ঘটুক—

ছেলেমেয়েদের দলকে একটা গরুর গাড়ীতে বসিয়ে নিয়ে ছোড়দা যেন রাজ্যি জয় করতে বেরিয়ে গেল ! ঘর ভর্তি মানুষ ওর কাণ্ড দেখে হাসতে লাগ্‌লেন !

ছোট বৌ বললে, সত্যি মামী, তোমার ছেলের অনেক গুণ। বড় হলে দেখবে ও ঠিক দশ জনের একজন হবে।

বড়বৌয়ের বোধ করি কথাটা পছন্দ হল না। তিনি একটু মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বললেন, বড় হলে কে কি মূর্তি ধরে মারমুখী হবে—তা কি আগে থাক্‌তে বলা যায় ? আর ঠাকুরপোর ওই এক কাণ্ড ! একে ত' নাচুনী বুড়ি—তাতে আবার ঢোলের বাড়ি ! দেখ আবার কয় হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে ফেরে ?

বড় বৌয়ের মুখে এই ধরণের কথা শুনে মায়ের মুখটা যেন শুকিয়ে গেল। তার ছেলের জন্য একটা সংসারে অকারণ অপচয় হোক—তা তিনি চান না। এ বাড়ির ছোট ছেলে সত্যি নাচুনী বুড়ি—একটা সুযোগ পেলেই হল—একেবারে হৈ চৈ বাঁধিয়ে দেবে ! খোকাই যেন অপরাধী এই ভাবে চুপচাপ সে বসে রইল।

কিন্তু যে চুপচাপ করতে জানেনা, সে কিন্তু একেবারে হৈ-হুল্লোড়ে বিশ্বজয় করে ফিরে এলো। দেখা গেল—একটু বাদেই গরুর গাড়ি ভর্তি হাসি মুখ শিশু কিশোর-কিশোরীর দল, —আর সেই সঙ্গে গরম গরম রসগোল্লা চার হাঁড়ি—

দূর থেকেই ছোড়দা সোল্লাস ধ্বনিতে যেন বাড়ি ঘর দোর কাঁপিয়ে তুলেছে—

—বৌঠান-আগে ছোটদের দাও। তারপর বাড়ির সবাইকে। ভালো কথা, মামীর জন্যে এক বাটি আলাদা করে রেখে দাও। উনি ত' আবার সবাইকার ছোঁয়া খাবেন না।

মা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে বললেন, না—না, আমার জন্যে মিষ্টির দরকার নেই। ছোটরা আনন্দ করে খাবে, আর তাই দেখেই আমরা খুশী। বাল্য-ভোজের মতো পবিত্র জিনিস আর কিছু আছে ? স্বয়ং বালগোপাল ত'। ওদের মুখ দিয়েই ভক্তের দেওয়া সব কিছু ভালো বস্তু আস্বাদন করে থাকেন।

—ছোড়দা বললেন, সেই ভালো কথা। এই চার হাঁড়ি রসগোল্লা ঠাকুর ঘরে প্রসাদ করে নিলেই হবে। বালগোপাল আস্বাদ নিন, আর আমরা সবাই প্রসাদ গ্রহণ করি। লক্ষ্মী, তুই কি বলিস ?

বড় বৌঠান মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, আর লক্ষ্মীকে নাচাতে হবে না, ও ত' নেচেই আছে। ওই যে কথায় বলে না, —জামাই পিঠে খাবে ? না, আঁচাবো কোথায় ?

ছোট বৌঠান এগিয়ে এসে বললেন, না-না, লক্ষ্মীর কি দোষ ? ও ওর সোনাকাকুর সাফল্যে কত আনন্দ পেয়েছে—তাই ত' নাচানাচি শুরু করেছে। ওই যাক হাঁড়িগুলো ঠাকুর ঘরে নিয়ে—

বড় বৌঠান কিন্তু এই প্রস্তাবে ফোঁস করে উঠলেন। বললেন, হুঁ। তুমি ভালো কথা বলেছ ছোট বৌ ! তা নইলে আর মিষ্টিগুলো নয়-ছয় হবে কি করে ? বলে এক রকম রাগ দেখিয়েই বড় বৌঠান আর এক দিকে চলে গেলেন।

মায়ের কথার ওপর লক্ষ্মী আর কোনো কথা বলতে সাহস করলো না। শুধু চুপি চুপি ছোট বৌঠানকে বললে, না বাপু, আমি হাঁড়ির ভার নিতে গিয়ে কি মার খাব ? কাকিমা, হাঁড়িগুলো ঠাকুর ঘরে নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা যা' হোক—তুমিই করো—

ছোটবৌ দেখলে, ছোটর দল মুখ শুকিয়ে সব এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে আছে !

গরম রসগোল্লার লোভ সাম্‌লানো শক্ত। কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হচ্ছে দেখে ওদের উৎসাহ ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। তবু একেবারে আশা ছাড়তে পারে না। তাই ছোট বৌঠানের আশে-পাশেই ওরা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তুলে ওদের ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাতে লাগ্‌লো।

শেষকালে ছোট বৌঠানই সব সমস্যার সমাধান করলেন। ঠাকুর ঘরে হাঁড়িগুলি প্রসাদ করিয়ে দিয়ে—ছোটদের মধ্যে রসগোল্লাগুলো বিলিয়ে দিতে লাগলেন।

কিন্তু যার জয়ে এই হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা'-তাকে ত' কোথায় দেখা যাচ্ছে না।

ছোট বৌঠান মন্টু-সন্টুকে ডেকে বললেন হুঁ ! নিজেরা ত' খুব গিল্‌ছিস্। কিন্তু যার

নাম করে এতগুলো রসগোল্লা এলো তাকে খাইয়েছিস ?

মন্টু-সন্টু উত্তর দিলে, ও ! সোনাকাকুর কথা বলছ মা ? সে' লজ্জা পেয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে।

খোকা ততক্ষণ ম্লানমুখে-রান্না ঘরে ঢুকে মায়ের হেঁসেল-ঠেলা দেখছে।

রান্নার বামুন দিদি চলে গেছে—সে কত দিন হল। কিন্তু মায়ের হেঁসেল ঠেলার কামাই নেই। বড় বৌঠান কি ইচ্ছে করেই সেদিন বামুন দিদিকে বাড়ি থেকে তাড়ালো?

খোকার ছোটমনে আজ শুধু এই প্রশ্ন !

ষোল

খোকা বুঝতে পারে। মা যেন একটু ভয়ে ভয়ে থাকেন এই বাড়িতে। যদি কিছু অঘটন ঘটে, যদি খোকাকে নিয়ে তার এই বাড়িও ছাড়তে হয়—তবে ছেলেকে মানুষ করবেন কি করে ?

বড় পিসির সাথে তীর্থ-ভ্রমণের এত বড় একটা সুযোগ মা ছেড়ে দিয়েছেন—শুধু খোকার পড়াশোনার কথা ভেবে,—সেটা খোকা বেশ বুঝতে পারে। কিন্তু তার ফল যে একেবারে উল্‌টোটি হবে সেকথা কে ভেবে রেখেছিল।

বড় পিসি নেই এখন বড় বৌঠানই বাড়ির গৃহিণী। তিনি যা ভালো বুঝবেন তাই হবে।

এখন খোকা বেশ বুঝতে পেরেছে যে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা বড় বৌঠান-ইচ্ছে করেই রান্নার বামুনদিদির সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর সাত তাড়াতাড়ি কাজ কর্মের অছিলায় মাকে নিয়ে হেঁসেলে ঢুকিয়েছে। দু' একজনের জন্যে রান্না অতি সহজেই করতে পারে মা। কিন্তু এ বাড়িতে পাত্ পাতার লোকের ত' অভাব নেই। যে রকম ভারী হাঁড়ি-কড়া-ডেকচি মাকে তুলতে হয়-তাতে খুব অল্প দিনের ভেতরই মা অসুস্থ হয়ে পড়বে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই বিপদ থেকে মাকে কে বাঁচাবে ? বড় পিসি থাক্‌লে নিশ্চয়ই বড় বৌঠান এই রকম ছল করে বামুন দিদিকে তাড়াতে পারত না।

ছোড়দা বাইরের হাজার ঝামেলায় ব্যস্ত। অন্দর মহলে কি ঘটছে—সে খবর তার কাছে হয়ত আদৌ পৌঁছোয় না।

বড় বৌঠানের আর একটি চমৎকার ব্যবস্থা আছে। পরিবেশনের সময় হয় তিনি নিজে এগিয়ে আসেন, আর না হয় লক্ষ্মী কিম্বা আশ্রিত কোনো মহিলাকে দিয়ে কাজ সারেন। ব্যস্তবাগীশ ছোড়দা জানতেই পারেনা—দিনের পর দিন কে এতগুলি লোকের রান্না করছে। ছোট বৌঠান লজ্জা পেয়ে দু'একদিন রান্নার কাজে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বড় বৌঠান অন্য কাজের অজুহাতে তাকে সরিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং মায়ের এ ব্যবস্থার যে কোন ওলট পালট হবে, তা আর নয়। কোনো বামুন দিদি যে আসবে, সে কথা ত' মনে হয় না।

খোকা সকাল-সন্ধ্যে পড়া শোনা করে, বিকেলে খেলার মাঠে যায়—, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে হৈ-চৈ করে, কিন্তু তার মনের ভেতরটা যেন পুড়ে যেতে থাকে।

তাদের এ দশা কেন হল ? অভাব ছিল তাদের মা-ছেলের ছোট্ট সংসারে। কিন্তু মনে কোনো অশান্তি ছিল না।

এখানে এসে সে পড়াশোনার ভালো সুযোগ পেয়েছে, খেলা-ধূলায় মেতে উঠতে পেরেছে, কিন্তু তার মনে এতটুকু শান্তি নেই। মাকে একটা সংসারের দাসী করে সে কি লেখাপড়া শিখ্‌তে চায় ? এ বাড়ির কাজের ধারা এমন যে, কারণে-অকারণে সারাটা দিন সবাই যেন চরকি পাক খাচ্ছে।

তার ফলে—গভীর রাত্তির ছাড়া মায়ের সঙ্গে ওর নিরিবিলি দেখা হয় না।

বড় পিসির ঘরেই ওরা-মা ছেলে থাকছে। বড় পিসি সেই ব্যবস্থাই করে গেছেন। তাতে ঘরটাও খালি থাকে না।

সারাটা দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর মা যখন ছেলেকে বুকের কাছে পান—তখন কত কথাই যে তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়—তিনি নিজেই বুঝতে পারেন না। অনেক কথা তাঁর বলবার থাকে বলে কোনো কথাই তিনি বলতে পারেন না। খোকাই বরং মাঝে মাঝে ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথা বলে,—চল না আমরা ফিরে যাই—

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মা উত্তর দেন, কোথায় যাবি খোকা ? আমাদের ঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল ! অভাগা না হলে কি এমন করে ঘর পোড়ে ?

খোকা কিন্তু একটু অবুঝ হয়। বলে, কেন মা, আমাদের বিষণখুড়ো আছে। সে ঠিক লোকজন জুটিয়ে একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর তৈরি করে দেবে। তাতে মা-ব্যাটার দিব্যি জায়গা হবে।

মা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন।

হয়ত কোনো প্রলোভনে তিনি ক্ষণে-ক্ষণে আন্দোলিত হয়ে ওঠেন। শ্বশুরের ভিটে, স্বামীর আবাস—কিন্তু ছেলের কথা ভেবে তিনি ক্ষণিক দৌর্বল্য মন থেকে দূর করে দেন। ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর করেন, নারে তা হয় না। একটুখানি কষ্ট করলে আমার কিছু হবে না। তোকে লেখা পড়া শিখে মানুষ হয়ে মায়ের দুঃখ দূর করতে হবে। এ কথাটি ভুলিস নে। তুই একদিনের জন্যেও ভুলিস নে।

রাত কত হয় কে জানে।

বাড়িশুদ্ধু লোক হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু মা আর ছেলের চোখে ঘুম নেই !

বাইরে একটা রাত জাগা পাখী হঠাৎ ডেকে ওঠে। খোকা বলে. তুমি ঘুমোও মা। আবার ত' সেই ভোর বেলা উঠে তোমায় হেঁসেল ঠেলতে যেতে হবে।

মা কিন্তু কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, সেজন্যে তোকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না খোকা। তুই শুধু তোর পড়াশোনার কথা ভাববি। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর বড় পিসি ফিরে এলে আর কোনো গোলমাল থাকবে না।

দুই অসহায় মানুষ একে অপরকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

ফলে, দুই জনের কারো চোখেই ঘুম আসে না।

বিদ্যালয়ে হেড্মাষ্টার মশাই প্রায়ই খোকাকে ডেকে পাঠান।

ওর ওপর তাঁর কেমন যেন অপত্য স্নেহ পড়ে গিয়েছে।

সেদিন তিনি ওকে ডেকে বললেন, কোনো কিছু পড়া বুঝতে অসুবিধে হলে তুমি সোজা আমার কাছে চলে আসবে—

খোকা উত্তর দিলে, হ্যাঁ স্যার, তা ত' আসতেই হবে। হেডমাষ্টার মশাই আবার বললেন. হ্যাঁ, শোনো কুশল, তোমার বড়দা এখন নেই. সেজন্যে কোনো ব্যাপারে এতটুকু কুণ্ঠিত হবে না। তোমার বই, খাতা-পত্র অভিধান যদি কিছু দরকার হয়— আমায় জানালে। আমি এই সব ব্যবস্থা করে দেবো।

কুশল মাথা নীচু করে বললে. নিশ্চয়ই আপনার কাছে চলে আসবো স্যার—

হেডমাষ্টার মশাই আবার তাকে উৎসাহিত করে বললেন, শোনো কুশল, ভালো করে লেখাপড়া শিখে মানুষ তোমাকে হতেই হবে. আমি তোমার বড়দার কাছে তোমাদের সব কথা শুনেছি। মায়ের দুঃখ তোমাকে দূর করতেই হবে। শোনো কুশল. আমিও খুব গরীবের ছেলে ছিলাম। চেয়ে-চিন্তে বই জোগাড় করে অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছি।

খোকা অবাক হয়ে তাদের প্রধান শিক্ষকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হেড মাষ্টার মশাই বললেন. হ্যাঁ, যে কথা বলতে তোমায় ডেকেছি সেই দরকারী কথাটাই ত' ভুলে বসে আছি—

কুশল আগ্রহের সঙ্গে শুধোলে, বলুন স্যার।

— শোনো কুশল. আমাদের এই বিদ্যালয় থেকে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে। ছেলেরা নিজেরাই নানা রকম বিষয়ে লিখবে। কেউ প্রবন্ধ লিখবে, কেউ গল্প লিখবে, কেউ ভ্রমণ কাহিনী বা কবিতা রচনা করবে। আবার যারা ছবি আঁকতে পারে তারা ছবি এঁকে দেবে এই ম্যাগাজিনে। তাহলে কেমন হবে বলত ?

কুশল উত্তর দিলে তাহলে ত' ভালই হয় স্যার। হেডমাষ্টার মশাই উত্তর দিলেন. একজন শিক্ষক তোমাদের সকল ব্যাপারে সাহায্য করবেন। আর ছাত্রদের পক্ষ থেকে তুমি দায়িত্ব নাও। তোমার হাতের লেখাটাও বেশ ভালো আছে।

কুশল আপত্তি করে বললে, আমি ত' স্যার নীচু ক্লাশে পড়ি,—আমার জ্ঞানই বা কতটুকু ? আপনি বরং ওপরের ক্লাশের কোনো ছেলের ওপর এই দায়িত্ব দিন।

প্রধান শিক্ষক বললেন, আচ্ছা, আমি ভেবে দেখছি—

সেদিন বিদ্যালয়ের ছুটির পর খোকাকে খেলার মাঠে যেতে হয়েছিল।

কবাডি খেলার কতকগুলি নিয়ম কানুন সে ছেলেদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

খেলতে খেলতে বয়েসে-বড়-খেলোয়াড়কেও কি ভাবে পাক্ড়ে ধরা যায় তারও অনেকগুলি কৌশল সে ছাত্রদের শিখিয়ে দিচ্ছিল। সব সময় ওৎ পেতে থাক্তে হবে মাঠের একটা কোণ থেকে।

এই সব শিখিয়ে সে যখন বাড়িতে ফিরে এলো, তখন তার দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে। ইচ্ছে ছিল বড় বৌঠানের কাছে গিয়ে সরাসরি খেতে চাইবে। তাই তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে পরিস্কার হয়ে খাবার ঘরে গিয়ে হাজির হল।

সেখানে দেখলে, বড় বৌঠান বাড়ির ছেলেমেয়েদের গরম লুচি ভেজে খাওয়াচ্ছেন। খোকাকে সেই অসময়ে ঢুকতে দেখে বড় বৌঠানের চোখের ভ্রূরু একটু কুঁচকে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, খোকা তুমি ঘরে গিয়ে একটু বোসো, আমি তোমার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি—

খোকা ধীরে ধীরে চলে এলো ঘর থেকে। কিন্তু লক্ষ্মীর এ ব্যবস্থা আদৌ মনঃপূত হল না। সে লাফিয়ে উঠে খোকার হাতটি ধরে বললে, বারে—সোনাকাকুকে আমাদের মতো গরম গরম লুচি ভেজে দাও মা ! ওর বুঝি ক্ষিদে পায় না!

বড় বৌঠান ভ্রূকুটি কুটিল নেত্রে একবার মেয়ের দিকে তাকালেন।

সতেরো

বড় পিসির এত বড় বাড়ি, বাড়ির ছেলেমেয়েরা সবাই সোনাকাকু বলতে পাগল. বাড়ির দুই কর্তা—বড়দা ছোড়দার তুলনা নেই। সংসারে যেন মা লক্ষ্মীর কৃপা উপচে পড়ছে। চারিদিকের বাগানে ফুলের হাসি, ফলন্ত গাছগুলি রসালো ফলের ভারে নত—চারদিকে সবুজের মেলা, আকাশের নীলে, মোহময় নদীর জলে বুঝি আনন্দের আমেজ...তবু খোকার মনে সুখ নেই।

বিদ্যালয়েও সে প্রধান-শিক্ষক থেকে শুরু করে সবাইকার শুভেচ্ছা আর প্রীতি পেয়ে ধন্য হয়েছে। তবু মনের অগোচরে একটি তীক্ষ্ণ কাঁটা বারে বারে তাকে পীড়া দিচ্ছে। তার মা কি তাকে মানুষ করার জন্য এমনি ভাবে তিল তিল করে মরণকে বরণ করে নেবে? দু বেলা এতগুলি লোকের রান্না করে মায়ের দেহের যা অবস্থা হয়েছে,—বয়েস অল্প হলেও খোকা তা বেশ বুঝতে পারে।

মাঝ রাত্তিরে খোকার ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেলে সে বেশ বুঝতে পারে—মায়ের ঘুম হচ্ছে না, শুধু বিছানায় শুয়ে এ-পাশ-ও-পাশ করছে।

এই যে দুই বেলা গন্‌গনে উনুনের ধারে বসে মাকে এতগুলি মানুষের জন্যে রান্না করতে হচ্ছে তাতেই এই অনিদ্রা রোগ জন্মেছে।

খোকা একথাও বেশ বুঝতে পারে যে, ছোড়দা বাড়ির ভেতরকার কোনো খবরই রাখে না। সেখানে একেবারে বড় বৌঠানের রাজত্ব। বড়পিসি থাকলে অবশ্য ব্যাপারটা আদৌ ঘটতে পারত না ! কিন্তু এখন পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া মায়ের বুঝি আর কোনো গতি নেই। এই কি তার চির দুখিনী মায়ের নিয়তি ?

খোকা ভেবে-ভেবে কোনো কূল-কিনারা পায় না। পড়াশোনায় সে মন বসাতে পারে না। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকমশাই তার ওপর কতখানি ভরসা করে বসে আছেন খোকা সে কথা বেশ ভালো করেই জানে। স্কুলে ক্লাশের পড়া দিতেগিয়ে এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে যে শেষ কালে নিজেই লজ্জিত হয়। এক এক দিন মাস্টার মশায়ের ডাকে সে চম্‌কে ওঠে। তাই ত' —পড়াশোনার সময় সে কি কথা ভাবছিল ? না—না, ক্লাশে পড়া দেবার সময় সে অন্য কথা ভাববে না। মা শুন্‌লে মনে বড় কষ্ট পাবে। তাঁর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা একেবারে বৃথা হয়ে যাবে। খোকা সমস্ত মন প্রাণ একত্র করে নতুন ভাবে সঙ্কল্প গ্রহণ করে।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে গিয়ে দেখে বাড়িতে একেবারে হুলুস্থূল কাণ্ড বেধে গেছে।

বড় বৌঠান সারা বাড়িময় একেবারে দাপাদাপি করে ফিরছেন।

—ও জিনিস হজম করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না—একথা আমি সরাসরি বলে দিচ্ছি। আমি ঠিক পেটের থেকে বের করে আন্‌বো।

স্কুল থেকে ফিরে খোকার বেশ ক্ষিদে পেয়েছিল। কিন্তু বাড়ির এই তপ্ত আবহাওয়া দেখে বড় বৌঠানকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না।

একবার ভাবলে লক্ষ্মীকে ডেকে খানিকটা মুড়ি-চিঁড়ে চেয়ে নেবে। কিন্তু আশে পাশে কাউকেই দেখতে পেলে না।

ওদিকে অন্দর মহলের কোলাহলটা কেবলি বেড়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় দেখা গেল, একটি ছোট ধামায় করে লক্ষ্মী মুড়ির মোয়া আর নারকেল নাড়ু নিয়ে আসছে। খোকা কিছু বলবার আগেই লক্ষ্মী বললে, শোনো সোনাকাকু, তুমি এই খাবার খেয়ে নাও। ইস্কুল থেকে ফিরে পেটে ত' কিছু পড়ে নি। তাই আমি বুদ্ধি করে নিজেই নিয়ে এলাম।

খোকা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা লক্ষ্মী, আজ বড় বৌঠান এত চটেছেন কেন ? কি হয়েছে বাড়িতে ? আমায় সব খুলে বলত।

লক্ষ্মী কৌতুক করে উত্তর দিলে, আজ তুমুল কাণ্ড। জানো সোনাকাকু, মা নাকি স্নান করার সময় তাঁর কানের মাকড়ি খুলে ইন্দারার ওপর রেখেছিল। তারপর বেমালুম ভুলে গেছে। খাওয়া দাওয়ার পর জানো ত' মা পান মুখে দিয়ে এক ঘুম লাগায়। বিকেলে উঠে চুল বাঁধতে গিয়ে আয়নায় তাকিয়ে দেখে কানে তাঁর মাকড়ি

নেই ! এখানে- খোঁজে ওখানে দেখে, সেই মাকড়ি দুটির আর সন্ধান পাওয়া যায় না। সেই থেকেই ত' মা গোটা বাড়িতে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে। বলে,—যে নিয়েছে তাকে বার করতে হবে। আমি বললাম, মা, এখুনি এত তোলপাড় করছ কেন ? আগে তোমার বাক্স, দেরাজ টেরাজগুলো ভাল করে খুঁজে পেতে দেখ। তোমার মাকড়ি সবাই চেনে। পেলে নিশ্চয়ই এনে ফেরৎ দিত।

—তা আমার কথা শুনে মা মারমুখী হয়ে তেড়ে আমার চুলের মুঠি ধরতে এলো। আমি ত' এক ছুটে পালিয়ে এসেছি। মা কেবলি এঘর-ওঘর দাপাদাপি করছে আর বলছে, বাইরের কেউ ত' আমার মাকড়ি নিতে আসে নি। ঘরের কেউ পেয়ে লুকিয়ে রেখেছে। দুধ দিয়ে আমি কালসাপ পুষেছিলাম।

লক্ষ্মী তার গালে একটা আঙুল রেখে বললে, শোনো কথা। এখানে কালসাপ কোত্থেকে এলো তা আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।

লক্ষ্মীর মুখে এইকথা শুনে খোকা একেবারে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল।

লক্ষ্মী তাকে ধমক্ দিয়ে বললে, তোমার আবার কি হল সোনাকাকু ? চট্‌পট মোয়া আর নারকেল নাড়ু খেয়ে নাও। সেই কখন স্কুলে গেছ—তোমার যে দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে সেকথা আমি বেশ বুঝতে পারি। কার্তিক-গণেশ আজ সকাল সকাল ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে এসেছে। ওরা বায়না ধরেছিল, ছোট কাকার সঙ্গে নৌকো করে ধান বিক্রী দেখতে যাবে। একটা বাগান থেকে নাকি নারকেলও পাড়া হবে।

লক্ষ্মীর মুখে সব কথা শুনে খোকার ক্ষিদে তেষ্টা যেন একেবারে উবে গেল। লক্ষ্মী এত আদর যত্ন করে খাবার ওর হাতে তুলে দিলে। কিন্তু সেই মোয়া আর নারকেল নাড়ু ওর গলা দিয়ে নাম্‌বে ?

লক্ষ্মী বললে, আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই সোনাকাকু ! এক্ষুনি ভাঁড়ার ঘর থেকে এবেলার রান্নার সব জিনিস-পত্র বের করে দিতে হবে। মা যা তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে—এখন ওর কাছে কেউ এগোতে সাহস করবে না।

লক্ষ্মী পা চালিয়ে ভাঁড়ার ঘরের দিকে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

এখন খোকা কি করবে ? লক্ষ্মীর দেওয়া খাবারও সে ফেলে দিতে পারছে না। সমস্ত মন-প্রাণ চাইছে মায়ের কাছে ছুটে যেতে। কিন্তু সেদিকেও ওর পা সরছে না।

একবার খেলার মাঠে যাবার দরকার ছিল। ছেলেরা আবার বার বার করে বলে দিয়েছে। এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে বড় বৌঠানের গলা আবার শোনা গেল।

—আমি সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি—, কেউ বাড়ি থেকে বেরোবে না। আমি আব্দুল ওঝাকে ডাকতে পাঠিয়েছি। সে এসে বাটি চালান দেবে। মাক্‌ড়ি আমাকে বের করতেই হবে—

খেলার মাঠে যাবে বলে খোকা উঠেছিল। কিন্তু বড় বৌঠানের ওই হুম্‌কি শুনে সে আবার একটা মোড়ার ওপর বসে পড়ল। আজ যে সে আবার খেলার মাঠে যেতে পারবে এমন ত' মনে হয় না।

এই সন্ধ্যাবেলাটা সে কি করে কাটাবে তাই আপন মনে ভাবতে লাগল।

মায়ের সন্ধ্যা-আহ্নিক কি এর মধ্যে শেষ হয়ে গেছে ? মা কি এরই মধ্যে আবার হেঁসেলে গিয়ে ঢুকেছে ? হঠাৎ খোকার মনে হল, আচ্ছা মা কি ঠিক মত খেতে পারছে? মায়ের ছানা-চিনি দিয়ে জল খাবার খাওয়া অভ্যাস। কে তার হাতে সেঃ জিনিস তুলে দিচ্ছে ? খোকা আর ভাবতে পারে না।

তাদের নিজেদের ফেলে আসা গাঁয়ে ফিরে যাবার কি আর কোনো উপায় নেই? সেখানে অভাব ছিল, কিন্তু অশান্তি ছিল না। খোকার মনে এই কথাই বার বার জাগতে লাগল।

এমন সময় অন্দর মহলে একটা সোরগোল উঠল—এসেছে—এসেছে।

লক্ষ্মী আবার এক ফাঁকে ছুটে এলো খোকার কাছে। বললে, সোনাকাকু, মজা দেখবে এসো—। সেই আব্দুল ওঝা তার ঝুলি-ঝোলা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। ও নাকি বাটি চালান দেবে। যে লোক মায়ের মাক্‌ড়ি নিয়েছে—সেই বাটি নাকি গিয়ে তার পায়ে আটকে থাক্‌বে—কিছুতেই খোলা যাবে না। মাক্‌ড়ি বের করে দিলে সেই বাটি আপনা আপনি পা থেকে খুলে পড়ে যাবে।

তুমি মজা দেখবে এসো সোনাকাকু—লক্ষ্মী আবার এক ছুটে বাড়ির ভেতর পালিয়ে গেল। খোকা এক পা-দুপা করে বাড়ির ভেতরকার উঠোনে গিয়ে হাজির হল।

সেখানে মায়ের সঙ্গে তার একবার চোখাচোখি হল। কিন্তু কোনো কথা বলার ত' উপায় নেই।

আব্দুল ওঝা তার লাঠি উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল, ভালো-মন্দ মানুষ যে যেখানে আছ সবাই এসে এখানে জড় হও। আমি এক্ষুণি এই বাটি চালান দেবো। আর চক্ষের পলকে চোর ধরে ফেলবো।

কিন্তু এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটল। লক্ষ্মী লাফাতে লাফাতে এসে বললে, আর বাটি চালান দিতে হবে না। এই ত' মা তোমার মাক্‌ড়ি জোড়া, তোমার পুরোনো চুলের ফিতের সঙ্গে জড়িয়েছিল।

খোকা তাকিয়ে দেখল, বড় বৌঠানের মুখটা একেবারে আমশির মতো শুকিয়ে গেছে।

আঠারো

এবার বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক মশাই এক নতুন নিয়ম চালু করলেন।

পরীক্ষার সময় ছাত্রদের কোনো গার্ড থাকবে না। ছাত্রদল নিজের মনে বসে পরীক্ষা দেবে। তাদের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা হবে। প্রশ্নের উত্তর লিখে তারা শুধু খাতা জমা দেবে দপ্তরে।

এই নিয়ম চালু করবার সময় অন্যান্য শিক্ষকগণ আপত্তি তুলেছিলেন।

কেউ বললেন, বিদ্যালয়ে ভাল ছাত্র নিশ্চয়ই আছে। তারা সারা বছর মন দিয়ে পড়াশোনা করে। পরীক্ষা দিতে বসে তারা কখনই টোকাটুকি করে না।

—কিন্তু—প্রশ্ন তুললেন আর এক টিচার। —কিন্তু এই সুযোগ নিয়ে আর এক দল দুষ্টু ও বেপরোয়া ছেলে সমানে নকল করে পরীক্ষা দেবে। ফলে তারা ভালো নম্বর পাবে। তাহলে পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এই মত সমর্থন করলেন। হেড মাষ্টার মশাই বললেন, আপনাদের যুক্তি আমিও সম্পূর্ণ মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তবু বলবো, ছেলেদের বিশ্বাস করে আমরা একবার দেখি না— ! তারা এই বিশ্বাসের মর্যাদা ত' রক্ষা করতেও পারে। জানেন ত' লণ্ডনের পথের ধারে ফুটপাতে-গাদাগাদা খবরের কাগজ পড়ে থাকে, পথচারীরা তাদের প্রয়োজনের মত কাগজ বেছে নিয়ে পয়সা সেইখানেই রেখে দিয়ে চলে যায়। হিসেবে-একটি পয়সাও এদিক-সেদিক হয় না। এক দেশের লোকেরা যা' পারে, আর এক দেশের মানুষ তা পারবে না কেন ? আসল কথা, আমরা ছাত্রদের ছোটবেলা থেকেই নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষা দিতে পারি না। এবার একটা পরীক্ষাই হয়ে যাক্ না ! আমাদেরও—ওদেরও।

শিক্ষকবৃন্দ তখন প্রধান শিক্ষকের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বললেন, বেশ, আপনার সাধু-সঙ্কল্প আমরা মেনে নিলাম। একবার তাহলে পরীক্ষাই হোক—আমাদের শুভ কামনা-ছাত্রদল মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে কিনা।

তখন সারাদিন বিদ্যালয়ে প্রধান-শিক্ষকের ঘোষণা যথারীতি প্রচার করা হল।

ক্লাশ-টিচারদের জানিয়ে দেওয়া হল, এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া ছাত্রদের মধ্যে কি হয়—সেটা যেন তাঁরা অনুসন্ধান করেন আর যথাসময়ে শিক্ষকবৃন্দের আলোচনা সভায় পেশ করেন।

বিদ্যালয়ে ভালো আর সৎ ছেলের অভাব নেই। হেড মাষ্টারের ঘোষণা শুনে অধিকাংশ ছেলেই খুশী হল। তাদের খুশী হবার কারণ এই যে, ছাত্রদের বিশ্বাস করা হয়েছে। এতে পরীক্ষা দেবার দায়িত্ব ছেলেদের ওপর এসে গেল। গোলমাল হলে সেজন্য ছেলেদেরই-বদনাম হবে। কাজেই এই সহজ সরল ও সুন্দর ব্যবস্থা সকলেরই স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেওয়া উচিত।

দুরন্ত আর বেপরোয়া ছেলের দল ঘোষণা শুনে নিজেদের মধ্যে চোখ টেপাটেপি করে কি আলোচনা করল—সেকথা তারাই ভালো বলতে পারে।

পরীক্ষার দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগলো—ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা ততই বৃদ্ধি পেতে থাক্লো।

অভিভাবকেরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাক্লেন না। তাঁরাও হেড মাষ্টারের ঘোষণা শুনে ইস্কুলে এসে শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন এবং স্বয়ং প্রধান শিক্ষককে সাধুবাদ জানাতে লাগলেন।

এদিকে বেপরোয়া ছেলেদের দলও কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। তারাও এই ঘোষণার পুরোপুরি সুযোগ নেবে বলে ঠিক করল।

একদল বয়সে বড় ছেলে—যারা ইতিমধ্যে স্কুলের পাঠ শেষ করে চলে গেছে—তারা এগিয়ে এলো এই সব ডানপিটে ছেলেদের সাহায্য করতে।

তখন ঠিক করা হল'—প্রশ্নপত্র বিলি করার পরই প্রত্যেক ক্লাশের দু-একজন ছেলে জলখাবার কিম্বা বাথরুমে যাবার ছুতো করে পরীক্ষার ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে। যথাস্থানে কয়েকটি বাইরের ছেলে অপেক্ষা করতে থাক্‌বে। তারা প্রশ্নপত্র গুলি সংগ্রহ করে দ্রুত চলে যাবে একটা ঘাঁটিতে। সে ঘাঁটি থাক্‌বে ইস্কুলের কাছেই। সেখানে একদল বড় ছেলে বইটই দেখে চট্‌পট জবাব লিখে ফেলবে। সেই জবাবগুলি আবার কৌশলে ফিরে আসবে পরীক্ষা দেবার ঘরগুলিতে। তারপর ছেলের দল পরস্পরকে সাহায্য করবে।

এইভাবে অল্প বিস্তর প্রায় প্রত্যেক বেপরোয়া ছেলেই প্রশ্নপত্রগুলির উত্তর লেখার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে।

বাড়িতে খোকা পরীক্ষার জন্যে ভালো ভাবে তৈরি হচ্ছে।

কার্তিক আর গণেশ প্রতিদিন একজন শিক্ষকের কাছে রীতিমত পড়াশোনা করে।

খোকাও মাঝে মাঝে গিয়ে ওই শিক্ষক মশায়ের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জেনে নিতো।

কিন্তু হঠাৎ একদিন আপত্তি এলো অন্দর মহল থেকে।

বাড়ির গৃহিণী এখন বড় বৌঠান।

তিনি শিক্ষক মশায়ের কাছে খবর পাঠালেন,—তিনজন পড়ুয়াকে পড়াতে গেলে তাঁর সময়ের অভাব ঘটবে। তাছাড়া মাইনে বৃদ্ধির প্রশ্নও এতে জড়িয়ে রয়েছে। কাজেই তিনি আগের মতো কার্তিক আর গণেশকেই পড়াবেন। বাড়িতে আর কোনো পড়ুয়াকে পড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই।

খোকা এ খবরটা আদৌ জানত না। একদিন মাষ্টারমশায়ের কাছে কতকগুলি শক্ত অঙ্ক বুঝতে গেল—তিনি তার অসুবিধার কথা সোজাসুজি খোকাকে জানিয়ে দিলেন।

খোকা মনে মনে আঘাত পেলো। কিন্তু পড়াশোনার কাজে সে এতটুকু দমল না। তারপর থেকে সে সরাসরি প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়ে তার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বুঝে নিত। এর পর থেকে তার শিক্ষা আরো দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল। খোকা মনে মনে ভাবলে, এ আমার শাপে বর হল।

খোকা আসাতেই যে তার ছেলে কার্তিক-গণেশ পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারেনি—একথা বড় বৌঠান কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই তিনি

কার্তিক-গণেশের মাষ্টার মশাইকে জানিয়ে দিয়েছেন—যে ভাবে হোক-ওদের প্রথম করতেই হবে। আপনি আমার ছেলে দুটিকে মন দিয়ে খুব ভালো ভাবে পড়ান। কাজ উদ্ধার হলে-আমি আপনাকে আলাদা ভাবে পুরস্কার দেবো,—সেকথা কাউকে জানাবার দরকার নেই। আর একটি কথা সব সময়েই মনে রাখ্‌বেন—খোকাকে কোনো পড়ায় সাহায্য করা চলবে না।

শিক্ষক মশাই তাই বাড়ির কর্ত্রীর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন।

কিন্তু গোলমাল বেধেছে কার্তিক আর গণেশকে নিয়ে। ওরা চায় সোনাকাকুও তাদের সঙ্গে বসে পড়ুক। কিন্তু ময়ের আদেশ অন্যরকম। তাই খোকাকে বড় পিসির ঘরে বসেই পড়াশোনা করতে হয়। অবশ্য সে ঘরটাও বেশ নিরিবিলি।

ঘুম থেকে উঠেই ওর মা আগে স্নান সেরে নিত্যকার সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করে হেঁসেলে ঢোকেন। সেখান থেকে ছাড়া পেতে তাঁর বেলা গড়িয়ে যায়। তখন আবার স্নান করে নিজের ভাতে-ভাত রান্না করে নিতে হয়।

ছোট বৌঠানের এই ব্যবস্থাটা আদৌ পছন্দ হয় না।

সে দু'একদিন তার বড় জাকে বলেছে—দিদি, তুমি না হয় আর একটি শক্ত-সমর্থ বামুন দিদি দেখে নাও। নইলে আমাদের মামী একেবারে কাহিল হয়ে পড়বেন।

বড় বৌঠান এক কান দিয়ে শুনেছেন, আর অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছেন। গায়ে বিশেষ মাখেন নি—ছোট জায়েব অনুরোধটাকে।

ছোটবৌ মামীর ভাতে-ভাত রান্না করতেও ছুটে গিয়েছে, কিন্তু তিনি মৃদু হেসে তাকে সরিয়ে দিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। পরীক্ষকবৃন্দের ধারণা সব ক্লাশেরই পরীক্ষা বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে এগিয়ে চলেছে।

প্রধান শিক্ষকের মুখে আর হাসি ধরে না। তিনি শিক্ষকদের সবাইকে ডেকে ডেকে বলছেন, দেখলেন ত' ? ছেলেরা বিশ্বাসের মূল্য রেখেছে।

শিক্ষকরা উত্তর দিয়েছেন রাখলেই ভালো।

এদিকে খোকাদের ক্লাশে খুব নকল করা চল্‌ছে। কিন্তু একদল ছেলে আছে তারা বইয়ের পাতা অবধি উল্টে দেখেনা সারা বছর। হাতের কাছে লেখা উত্তর কিম্বা বই পেয়েও তারা কাজে লাগাতে পারে না। একদিন একটি গুণ্ডা গোছের ছেলে খোকার পেছন থেকে বললে, এই কুশল, বের করে দে ত' বই থেকে কোথায় প্রশ্নের উত্তরটা লেখা আছে। কুশল বললে, আমি এখন ওসব বই-পত্তর ঘেঁটে প্রশ্নের উত্তর বের করতে পারবো না। যে যা জানো লিখে দাও—

বিদ্যালয়ের ভূগোল শিক্ষকের কিন্তু ধারণা যে, ছেলেরা দিব্যি টোকাটুকি করছে। তিনি বারান্দা দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দরজার ফাঁক দিয়ে চোখ পড়ল ছেলেদের

হাতে ভূগোলের বই। তিনি পা টিপে টিপে ঘরের ভেতর ঢুকলেন। তার উপস্থিতির কথা জানতে পেরে সেই গুণ্ডা ছেলেরা মুহূর্তের মধ্যে ভূগোলের বইটা সবার অলক্ষ্যে খোকার কোলের ওপর বসিয়ে দিল।

ভূগোল শিক্ষক মশাই ঘরে ঢুকে শুধু বললেন, ছেলেরা দাঁড়াও সবাই—

দাঁড়াতে গিয়ে খোকার কোল থেকে সেই ভূগোলের বইটা ঠকাস্ করে মাটিতে পড়ে গেল।

ভূগোল শিক্ষক মশাই বইটা কুড়িয়ে নিয়ে খোকাকে জিজ্ঞেস করলে, এর মানে কি?

উনিশ

প্রথমে বাইরের বাড়িতে একটা উঁচু গলায় কথাবার্তা শোনা গেল।

স্কুল থেকে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসেছিল কার্তিক আর গণেশ।

প্রথমেই দেখা ছোটকাকার সঙ্গে। ছোটকাকা বাইরের উঠোনে ধান ঝাড়াই-বাছাই দেখছিল। কার্তিক-গণেশ ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে তার সামনেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওদের দুই জনের চোখে-মুখে দারুণ উত্তেজনা। ছোটকাকা জিজ্ঞেস করলেন কিরে, তোরা এমন ছুট্‌তে ছুট্‌তে আস্‌ছিস কেন ? রাস্তায় কুকুরে তাড়া করেছিল নাকি ?

কার্তিক-গণেশ হাঁফাতে হাঁফাতে জবাব দিলে, না ছোটকাকা , আজ আমাদের ভূগোলের পরীক্ষা ছিল না ? তা ভূগোল স্যার পরীক্ষার সময় লুকিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন। আমাদের সোনাকাকুর কোলের উপর নাকি ভূগোলের বই পাওয়া গেছে। ভূগোল স্যারে সেই বই আর সোনাকাকুকে নিয়ে সোজা হেডমাষ্টারের ঘরে চলে গেছেন। সব শিক্ষকরা এসে সেখানে জড় হয়েছেন। ছাত্ররাও দল বেঁধে জটলা পাকাচ্ছে। তারা বলছে কুশলকে ছেড়ে দিতে হবে—নইলে ইস্কুল বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবে—

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে কার্তিক-গণেশ দুইজনেই হাঁফাতে লাগ্‌ল।

ছোটকাকা কিন্তু তাদের কথা উড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দূর বোকা ছেলেরা ! খোকা কেন নকল করে পরীক্ষা দিতে যাবে ? সে ত, পড়াশোনায় খুব ভালো। নিশ্চয়ই ও অন্য কোনো দুষ্টু ছেলের কাণ্ড ! তোরা কি শুনতে, কি শুনে এসেছিস !

কার্তিক-গণেশ তাদের চোখ দুটো বড় বড় করে উত্তেজিত ভাবে বললে, না ছোটকাকা, আমাদের সোনাকাকুকেই ত' ভূগোল স্যার হেড মাষ্টারের ঘরে ধরে নিয়ে গেলেন। আমরা নিজের চোখে সব দেখে শুনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসছি—

ছোটকাকা এইবার নিজে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, এ কখনোই হতে পারে না। আমাদের খোকা পড়াশোনা আর খেলাধূলা সব তাতেই চৌকস। আচ্ছা, আমি এক্ষুণি স্কুলে যাচ্ছি—

ছোটকাকা যে ভাবে চাষীদের দিয়ে কাজ করাচ্ছিলেন—সেই অবস্থাতেই কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে স্কুলের দিকে ছুট্‌লেন।

কার্তিক আর গণেশ তখন ভয়ে ভয়ে অন্দর মহলের দিকে ছুট্‌ল।

প্রথমেই মায়ের একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল দুই ভাই—

ওদের মা হুম্‌কি দিয়ে বললেন, কি এত হৈ-চৈ করে বলছিলি তোদের ছোট কাকাকে ?

মাকে ওরা সবাই বাঘের মতো ভয় করে? তাই ব্যাপারটা বলতে একটু ইতঃস্তত করছিল। কিন্তু মায়ের ধমকের সামনে ওরা একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। তাই ছোটকাকাকে যা-যা বলেছিল—এক দমে মায়ের কাছে সব জানিয়ে হাঁফাতে লাগ্‌ল।

বাড়ির বড় গিন্নি এইবার গলা করে বললেন, হুঁ। এ আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। নইলে একেবারে অজ পাড়াগাঁ থেকে এসেই সরাসরি ক্লাশে প্রথম ! পরীক্ষার খাতায় নকল করে অমন প্রথম অনেকেই হতে পারে ! ওই যে কথায় বলে না,—দশদিন চোরের আর একদিন সাধুর—। এই সময়ে রান্নাঘর থেকে লক্ষ্মীর একটা বুক ফাটা চিৎকারে বাড়ি শুদ্ধু সবাই সেইখানে গিয়ে ভিড় জমালো।

লক্ষ্মী কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, মায়ের ওই সব কথা শুনে দিদিমা একেবারে উনুনের ধারে ভিরমি খেয়ে পড়েছেন। ভাগ্যিস আমি এই সময়টায় জল গরম করতে এসেছিলাম, নইলে দিদিমার আঁচলে উনুনের আগুন ধরে যেত । আমি তাড়াতাড়ি পড়ি কি মরি করে আগে আঁচলটা সামলে নিয়েছি—

বাড়ির ছোট বৌ বললে, এসো, আমরা সবাই মামীমাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে যাই—তারপর একটা খাটের ওপর শুইয়ে দিই !

সবাই তার কথা সমর্থন করে বললে, হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো। উনুনের ধারের এই গরমে কিছুতেই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে না।

তখন সবাই মিলে খোকার মায়ের চেতনাহীন দেহটাকে সাবধানে ধরে ধীরে ধীরে বাইরে নিয়ে এলো।

ছোট বৌ বললে লক্ষ্মী, আমার ঘরটাই কাছে। তুই তাড়াতাড়ি গিয়ে আমার খাটে একটা বিছানা পেতে দে। এখনকার মতো মামীমাকে ওইখানেই শুইয়ে দি। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে—ওঁর নিজের খাটে নিয়ে গেলেই হবে।

লক্ষ্মী বললে, আমি তাড়াতাড়ি আগে বিছানাটা করে দিচ্ছি কাকিমা—কিন্তু মুস্কিল হল এই যে, খোকার মায়ের জ্ঞান আর ফেরে না ! ছোট বৌ মুখের ভেতর আঙুল চালিয়ে দিয়ে দেখলে—একেবারে দাঁতে-দাঁত লেগে আছে।

এখন উপায় ! উপস্থিত সবাই নানা রকম টোট্‌কার কথা বলতে লাগল। কেউ বললে হলুদ পুড়িয়ে নাকের কাছে ধরো—

কেউ জিজ্ঞেস করলে,—হিষ্টিরিয়া নেই ত' খোকার মার ? আবার অন্য একজন পরামর্শ দিলে, মাথায় জল ঢালতে হবে,—তবে যদি জ্ঞান ফিরে আসে—

ছোট বৌ এইসব দেখে ভারী ভয় পেয়ে গেল।

কার্তিক-গণেশকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁরে তোদের ছোটকাকা কোথায় ? কবিরাজ মশাই কিম্বা ডাক্তারবাবুকে ডাকতে হবে—

কার্তিক-গণেশ ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে, আমাদের কাছে খবর শুনে ছোটকাকা যে স্কুলের দিকে ছুটে গেলেন ! তাঁকে ডেকে নিয়ে আসবো কাকিমা ?

কাকিমা খুব ব্যস্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ রে শীগ্‌গির ছুটে যা যেখানে তোদের ছোটকাকাকে পাবি বলবি—একেবারে যেন ডাক্তার কিম্বা কবিরাজ সঙ্গে করে ফেরে। কি বিপদেই পড়া গেল। এই সময় আবার মা নেই বাড়িতে। কী যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি নে। ও দিদি, তুমি আবার দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? একবারটি কাছে এসে দেখ—

চাপা গলায় বড়বৌ উত্তর দিলে, ছেলের গুণপনা ধরা পড়েছে কিনা,—তাই ভিরকুটি মেরে পড়ে আছে। ও আপনিই সেরে যাবে। আমি গেলে কি দশটা হাত গজাবে না কি ? আমার বাপু মরবার সময় নেই।

বড় বৌ কোনো দিকে দৃকপাত না করে ঠাকুর ঘরের দিকে চলে গেলেন ! শ্বাশুড়ীর অনুপস্থিতিতে তাকেই সব কিছু দেখতে হবে কিনা।

প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে বাড়ির ছোটবাবু কাবরেজমশাই আর খোকাকে সঙ্গে নিয়ে হন্ত-দন্ত হয়ে ফিরে এলো।

ছোটবৌ তাকে একান্তে ডেকে বললে, এতক্ষণ বাড়ির বাইরে ছিলে—আমরা সবাই ভয়ে ভয়ে মরি। যাও শীগ্‌গির কবরেজমশাইকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ঘরে চলে যাও—। মামীমার জ্ঞান এখনো ফিরে আসেনি।

খোকা অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছিল বারান্দায় এক কোণে। লক্ষ্মী তাকে তাড়াতাড়ি এক থালা খাবার দিয়ে বললে, খুব ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়। আমি সব বুঝতে পারি সোনাকাকু। এই খাবার খেয়ে দিদিমার শিয়রে গিয়ে বোসো। আজ পালা করে আমাদের রাত জাগতে হবে,—কাকিমা বলে দিয়েছেন।

খোকা কোনরকমে খাবারটা গিলে—ঢক্‌ঢক্ করে এক গেলাস জল পান করলে। তারপর দ্রুত পায়ে ছোট বৌঠানের ঘরের দিকে চলে গেল।

সেখানে কবিরাজমশাই অনেক কষ্টে মায়ের জ্ঞান ফিরিয়েছেন। তিনি লক্ষ্মীকে ডেকে বললেন, নাড়ি খুব দুর্বল। এক্ষুণি এক গেলাস জল গরম দুধ খাইয়ে দাও—

তারপর বাড়ির ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি ওষুধ আর মকরধ্বজ রেখে যাচ্ছি। কিন্তু দেহ এত দুর্বল কেন ? উনি কি ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করেন

না ? তার ওপর নিশ্চয়ই অত্যধিক পরিশ্রম করেন। একেবারে দীর্ঘকাল বিশ্রাম আর পুষ্টিকর আহার চাই। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

কবিরাজ মশাই চলে যেতেই খোকার মা একেবারে উদ্ভ্রান্তের মতো চারদিকে তাকাতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ খোকার দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি উন্মাদের মতো উঠে বসে যেন খোকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ক্রমাগত কিল চড় আর গালাগালি চলতে লাগলো,—তুই সবাইকার মুখ ডোবালি, নকল করে পরীক্ষায় পাশ করতে গিয়েছিলি ? আমি আর তোর মুখ দর্শন করবো না। তুই—মর্—মর্—খোকা মায়ের হাতে কখনো মার খায়নি। আজ এইভাবে সকলের সামনে মায়ের হাতের আঘাতে-আঘাতে সে যেন একেবারে পাথর হয়ে গেল।

তবু মারের বিরাম নেই।

এমন সময় হেডমাষ্টারমশাই ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকলেন, তিনি চিৎকার করে বললেন, মা, আপনি কুশলকে মারবেন না। আমি এই ভয়ই করছিলাম যে আপনি ওকে ভুল বুঝ্বেন। তাই নিজেই ছুটে এলাম। শুনুন, আমি সব রকমভাবে অনুসন্ধান করেছি। একটি বেপরোয়া গুণ্ডা গোছের ছেলে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কুশলের কোলের ওপর ভূগোলের বইটা চাপিয়ে দিয়েছিল। আমাদের ভূগোল শিক্ষক একটু রাগী মানুষ, তিনিও ভুল বুঝেছিলেন। আমি আপনাকে বলছি মা, কুশলের কোনো দোষ নেই। ওর খাতাও আমি দেখেছি। ও ভালো পরীক্ষা দিয়েছে। মা, আপনি শান্ত হোন,—এই আমার অনুরোধ।

খোকার মা উত্তেজনায় আবার মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন।

বিশ

সে রাত বুঝি আর কাটতে চায় না।

প্রবল উত্তেজনায় খোকার মা বারে বারে জ্ঞান হারিয়ে ফেল্ছিলেন।

ক্রমাগত একটা হেঁচকি উঠছিল। তাতেও খুব কষ্ট হচ্ছিল তাঁর।

ছোটবৌ কার্তিক-গণেশের কাকাকে ডেকে চুপিচুপি বললে, তুমি আর একবার কবিরাজ মশায়ের কাছে যাও। এই অবস্থার কথা খুঁটিয়ে তাঁকে সব বলো। তিনি যদি আর একবার দেখে ওষুধ পাল্টে দেন তা হলে খুব ভালো হয়। আমি কিন্তু মামীমার অবস্থা খুব সুবিধের মনে করতে পারছি নে।

বাড়ির ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—মামীমা এত দুর্বল হয়ে গেলেন কেন ? কবরেজমশাই আমায় যা বলে গেলেন তাতে মনে হল পুষ্টিকর আহার দূরের কথা, তিনি নাকি আধপেটা খেয়ে আছেন ? তোমরা কি তাকে খেতে দাও না ? তিনি এত দুর্বলই বা হয়ে গেলেন কি করে ?

ছোট বৌ তখন ভয়ে ভয়ে তাঁর বড় জায়ের কীর্তি কাহিনী সব বলে ফেললে।

ছোটবাবু নিজের মাথার চুল টেনে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে কইলেন ছিঃ-ছিঃ কি লজ্জার কথা। আমাদের বাড়িতে এসে মামীমা শুধু দুই বেলা হেঁসেল ঠেলছেন ? তাহলে তাঁর শরীর টিকবে কি করে ? ব্যাপারটা আমায় একবার জানাবে ত' ?

ছোটবৌ এমনি একটু ভীতু ধরণের মানুষ। তাই চুপি চুপি বললে, আমি কি করবো বলো ? দিদি আমায় মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করেছিল। তাই আমি ভয়ে ভয়ে কিছু বলি নি।

ছোটবাবু তাড়াতাড়ি ছুটলেন আবার কবিরাজ মশায়ের বাড়ি।

তিনি সব শুনে বললেন, আজকের উত্তেজনাটাই সব নয়। দিনের পর দিন দারুণ পরিশ্রম, তার ওপর প্রায় অনাহারে থাকা। ওই দুর্বল শরীরে আর আছে কি বলো ? চলো, আমি আবার ভালো করে দেখি।

কবিরাজমশাই এসে অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি দেখ্‌লেন। বললেন, নাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ। ভেতরে ভেতরে এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে সত্যি ভাবনার কথা। আমি ওষুধ পালটে দিয়ে যাচ্ছি। কস্তুরী ভৈরবের ব্যবস্থা করতে হবে। ছোট বৌমা, আমি তোমায় সব বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি—সেই রকম ভাবে ওষুধ খাইয়ে যাবে। আজ রাত্তিরটা সাবধান। তোমরা সকলে পালা করে জাগবে ! হ্যাঁ, ভালো কথা, একটু একটু করে ফলের রস খাওয়াও। গরম দুধও মাঝে মাঝে চল্‌বে।

কবিরাজমশাই সব কিছু উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। ছোটবাবু ঠিক করে দিলেন, কে কখন রাত জাগবে। তারপর বললেন, আর ওঁর নড়াচড়া করা আদৌ উচিত হবে না। মামীমা যেখানে যেভাবে যে খাটে শুয়ে আছেন-ঐখানেই থাকুন। ছেলেমেয়েরা না হয় অন্য ঘরে শোবে আজ।

তারপর কি ভেবে তিনি বললেন লক্ষ্মী, এক কাজ কর। এই ঘরের মেঝেতে ঢালা বিছানা করে ফেল। আমরা যারা রাত জাগ্‌বো-সবাই এই মেজেতে শুয়ে থাক্‌বো ; ঘড়ি ধরে এক একজনকে ডেকে দেওয়া হবে।

ছোট বৌ এই সময় এসে ঘরে ঢুকলো। খাটো গলায় বললে, আজ আর রান্না-বান্নার বেশী দরকার নেই ! আমি আলু-পটল-বেগুন-কুমড়ো সব কিছু দিয়ে ভাত চাপিয়ে দিয়ে এসেছি। ঘরে ঘি আছে, দুধ আছে। ছেলে-মেয়েরা খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই অন্য ঘরে শুয়ে পড়ুক—

ছোটবাবু বললেন, ঠিক বলেছ, ছোটদের হুটোপাটি আজ একেবারে বন্ধ। এই ঘরের এক কোণে একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখো—মামীমার চোখে যেন আলো না পড়ে। ওঁর এখন শান্ত হয়ে বেশ কিছুটা ঘুমনো দরকার।

একটু বাদেই ছোটদের দলকে নিয়ে লক্ষ্মী খাওয়াতে গেল।

ঘরে তখন বাড়ির ছোটবাবু আর ছোটবৌ। ছোটবাবু চুপি চুপি বললে, জানো ছোটবৌ, আজই সন্ধ্যাবেলা মায়ের চিঠি পেলাম। ওরা নানান্ তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ছোটবৌ জিজ্ঞেস করলে, কি লিখেছেন মা ? ছোটবাবু উত্তর দিলে, মামীমার কথাই এ চিঠিতে মা বেশী করে লিখেছেন। নানা তীর্থের নির্মাল্য, প্রসাদ, শঙ্খ, মালা—এই সব তিনি মামীমার জন্যে নিয়ে আসছেন। আরো লিখেছেন, মামীমা যেন কিছুমাত্র চিন্তা না করেন—তার ছেলে খোকা এই বাড়িতেই মানুষ হয়ে উঠ্‌বে!

—আমি কি ভাবছি জানো ছোটবৌ ? শঙ্কিত মনে ছোটবৌ জিজ্ঞেস করল,—কি? ছোটবাবু বললে, মামীমার যদি সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু ঘটে,—তাহলে আমি মায়ের কাছে মুখ দেখাবো কি করে ? কি সান্ত্বনা আমি তাঁকে দেবো ?

ছোটবৌ বললে, না-না, ওকথা মনের কোণেও স্থান দিও না। আমাদের অনেক ত্রুটি হয়েছে সত্যি—কিন্তু দেখো, কবিরাজমশায়ের ওষুধ খেয়ে মামীমা একেবারে ভালো হয়ে যাবেন। তখন আমরা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো—

কিন্তু আমার মন বলছে—বড্ড দেরী হয়ে গেছে। একই বাড়িতে থেকে আমরা ভালো করে আশে-পাশে তাকাই নি। আলোর নীচেই অন্ধকার—এই কথাই লোকে বলে থাকে। অনেক কিছু মূল্য দিয়ে আমরা বুঝি সেই কথা জানতে পারছি। কী লজ্জা! আপন মনে ছোটবাবু কথাগুলো বললেন। তারপর খানিকটা চুপ করে থেকে আবার বললেন, তবু আমি একথা অসঙ্কোচে বলবো—এই ব্যাপারে আমাদের ব্যাটা ছেলেদের চাইতে—তোমাদের, মানে মেয়েদের দায়িত্ব অনেক বেশী। তোমরা কিছুতেই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারো না। ভেবে দেখ, একজন নিরাশ্রয়া নিকট আত্মীয়া তোমাদের বাড়িতে এলেন মাথা গোঁজবার জন্য, আর তোমরা নিতান্ত অনাদরে আর অবহেলায় তাঁর জীবন দীপ নিভিয়ে দিলে ! এই কথা শুনে ছোটবৌ শিউরে উঠল। বললে, অমন করে তুমি কথা বলো না, সত্যি আমার ভয় করছে।

ইতিমধ্যে ছেলেমেয়েরা খাওয়া-দাওয়া সেরে পাশের ঘরগুলিতে শুয়ে পড়ল।

বয়স্ক যাঁরা বাড়িতে ছিলেন—তাঁরাও কোনো মতে রাতের আহার শেষ করে নীরবে এসে রোগিণীর ঘরের মেঝেতে বসলেন।

ছোটবৌ বললে, তোমরা সবাই সারাদিন কেবল ছুটোছুটিতে কাটিয়েছ। প্রথম রাত্তিরে তোমরা সব ঘুমিয়ে পড়ো,—আমি আর লক্ষ্মী জাগ্‌ছি। তারপর যখন যেমন দরকার পড়ে তোমাদের ঘুম থেকে তুলে দেবো। খোকা, তোর ওপর দিয়ে আজ অনেক ঝড় গেছে, তুইও শুয়ে পড়। শেষ রাত্তিরে আমি তোকে ডেকে দেবো।

খোকার দেহ-মনের ওপর দিয়ে আজ যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। সে আর কিছুতেই বসে থাক্‌তে পারছে না। মায়ের খাটের তলায় মেঝেতে সে তার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহটি এলিয়ে দিল। ছোটবৌ আর লক্ষ্মী নীরবে খাটের ওপর গিয়ে বসল।

যত রাত বাড়তে লাগলো—রোগিণীর অস্বস্তি যেন ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল।

কব্‌রেজমশাই ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছেন কিনা ওরা জানে না। কিন্তু রোগিণীর চোখে এক ফোঁটাও ঘুম নেই। মাথাটা শুধু ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো ডাইনে বাঁয়ে দুলছে। কখনো তিনি বিছানার চাদর খাম্‌চে ধরছেন। আবার কখনো হাতের তালুটা চোখের সামনে মেলে ধরে কি দেখবার চেষ্টা করছেন।

লক্ষ্মী বললে, কাকিমা, এখন বোধহয় দিদিমাকে ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে।

ছোটবৌ বললে, তুই ঠিক বলেছিস। দু'জনে বেশ যত্ন করে ওষুধ খাইয়ে দিল।

মধ্যরাত্রে ছোটবাবু সজাগ প্রহরী হয়ে রোগিণীর পাশে বসে রইল। তখন রোগিণীর দু'চোখ বেয়ে শুধু অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে ! অসহ্য আবেগে রোগিণী থর্ থর্ করে কাঁপছেন। যেন কিছু বলতে চাইছেন, —ঠোঁটটা একটু একটু নড়ছে, কিন্তু কিছু বলতে পারছেন না।

আর একবার ওষুধ খাওয়াবার সময় হতে ছোটবাবু মামীমাকে যত্ন করে ওষুধটি খাইয়ে দিলেন।

এর মধ্যে খোকা ঘুম থেকে উঠে বসেছে। ছোড়দা বললেন, খোকা, তুই একটু বোস,—আমায় একটু বাথরুমে যেতে হবে। দরকার পড়লে তোর ছোট বৌদিকে ডাকিস। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসছি—

খোকা এসে মায়ের গা ঘেঁসে বসল। কপালে হাত দিয়ে দেখল, জ্বরে গা যেন একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। মা চোখ বড় বড় করে খোকাকে শুধু দেখছেন। তারপর ফিস্ ফিস্ করে বললেন, খোকা, চুপ, কথা বলবি নি। দেখতে পাচ্ছিস নে—তোর বাবা এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছেন। আর ত' আমি এখানে থাকতে পারবো না।

খোকা একবার মায়ের মুখের দিকে আর একবার অন্ধকার দেয়ালের দিকে তাকালো। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। কোণের মাটির প্রদীপটি মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। মা খোকার হাতটা চেপে ধরে বললেন, খোকা, আমি চললাম—কিন্তু তোকে এবার মানুষ হতে হবে—

বাইরের জান্‌লা দিয়ে একটা দমকা হাওয়া এসে কোণের ক্ষীণ মাটির প্রদীপটিকে যেন ফুঁ নিভিয়ে দিয়ে গেল।

পালা-পার্ব্বণ ছড়া-ছন্দ

(ছড়া, নাটক ও গল্প সংকলন)

দশে মিলি করি কাজ

সব পেয়েছির আসর মাঝে সোনার কাঠির দল
নবীন কিশলয়ের গানে প্রাণ হ'ল চঞ্চল।
লক্ষ শিশু জাগছে আজি নতুন আশাতে
জাগছে মনে নতুন কথা, নতুন ভাষাতে।
লক্ষ প্রদীপ জ্বলছে যেথায় সেথায় সবে চল
দশে মিলে করবো যে কাজ, প্রাণ হলো চঞ্চল।।

চলার পথে অ-সুর মোদের দলতে হবে ভাই
শক্তির করো, শক্তি করো, শক্তি করো তাই।
ছুরি, লাঠি, আর বেনেটি শক্ত হাতে ধর
কুস্তি করো, খেলাধূলায় হও সবে তৎপর।
দলাদলির ধার ধারিনে, করিনে ভাই ছল
দশে মিলে করবো যে কাজ, প্রাণ হলো চঞ্চল।।

নিপুন হাতে সৃষ্টি করি শিল্পকলা ভাই,
তুলিতে তাই চিত্র আঁকি, পুতুল প্রতিমাই!
শুভ্র-শুচি আল্‌পনাতে মুগ্ধ করি প্রাণ
মোদের সাথে গাইবে কি ভাই শিল্পকলার গান?
লক্ষ প্রদীপ জ্বলছে যেথায় সেথায় সবে চল
দশে মিলে করবো যে কাজ, প্রাণ হলো চঞ্চল।।

জ্ঞান আহরণ তরে মোরা গড়বো "পাঠাগার"
শিখবো কত নতুন কথা, মানবো নাকো হার।
দেশ-বিদেশে কুড়াই মোরা জ্ঞানের বাণী গো—
সকল শিখে, সকল জেনে ধন্য মানি গো।
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলছে যেথায় সেথায় সবে চল
দশে মিলে করবো যে কাজ, প্রাণ হলো চঞ্চল।।

অগাধ জলে সাঁতার কাটি আমরা সাঁতারু
স্রোতের টানে ভাসি যখন ধার ধারিনে কারু।
যখন লাগে নতুন হাওয়া নতুন পালে রে
অজানারে জানবো বলে বসবো হালে রে।
সন্তরণে মাতবি কে আয় ছেলে-মেয়ের দল
দশে মিলে করবো যে কাজ, প্রাণ হলো চঞ্চল।।

রোগীর সেবা ধর্ম্ম মোদের তাইতো জাগি রাত,
লক্ষ তারা চন্দ্র যে রে জাগবে মোদের সাত।
ঔষধেতে সকল রোগীর বাঁচাই মোরা প্রাণ
সেবার তরে সাগ্রহে ভাই নেবো সবার দান!
যার পরাণে রয় করুণা সেথায় সবে চল
দশে মিলে করবো যে কাজ, প্রাণ হলো চঞ্চল।।

উৎসবের উপকারিতা

তোমাদের জীবনে যদি উৎসব না থাকতো—তা হলে রোজকার কাজ তোমাদের কেমন লাগতো—সে কথা একবারও ভেবে দেখেছ কি?

রোজ একই সময় ঘুম থেকে উঠছো, হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসছো, স্নান-খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ইস্কুলে যাচ্ছ! সেখানে হয়ত মাষ্টারমশাই কিম্বা দিদিমণিদের বকুনি খাচ্ছ। বাড়ীতে ফিরে এসে খাচ্ছ জলখাবার। তারপর সন্ধ্যের মুখে আরো খানিকটা পড়াশোনা করতে চোখে নেমে এলো ঘুম। দুলতে লাগলো তোমার শরীরটা। ফলে, কোনো দিন খেয়ে, আর কোন দিন না খেয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়লে। তারপর একেবারে যাকে বলে লম্বা ঘুম!

এই জীবনের নাম কি জানো ?

একে বলে থোর-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোর। কোনো একটা মিষ্টি গান শোনো না, খোলা মাঠে খেলাধূলা নয়, পুকুরে সাঁতার কাটা নয়, ছুটির দিনে ভালো বই পড়া কিম্বা ছবি আঁকা নয়। কোনো ঝিম্‌ঝিমে শনিবারের বিকেলে কিম্বা রবিবারের সোনালী সকালে কোনো নতুন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া নয়—একেবারে খাতার রুটিনের মতো বিস্বাদ আলুনি জীবন!

রোজ রোজ ভালো লাগে তোমাদের এই জীবন?

চেয়ে দেখো প্রকৃতির দিকে, সেখানে বৈশাখ মাসে কাল-বৈশাখীর মেঘের সমারোহ আর ঝড়ের তাণ্ডব, জ্যৈষ্ঠমাসে কত রকম ফলের অপরূপ নৈবেদ্য! আষাঢ় মাসে নিঝুম রাত্তিরে ঝর্ ঝর্ ধারা বরিষণ! শ্রাবণ মাসে—খাল, বিল, নদী, নালা একেবারে জলে টুই-টম্বুর! ভাদ্র মাসে লাগে শরতের আমেজ, তালের শ্যামল সম্ভার। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে শিউলী আর কাশফুলে ছেয়ে যায় সারা দেশ। আগমনীর সে কী অভিনব আহ্বান! অগ্রহায়ণ মাসে পাকা ধানের সোনালী সম্ভারে সারা অঞ্চল লক্ষ্মীশ্রী মণ্ডিত হয়ে ওঠে। পৌষ মাসে শীতবুড়ী কাঁথা গায়ে দিয়ে গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে আসে! শীতের আমেজ লাগে দেহে আর মনে! মাঘ মাসের শীতে বাঘ পালায়। লোকে ঘরে আগুন জ্বালে, শীতবুড়ীর দাপট থেকে বাঁচবার জন্যে। ফাল্গুন মাসে আবার অপরূপ দৃশ্য। বনে-বনে অজস্র ফুল ফোটে, কাননে-কান্তারে কোকিল ডাকতে থাকে। বসন্ত ঋতু ধরার বুকে নতুন শিহরণ জাগায়। কচি সবুজ পাতায় ছেয়ে যায় সারা ধরণী। সমীরণ এসে সবাইকে দোলা দেয়। চৈত্র মাসের আর এক নাম মধুমাস। মধু-বসন্ত দ্বারে এলো

বলে সবাই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। বনে-বনান্তরে চলে আনন্দের এক হোলি-উৎসব।

তা হলেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, প্রকৃতি দেবী কেমন সুন্দর উৎসবের আয়োজন করে চলেছেন প্রতি মাসে। তোমরা কেউ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ, কেউ দেখ না।

ঘুম-কাতুরে যারা—তাদের জীবনের অর্দ্ধেক দিন ত' ঘুমেই কেটে যায়। উৎসবের খবর রাখবে কেমন করে?

প্রকৃতি যেখানে ঋতু-পরিবর্ত্তনের উৎসব করছে,—মানুষ কি সেখানে চুপচাপ বসে থাকবে? তার মনে কি উৎসবের বাঁশী বেজে উঠবে না? একটি গানের কলি কি তার মনে গুঞ্জরণ করে ফিরবে না? মৃদঙ্গের তাল কি কোনো অবসর-ক্ষণে তার মনকে মধুময় করে তুলবে না?

তা নইলে একঘেয়ে জীবনে মানুষ বাঁচবে কি করে? মানুষ ত' আর পশু নয় যে, শুধু প্রাণ-ধারণের জন্য খাওয়া আর ঘুম নিয়ে সে দিন-গুজরাণ করবে?

তাই মানুষকে বেঁচে থাকবার জন্যে উৎসব করতে হবে, আনন্দ করতে হবে, খেলাধূলায় যোগ দিতে হবে, শীতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে হবে, নাচ ও গানে অবসরক্ষণকে আনন্দ-মুখর করে তুলতে হবে। দেশ-ভ্রমণ করে অজানাকে জেনে নিতে হবে।

তোমারা হচ্ছ আনন্দের ঝরণাধারা।

তাই ত' থোর-বড়ি-খাড়া জীবন তোমাদের ভালো লাগে না। হঠাৎ অজান্তে তোমাদের চঞ্চল-চরণ নৃত্যের জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে,—হঠাৎ মনের আনন্দকে প্রকাশ করবার জন্যে কণ্ঠে জেগে ওঠে গান। হঠাৎ-খুশী যখন জীবনে ঘনিয়ে ওঠে, তখন তোমরা হয়ত ছবি আঁকতে বসে যাও, নইলে, গ্রাম ছাড়া রাঙা মাটির পথে হারা-উদ্দেশে পাড়ি জমাও। অথবা কোনো নির্জ্জন নদী তীরে বন-ভোজনে মেতে ওঠ।

তাই ত' বারো মাসে তের পার্ব্বণ তোমাদের মনকে দোলা দেয়।

এইভাবে সারা বছর ধরে তোমরা উৎসব-অনুষ্ঠান কেমন করে করবে, সেই কথাই আমি বলবো। উৎসবেরও একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, শুচিতা, শোভনতা আছে। আছে সৃষ্টির নিত্য-নতুন আনন্দ।

কোলাহল আর উৎসব যে এক কথা নয়—এই কথাটি তোমাদের আগে বুঝে নিতে হবে উৎসবের উপকারিতা।

কাজের ভাগাভাগি

কোনো একটি অনুষ্ঠান করতে গেলে,—তোমাদের অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি ঘরোয়া আলোচনা সভা বসাও। তাতে নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নাও—কে কোন্ কাজের ভার নেবে। কে সভাপতি ও প্রাধন অতিথিকে নিয়ে আসবে, কে মঞ্চ সাজাবে, কারা নিমন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, কারা ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুলবে, কে কে প্রেক্ষাগৃহের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, কারা সাজঘরে ছোটদের সাজাবে, কে আলোক নিয়ন্ত্রণ করবে—এই সব-কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার ঘরোয়া আলোচনা-সভায় ঠিক করে নিতে হবে।

যে সময়ের যে কাজ

উৎসব, কি অনুষ্ঠান করতে গেলে সব চাইতে প্রয়োজনীয় কথা হল—যে সময়ের যে কাজ। যদি তোমরা ঠিক করে থাকো যে, বিকেল পাঁচটায় উৎসব সুরু হবে—তা হলে ঐ নির্দ্ধারিত সময়েই তোমাদের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে হবে। কখনোই তার পাঁচ মিনিট পরে নয়। সময়কে যদি তোমারা ফাঁকি না দাও, তবে সময়ও তোমাদের ফাঁকি দেবে না। দু' চারদিন আগে থেকে সকলে মিলে যদি প্রস্তুত হও, তা হলে নির্দ্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠান সুরু করা কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়। নির্ব্বাচিত সভাপতি যদি সময়মত এসে পৌছুতে নাও পারেন, তবু তোমরা ঠিক সময়ে কাজ সুরু করে দেবে। তখন সকলে তোমাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখে খুব খুশী হবেন, আর বলবেন, ছেলেরা ঠিক সময়মত উৎসব সুরু করে থাকে। এখানে কোনো মতেই দেরী করা চলবে না।

অনেক সময়ে দেখা যায়, যিনি উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইবেন, তিনি যথাসময়ে এসে হাজির হন নি? ফলে, এক ঘন্টা দেরীতে সভার কাজ সুরু হল। এই ব্যাপারটি তোমরা কখনই হতে দেবে না। ছোট্ট একটি ছেলে কিম্বা মেয়েকে দিয়ে গান গাইয়ে সভার কাজ সুরু করে দেবে। তখন বিলম্ব করে যে গায়ক আসবেন—তিনি নিজেই লজ্জিত হবেন।

মোট কথা, সময়ের দাম তোমাদের দিতেই হবে।

নববর্ষ উৎসব

বছরের প্রথম দিন হচ্ছে—১লা বৈশাখ।

এই দিন তোমরা গ্রামে-গ্রামে, শহরতলীতে এবং বিভিন্ন শহরে নববর্ষ উৎসব করে থাকো। এই নববর্ষ উৎসবে সব সময় একটা শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা এবং সমবেত প্রচেষ্টা থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। তবেই উৎসব সকল দিক দিয়ে সার্থক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে।

এসো, আমরা এই নববর্ষ-উৎসব দিয়ে কাজ সুরু করি।

তোমরা আগেই ঘরোয়া আলোচনা করে ঠিক করে নিয়েছ যে, অতি প্রত্যূষে প্রভাত ফেরী বের করবে। সেজন্য আগে থেকে একটি গান ছেলেমেয়েরা মিলে তৈরী করে নিয়েছ। খুব ভোরে উঠে এক শোভাযাত্রা-সহযোগে তোমরা এই গানটি সারা পাড়ায় গেয়ে গেয়ে ঘুরবে, তাতেই নববর্ষের সোনালী সকালে সবাইকার ঘুম ভাঙবে।

পরিকল্পনাটি ভারি সুন্দর। কিন্তু তাকে ঠিকমতো রূপ দিতে পারলেই তোমরা সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করতে পারবে। প্রভাত-ফেরী যদি তোমরা বেলা আটটার সময় বের করো, তাহলে সবই মাটি। তোমাদের সুন্দর পরিকল্পনার আর কোনো মূল্যই থাকবে না। কাজেই এই ব্যাপারে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। ছেলে-মেয়ে সবই সাদা পোষাকে আসবে। ছেলেরা সাদা হাফ-প্যান্ট, হাফ-সার্ট পরবে আর পায়ে সাদা কেড্‌স্। ছোট মেয়েরা সাদা ফ্রক আর সাদা কেড্‌স্। একটু বড় মেয়েরা লাল পাড়ওয়ালা সাদা জমিনের শাড়ী আর হাতে তাদের মঙ্গল-শঙ্খ। এই মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়ে তোমাদের যাত্রা শুরু হবে। শেষ রাত্তিরের স্নিগ্ধ পরিবেশে তোমাদের শোভাযাত্রা বের হবে। ভেবে দেখ কি সুন্দর হবে তোমাদের উৎসবের সূচনা।

পাড়া প্রদক্ষিণ করে তোমরা একটি খোলা মাঠে সমবেত হবে। এইখানেই তোমাদের নববর্ষ উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাধা হবে।

নির্ব্বাচিত সভাপতি ও প্রধান অতিথির জন্যে একটি সুন্দর বেদী তৈরী করা হয়েছে। সেখানে শঙ্খ-বাদিনীর দল সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে। সভাপতি ও প্রধান অতিথি উৎসব-প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়ে মেয়েরা তাঁদের অভ্যর্থনা করে নেবে। তারপর একটি ছোট মেয়ে কপালে চন্দন-তিলক পরিয়ে দেবে, হাতে বেঁধে দেবে প্রীতির-রাখী। আর মঙ্গল-প্রদীপে তাদের বরণ করে নেবে।

জাতীয়-পতাকা-উত্তোলন

এইবার হবে জাতীয়-পতাকা উত্তোলনের পালা। তোমরা আগে থেকে জাতীয় পতাকা একটি বাঁশের সঙ্গে বেঁধে রেখে দেবে। তার সঙ্গে বাঁধা থাকবে নানা রকম ফুল। সভাপতি মশাই যখন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন, তখন এই ফুলগুলি ওপর থেকে আপনি খুলে গিয়ে তাঁর মাথায় পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করবে। ভেবে দেখ, কেমন সুন্দর হবে পরিবেশটি।

যখন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে, তোমরা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করবে না, কিম্বা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলবে না। ঠিক সৈনিকের মতো বুক টান্ করে সোজা দাঁড়িয়ে থাকবে। এ জাতীয়-পতাকা তোমাদের। কাজেই তাকে সম্মান দেখানো তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। সকালবেলা যে জাতীয়-পতাকা উত্তোলন করবে, সন্ধ্যেবেলা তাকে নামিয়ে নিতে হবে। এই কথাটি আদৌ ভুলবে না।

জাতীয়-সঙ্গীত

জাতীয়-পতাকা যখন তোলা হবে, তখন কয়েকটি ছেলেমেয়ে সমবেত কণ্ঠে জাতীয়-সঙ্গীত গাইবে। পুরো গান গাইবার প্রয়োজন নেই। শুধু যতটুকু জাতীয়-সঙ্গীত বলে নির্দ্ধারিত আছে, ঠিক সেই অংশটুকুই গাইতে হবে। জাতীয়-সঙ্গীতের মর্যাদা রক্ষা করাও তোমাদের একান্ত ভাবে প্রয়োজন। জাতীয়-সঙ্গীত যখন গাওয়া হবে, তখন সবাই একেবারে নীরবে দণ্ডায়মান থাকবে। কোনো রকম বাচালতা প্রকাশ করবে না।

আর একটি কথা সবাই মনে রাখবে—জাতীয়-সঙ্গীতের পর কেউ হাততালি দেবে না। ওটা একেবারে নিয়ম-বিরুদ্ধ। ওতে জাতীয়-সঙ্গীতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

সমবেত-ব্যায়াম

উৎসবের এই অংশটুকু শেষ হয়ে গেলে তোমরা সমবেত-ব্যায়াম প্রদর্শন করবে। সমবেত- ব্যায়াম-প্রদর্শনের ঠিক আগে তোমরা সবাই "সঙ্কল্প-বাক্য" পাঠ করবে। সঙ্কল্প-বাক্য একজনে চেঁচিয়ে বলবে আর সবাই একসঙ্গে সেই কথাটির পুনরাবৃত্তি করবে। সঙ্কল্প-বাক্যটি এই রকম হবে—

শিক্ষা নেবো সবার ঠাঁই—
শক্ত দেহ গড়তে চাই।

ছেলে-মেয়ে সব সমান
এই আসরের রাখবো মান।
জাতিভেদ আর নাই রে নাই—
মানুষ হতে চাই সবাই।।
গড়বো সবল স্বেচ্ছাদল
সংগঠনে মাতবি চল—!
সত্যপথে চলবি চল্—
ঈশের আশিস মোদের বল।।

সমবেত-ব্যায়ামের পর সভাপতি ও প্রধান অতিথির ভাষণ। শেষকালে সমাপ্তি-সঙ্গীত দিয়ে সকালবেলাকার অনুষ্ঠান শেষ। তারপর একটু মিষ্টি-মুখ।

সন্ধ্যাবেলায় নবর্বর্ষ-উৎসবের তৃতীয় পর্ব্ব। এই সময় ছেলে-মেয়েরা নিজেদের তৈরী মঞ্চে নাট্যাভিনয় করতে পারে।

ধরো, আগে থেকে ঠিক হয়েছে মেয়েরা একটি নৃত্য-নাট্য করবে। আর সেই নৃত্য-নাট্যের নাম—"পালা-পার্ব্বণ"।

গান আর নাচের ভেতর দিয়ে এই নৃত্য-নাট্যটির রূপ দান করতে হবে। এক একটা মাসকে কেন্দ্র করে এক একটি নৃত্য। আগে থেকেই সুন্দর মহলা দিয়ে এই নৃত্য-নাট্যটি তৈরী করে রাখতে হবে। যিনি ভালো নাচ জানেন, তিনি বিষয়-বস্তুকে অনুসরণ করে নৃত্য-পরিকল্পনা করবেন এবং বিভিন্ন মেয়েদের গুণপনা বিচার করে একক কিম্বা সমবেতভাবে নাচগুলি শেখাবেন। নৃত্যের সময় গানগুলি মাইকের সাহায্যে গাইতে হবে। সঙ্গে উপযুক্ত ঐক্যতান বাদনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যখন যে নাচ চলবে—উপযুক্তভাবে আলোক-নিয়ন্ত্রণ করে নৃত্যকে উপভোগ্য করে তুলতে হবে।

"পালা-পার্ব্বণ" নৃত্য-নাট্য

বাংলাদেশকে বলা হয় "সোনার বাংলা"।

এখানে ক্ষেতে সোনার ফসল, গাছে গাছে পাকা ফল, নদী ভরা মিঠে জল, চাষীর মুখে মধুর হাসি। ছোট ছেলেমেয়ের দল এখানে সোনালী রোদ্দুরে খেলে বেড়ায়। শান্তি আর তৃপ্তি এই দেশে একদা হাত ধরাধরি করে বেড়াত। গেরস্তর বাড়ীতে গোলাভরা ধান, গোয়ালে দুধোলো গাই, পুকুর ভর্ত্তি মাছ, বাগানে প্রচুর শাক-সব্জী। অভাব ছিল না এখানে কিছুরই। সেইজন্য বাংলাদেশে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ পালন করা হত। আত্মীয়-কুটুম্বতে ঘরবাড়ী পূর্ণ হয়ে যেত। প্রতিটি পালা-পার্ব্বণে সারা গাঁয়ের লোক আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠতো।

এই যে বারো মাসে বারো রকম উৎসব-অনুষ্ঠান, তাই নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের "পালা-পার্ব্বণ" নৃত্য-নাট্য।

প্রত্যেকের মনে যখন শান্তি থাকে, দেশে যখন থাকে প্রাচুর্য্য আর ছোট ছেলেমেয়ের দল যখন আনন্দ কলহাস্যে মুখরিত হয়ে ওঠে, তখনই ঘরে-ঘরে পালা-পার্ব্বণের উৎসব জমে ওঠে। হাসি-খুসী-মুখ, স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল সোনার কাঠিদের দেখে কার না আনন্দ হয়।

নববর্ষের গান

(বৈশাখ মাস)

বাংলাদেশের বছর সুরু হয় বৈশাখ মাসে। এই বৈশাখ মাসের প্রথম দিন ছেলেমেয়ের দল নববর্ষ উৎসব পালন করে।

পুরোনো বছর শেষ হয়ে যায় চৈত্র সংক্রান্তিতে। নববর্ষের পুণ্য-প্রত্যুষে নতুন সূর্য্য জেগে ওঠে তার সোনালী কিরণ নিয়ে। শত শত ছেলে-মেয়ে সমবেত হয়ে এই শুভ ১লা বৈশাখে নতুন সঙ্কল্প গ্রহণ করে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, তারা ভাল হবে, পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সবাই ।

নববর্ষের নতুন নিশান হাতে নিয়ে তারা ময়দানে পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। নববর্ষের জয়-গান তাদের শত-সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সাগরের জল যেমন জোয়ারে

---

* প্রতিটি নৃত্যের আগে এক-এক মাসের বৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষক ঘোষণা করে দেবে। উৎসব মাইক ব্যবহার করা বিধেয়

উচ্ছল হয়ে ওঠে—তেমনি ছোট ছেলে-মেয়ের মন-প্রাণ নববর্ষের নতুন গানে জেগে ওঠে। ওরা মনে মনে সঙ্কল্প করে, ফুলের মতো যেন প্রতিটি গৃহে ফুটে উঠতে পারে এই সব জীবন্ত শতদল।

ওই যে ছেলেমেয়ের দল নিশান হাতে এই দিকেই আসছে,—কণ্ঠে তাদের নব-সুরে সঙ্গীত—এ নববর্ষে নতুন সূর্য্য জাগে—

এ নববর্ষে নতুন সূর্য্য জাগে!
সোনালী-কিরণ সবাকার চোখে লাগে!
হাতে তুলে নে না
আপন নিশান,
সমবেত সুরে গা রে
আজি গান—
সাগরের জল জেগেছে আজিকে
সেথায় জোয়ার লাগে!

পাশাপাশি সবে দাঁড়া সারে সারে
যত তোরা ভাই-বোন।
নব-বরষের ওঠে জয়গান
কান পেতে সবে শোন্!
কাজ করে যাবি
এ নব বছরে—
ফুল সম ফুটে
থাক্ ঘরে ঘরে।
লক্ষ পরাণ প্রণতি জানায়ে ঈশের আশিস্ মাগে—
এ নববর্ষে নতুন সূর্য্য জাগে।

ষষ্ঠীব্রতের গান
(জ্যৈষ্ঠ মাস)

শিশুর দেবতা—মা-ষষ্ঠী।

এই মা-ষষ্ঠী সকল শিশুর রক্ষণা-বেক্ষণ ও কল্যাণ-সাধন করে থাকেন। আমাদের দেশে একটি ছড়া প্রচলিত আছে—

"ধন—ধন—ধন—ধন
বাড়ীতে ফুলের বন
এ ধন যার ঘরে নেই তার কিসের জীবন?
তারা কিসের গরব করে?
আগুনে পুড়ে কেন না মরে?"

প্রত্যেক বাড়ীর এই ফুলের বন যাতে রক্ষা পায়, সেজন্য প্রতি বছর ঠাকুমা-দিদিমা-মা-মাসি-পিসির দল জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীব্রত করে থাকেন। প্রতি ভোরে উঠে স্নান সমাপন করে পট্টবস্ত্র পরিধান করেন। নানারকম ফল দিয়ে বরণডালা সাজান। দুর্ব্বার গুচ্ছ গঙ্গাজলে ভিজিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আশীর্ব্বাদ করেন—ষাট্ ষাট্ ষাট্। মা-ষষ্ঠীর বাহন হচ্ছে বেড়াল। তাই বাংলাদেশের গেরস্থ বাড়ীতে বেড়ালের এত আদর। দুধ-ভাত দিয়ে বেড়ালকে তৃপ্ত করা হয়।

এই ষষ্ঠীব্রতের দিন প্রতিটি বাড়ীর বৌ-ঝিরা কামনা করে—মা-ষষ্ঠীর কৃপায় ছেলেমেয়ে ভালো থাকুক, নাতি, নাত্‌নী নিয়ে সবাই সুখে ঘর করুক, বেড়াল-বাহন মা-ষষ্ঠী সবাইকার কল্যাণ করুন। কেউ যদি কিছু অপরাধ করে থাকে—মা-ষষ্ঠী তাদের ক্ষমা করুন। সেদিন ছেলে-মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে নেই। সবাই বলবে—"মা-ষষ্ঠীর ছেলেমেয়ে—ষাট্—ষাট্—ষাট্!"

মা ষষ্ঠীর ছেলে-মেয়ে—ষাট্—ষাট্—ষাট্!
তোমার পায়ে গড় করে মা বস্‌তে দেবো খাট!
বেড়াল-বাহন ষষ্ঠী মাগো—
ধনে-মানে সুখে রাখো—
মোদের যতেক নাত্‌নী-নাতি পাবে রাজ্য-পাট
ও জননী, কৃপা করো, ক্ষমো মোঁদের ঘাট!
মা-ষষ্ঠীর ছেলে-মেয়ে—ষাট্—ষাট্—ষাট্!

ফসল বোনার গান
(আষাঢ় মাস)

আষাঢ় মাসে ভগবানের করুণাধারার মতোই ঝর ঝর ধারায় বর্ষণ শুরু হয়। এই বারি-বর্ষণে শুষ্ক ক্ষেতের মাটি নরম হয়। ক্ষেতে ফসল ফলাবার সেই ত' শুভলগ্ন। চাষীর দল সবাইকে ডেকে বলছে—"চলো সবাই ক্ষেতে যাই—"

চাষী বৌরা বাধা দিয়ে বলছে, "তোমাদের মাথা বাঁচাবার মাথাইল নাই!" কিন্তু

চাষীরা এই শুভ-লগ্নকে বইয়ে দিতে রাজী নয়। তারা জানায়—"এখুনি লাঙল দিয়ে মাঠের জমি নরম করতে হবে।"

তখন চাষী আর চাষী-বৌদের মধ্যে আপোষে মীমাংসা হয়। স্থির হয়—চাষীর দল মাঠে লাঙল দেবে আর চাষী-বৌরা চষা-ক্ষেতে বীজ ছড়িয়ে দেবে, তখন চন্দনের মতো মাটিতে ধানের শীষ দেবতার আশীর্ব্বাদের মতোই জেগে উঠবে। তারপর সেই ধান বড় হবে ; ফসল পেকে সোনা-ধানে পরিণত হবে, মধুর বাতাসে সেই সোনা-ধান হেলবে দুলবে—সকলের আনন্দবর্দ্ধন করবে। চাষী-বৌরা বলছে,—"তখন আমরা সবাইকার সঙ্গে ফসল বোনার গানে যোগ দেবো—আর নেচে-গেয়ে আনন্দ করবো।"

চাষী।। দ্যাওয়া ডাকে ও চাষী ভাই, চলরে ক্ষ্যাতে যাই—
চাষী বৌ॥ যাইওনা, যাইওনা কিষাণ, মাথায় মাথাইল নাই!
চাষী।। দিও নারে মাথার কিরা—
ম্যাঘ যে জমে আকাশ ঘিরা—
লাঙল চালাই,—মাঠের জমি নরম করি ভাই!
চাষী বৌ।। ক্ষ্যাতে ফসল ফললে মোদের মানা কিছুই নাই—
চাষী।। তবে চল্‌না ক্ষ্যাতে যাই—

চাষী।। আমরা যদি চালাইরে হাল—
চাষী বৌ॥ আমরা ছড়াই বীজ—
চাষী।। চন্দনেরই মত মাটি—
চাষী বৌ॥ উঠবে ধানের শীষ!
চাষী।। মধুর বাতাস দোলায় যদি মোদের সোনার ধান
চাষী বৌ॥ আমরা তোগোর সঙ্গে গামু ফসল বোনার গান॥

মনসা-ভাসানের গান
(শ্রাবণ মাস)

বিষহরি মা মনসা—বাংলাদেশে সর্পকুলের রাণীরূপে পূজিতা হয়ে থাকেন। মা মনসা শিবের মানস-কন্যা। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে প্রতি বছর বাংলাদেশের ঘরে-ঘরে মা মনসার পূজো হয়ে থাকে ।

চাঁদসদাগর প্রাচীনকালে মা মনসাকে অস্বীকার করে ছিল। সেইজন্যে তার সাত পুত্র সর্পদংশনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূ বেহুলা পূজোয় ও নৃত্যে মা মনসাকে খুশী করে স্বামীর জীবন ফিরে পায়। এই কাহিনী বাংলাদেশের ঘরে ঘরে

প্রচলিত আছে। মা মনসার আর এক নাম পদ্মাদেবী। পদ্মফুল পদ্মাদেবীর বড় প্রিয়। সেইজন্যে পল্লী-অঞ্চলে পদ্মফুল দিয়ে পদ্মাদেবীর অর্চনা করবার প্রথা প্রচলিত আছে।

মনসা-ভাসান উপলক্ষে বাংলাদেশের নদীবহুল অঞ্চলে নৌকো বাচ্ হ'য়ে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিযোগিতায় পুরস্কারও দেয়া হয়ে থাকে। এই দিনে মা মনসার আশ্রিত সাপদের দুধ-কলা দিয়ে পূজো করবার প্রথাও অনেক অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। পুরাণে কথিত আছে, মা মনসা শিবের আদরের মেয়ে। মহাদেবের অনুরোধেই চাঁদ সদাগর মা মনসার পূজো করেন এবং সেই থেকেই মনসা পূজো পৃথিবীতে প্রচলিত হয়। 'মনসা-ভাসান' পল্লী বাংলার একটি বিশিষ্ট পার্ব্বণ।

বিষহরি মা মনসা—সর্পকুলের রাণী—
মঙ্গল-ঘট বসায়ে মা, শুনবো তোমার বাণী॥
করল হেলা তোমার কথা চাঁদ সদাগর,
তাইতো রে তার সাত-পুত্র মরিল পর পর।।
মা মনসা প্রণাম জানাই জোর করি দুই পাণি—
পদ্মাদেবী, পদ্মফুলে আপন বলে জানি।

মা মনসা, তোমার বরে বাঁচলো লখিন্দর,
বেহুলা তাই সিঁথেয় সিঁদুর পরে অতঃপর।।
শ্রাবণ মাসে প্রতি গাঁয়ে চলে নাওয়ের বাচ,
দুধ-কলাতে পুষ্ট হয়ে সাপরা করে নাচ।
শিবের মেয়ে, চরণ রাখো,—পদ্ম দেবো আনি
বিষহরি মা মনসা,—সর্পকুলের রাণী।

জন্মাষ্ঠমীর গান
(ভাদ্র মাস)

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-উপলক্ষ্যে সারা ভারতবর্ষে জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়। প্রতি বছর ভাদ্র মাসে এই পার্ব্বণ সমাধা হয়ে থাকে।

মহাভারতের কাহিনীতে আছে, অত্যাচারী রাজা কংস তার বোন দেবকীকে কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছিল। কেননা দৈববাণী ছিল যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কংসকে নিধন করবে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের রাত্রে আকাশে দারুণ মেঘের ঘটা। জল, ঝড়, বজ্রপাত। শ্রীকৃষ্ণের

পিতা বাসুদেব দেবতাদের নির্দেশে সেই নিশীথ রাতেই সদ্যোজাত কৃষ্ণকে নিয়ে মথুরা থেকে বৃন্দাবন রওনা হন, এক শেয়াল পথ দেখিয়ে চলে। সর্প ছত্র ধারণ করে। দেবতাদের কৃপায় যমুনার জল এক হাঁটু পরিমাণ হয়। বাসুদেব সবার অজান্তে মা যশোদার মেয়েকে নিয়ে তার জায়গায় শ্রীকৃষ্ণকে রেখে ফিরে আসেন। রাজা কংস সে কথা জানতে পারেন না। এই কৃষ্ণই বড় হয়ে কংসের সকল অত্যাচারের হাত থেকে নিপীড়িত জনগণকে রক্ষা করেন।

এই শুভ দিনটির কথা স্মরণ করে আজও ছেলেমেয়ের দল আনন্দে নৃত্য করে এবং তালের বড়া খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে।

আকাশে কি মেঘের ঘটা, বিজ্‌লি চমক দিল
কংস ভয়ে ওই বাসুদেব কৃষ্ণে তুলে নিল।
কারাগারে জন্ম যে তার—
যাবে এবার যমুনা পার
ভাগ্যগুণে বৃন্দাবনে মা যশোদা ছিল।।

যমুনাতে এক হাঁটু জল, শেয়াল দেখায় পথ-
এবার বুঝি দেবতাদের পুরবে মনোরথ।
এমন দিনে জন্মে কানাই—
আনন্দেতে আয় সবে গাই—
তালের বড়া খেয়ে নন্দ নাচিতে লাগিল।

আগমনীর গান
(আশ্বিন মাস)

শারদীয়া পূজোর ঠিক আগে 'আগমনী' গানে-গানে বাংলার আকাশ-বাতাস ভরে ওঠে।

সেই যে চিরন্তন মায়ের কান্না—"এবারে উমা এলে আর যেতে দেবো না রে।"

মা মেনকার এই কান্নার ভেতর বাংলার মায়েদের কান্না ধ্বনিত হতে থাকে।

মা মেনকা কেঁদে কেঁদে জানায়,—"কৈলাশে মা উমার সোনার বরণ—বারেবারেই কালি হয়ে যাচ্ছে ! এমন পতির ঘরে আমি আর মেয়েকে পাঠাবো না। জামাই আমার ভিখারী, নিজে ভিক্ষে করে বেড়ায়; তাই ত' আমার উমা মায়ের রুক্ষ চুলে তেল পড়ে না.....ছিন্নবাসে তাকে দিন কাটাতে হয়। এই দৃশ্য আমি আর দেখতে পারি না, আমার

উমা-মায়ের গলায় মোতির মালা নেই, সে শাঁখা-সিঁদুর সার করেছে। পাগ্‌লা ভোলা ধুত্‌রা ফুল দিয়ে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে। এবার যখন আমার উমা মা বাপের বাড়ী আসবে,—তাকে আমি চোখের মণি করে রাখবো। উমা আমার মায়ের বুকেই থাকবে—সে ভূতের দ্বারে আর কিছুতেই ফিরে যাবে না।

বাংলা মায়েদের এই যে কান্না—এই যে ব্যথা—সেটা ফুটে উঠেছে—মা মেনকার কাতর আর্ত্তনাদে। মায়েরা মেয়েদের শ্বশুরবাড়ীতে পাঠিয়ে নীরবে চোখের জল ফেলে। সেই চোখের জলে ভেজা "আগমনী গান" অতি প্রাচীনকাল থেকে ভেসে বেড়াচ্ছে বাংলার আকাশে-বাতাসে। ওই যে শোনা যাচ্ছে—"এবারে উমা এলে যেতে আমি দেবো না রে!"

এবারে উমা এলে যেতে আমি দেবো না রে—
কৈলাশে মার সোনার বরণ কালি হল বারে বারে।
জামাই আমার ভিখারী যে—
ভিক্ষা করে বেড়ায় নিজে
(তাই) রুক্ষ চুলে তেল পড়ে না, ছিন্ন-বাসে দেখবো মারে।

(মা যে) শাঁখা-সিঁদুর সার করেছে, মোতির মালা নেইত গলে,
পাগ্‌লা ভোলা ধুত্‌রা ফুলে ভোলায় তারে কতই ছলে।
এবার এলে মা জননী—
করবো তারে চোখের মণি—
মায়ের বুকে থাকবে উমা, যাবে না আর ভূতের দ্বারে।।

ভাই-ফোঁটার গান
(কার্ত্তিক মাস)

প্রতি বছর সারা ভারত জুড়ে "ভাই-ফোঁটা" উৎসব পালিত হয়ে থাকে। ভাই-ফোঁটার মতো মধুর পার্ব্বণ পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে আছে কিনা আমাদের জানা নেই।

এই দিন বোনেরা খুব ভোরে উঠে স্নান করে, ফুল তোলে, ধান-দুর্ব্বো সাজায়, কাজল তৈরী করে আর মঙ্গল-প্রদীপ জ্বালায়। নিজের হাতে চন্দন ঘষে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা পরিয়ে দেয়। এই ফোঁটা পরাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাইদের দীর্ঘ জীবন কামনা করে। তারপর নিজেদের হাতে তৈরী নানারকম মিষ্টি আর খাবার ভাইয়েদের খেতে

দেয়। ভাইরাও বোনেদের নানারকম উপহার দেয়। ভাই আর বোনের মধুর প্রীতির কথা স্মরণ করে প্রতি ঘরে বাপ মায়েরাও খুশী হয়ে ওঠেন।

পুরাণের গল্পে আছে যে,—যম রাজার বোন যমুনা যমরাজাকে ভাই-ফোঁটা দিয়েছিল বলে ধর্ম্মরাজ যম অমর হয়ে আছেন। তাই প্রতি বছর কার্ত্তিক মাসে ভারতের বোনেরা ভাইদের কপালে চন্দন-তিলক এঁকে দিয়ে তাদের দীর্ঘজীবন কামনা করে। বাংলাদেশের যার নাম "ভাই ফোঁটা"—পশ্চিম ভারতে সেই উৎসব "ভাইচারা" নামে প্রচলিত আছে। ওই যে বোনের দল আসছে ভাই-ফোঁটা দিতে। আমরা গান শুনতে পাচ্ছি।

আমরা বোনের দল!
ভাই-দ্বিতীয়ায় যোগ দিবি কে মোদের সাথে চল।।
জ্বালবো আজি ঘিয়ের প্রদীপ,
চন্দনে ভাই পরবি কে টিপ?
মিষ্টি দিলে হাতে-হাতে উঠবে কোলাহল—
ফোঁটা নেবার লগন এলো, ভায়েরা চঞ্চল।।

যমুনা বোন যম রাজারে ফোঁটা দিল কবে?
মোদের ফোঁটায় ভাইয়ের দলে সবাই অমর হবে!
ভাই-বোনের এই মধুর পরব
আমরা করি তাহার গরব,
ভাই-ফোঁটাতে প্রীতির রাখি বাঁধবি কে ভাই বল !

নবান্নের গান
(অগ্রহায়ণ মাস)

অগ্রহায়ণ নবান্ন-উৎসবের মাস।

এই মাসে ধান পেকে সোনার-বরণ ধারণ করে—তাই চাষীর দল ঢোলক বাজিয়ে নাচে-গানে উৎসব শুরু করে দেয়। চাষী বৌরাও এসে সেই উৎসবে যোগদান করে।

সোনাধানে চাষীদের গোলা ভরে ওঠে। তোলা-তোলা সোনার মতো যত্ন করে চাষীরা ফসল ঘরে তুলে রাখে। চাষী বৌরা বলে, লক্ষ্মীমায়ের চরণের ছোঁয়া পেয়েছে বলেই ধানের বরণ সোনার মতো হয়েছে। চাষীরাও সেই কথায় সায় দেয়। দুখীর ঘরে আর কোনো চিন্তা থাকে না—সবাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

তারপর সেই নবান্ন উৎসবের কথা। গাঁয়ের বৌ-ঝিরা নতুন চালের সঙ্গে নারকেল

আর গুড় মিশিয়ে সুন্দর নবান্ন তৈরী করে। আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে আসা হয়। সকলের হাতে-হাতে সেই নবান্ন তুলে দেওয়া হয়। প্রত্যেক গেরস্ত-বাড়ীতে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।

মেঠো সুরে বাঁশের বাঁশী বাজতে থাকে—সঙ্গে বাজে ঢোলক। চাষী আর চাষী বৌরা নাচে-গানে মেতে ওঠে—। চাষীর হাসি দেখে সবাই খুশী হয়। মা লক্ষ্মীর দয়ায় সারা গাঁয়ে যেন আনন্দের প্লাবন জাগে।

চাষী।। সোনা ধানে ভরল গোলা—
রাখ্‌না সোনা তোলা তোলা—
ঢোলক বাজা ওরে চাষী ভাই !
চাষী বৌ।। লক্ষ্মী মায়ের পড়ল চরণ—
তাই ত' রে ধান সোনার বরণ
চাষী।। দুখীর ঘরে চিন্তা ত' আর নাই।।
চাষী বৌ।। নতুন চালের সঙ্গে মেশাই নারকেল আর গুড়—
চাষী।। কুটুম্বরে ডাক্‌রে কাছে —আছে যে জন দূর!
চাষী বৌ।। নবান্ন আজ ঘরে ঘরে—
চাষী।। চাষীর হাসি উপছে পড়ে—
উভয়ে।। মেঠো সুরে বাঁশের বাঁশী বাজছে কেবল তাই—
ঢোলক বাজা ওরে চাষী ভাই।।

পৌষ-পার্ব্বণের গান
(পৌষ মাস)

পৌষ মাসের কথা উঠলেই প্রথমে মনে জাগে শীতের কথা। শীতের দিনে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ছেলেমেয়েরা কি করতে সব চেয়ে ভালবাসে?

শহরের ছেলেমেয়েরা কি ভালবাসে সেটা বলা শক্ত; তবে পল্লী-অঞ্চলের ছোটর দল পিঠে পেলে আর কিছু চাইবে না?

এই পিঠে খাবার দিন হচ্ছে—পৌষ মাসের শেষ দিনটা। এই উৎসবের নাম হচ্ছে পৌষ-পার্ব্বণ উৎসব।

ছোটদের জন্যে যত পালা-পার্ব্বণ আছে—তার ভেতর পৌষ-পার্ব্বণ খুব জনপ্রিয়। পল্লী-অঞ্চলে বহুদিন আগে থেকেই ঢেঁকির পাড় শোনা যায়। গাঁয়ের বৌ-ঝিরা চাল গুঁড়ো করে রাখে। তাই দিয়েই ত' নানাবিধ পিঠে তৈরী করতে হবে। এই পৌষ-

পার্ব্বণের দিন কলসী-কলসী দুধ আসে, হাঁড়ি-হাঁড়ি গুড় আসে, পুলি-পিঠে, ক্ষীর, পরমান্ন কত কিছু তৈরী করবে—ঠাকুমা-দিদিমা-মা-খুড়িমার দল। সার-সার উনুন জ্বেলে নেয় বৌরা। সারা দিন ধরে পিঠে তৈরী করা চলে।

বাংলাদেশের পল্লী-অঞ্চলে পিঠের কত নাম। আস্কে পিঠে, চিঁতে পিঠে, চন্দ্রপুলি, পাটিসাপ্‌টা, রসকদম্ব, আউলা-ঝাউলা, পরচিত্তহারিণী, পুলি-পিঠে—সে নামের আর শেষ নাই। পৌষ-পার্ব্বণের দিন সকাল থেকে পাড়াগাঁয়ের প্রতিটি গৃহে হুল্লোড় শুরু হয়ে যায়। আন্—ঢাল্—আর খা। সেকালের মানুষ খেতেও পারতো খুব, আর ছেলেমেয়েদের ত' কথাই নেই। সারা দিন ধরে তাদের মুখ চলছে। এই পৌষ-পার্ব্বণ উৎসব এইবার সুরু হচ্ছে—

পৌষ মাসের শেষ দিনটা
লাগে বড় মিঠা—
রোদ্দুরেতে পিঠ দিয়ে ভাই—
ছেলেরা খায় পিঠা!
গাঁয়ের বধূ ঢেঁকির পাড়ে
গুঁড়ো করে চাল.—
দুধ দুয়েছে কলসী-ভরা—
এবার উনুন জ্বাল।
গুড়ের হাঁড়ি রাখলি কোথা?
কড়ায় কেবল ঢাল !

আন্‌না—ইটা সিটা—
লাগে বড় মিঠা!
পৌষ মাসের পিঠা!
আস্কে পিঠা, চিঁতে পিঠা,
চন্দ্রপুলি, ক্ষীর—
পুলি পিঠা, পাটি-সাপ্‌টা—
দেখেই লাগে ভীড়!

ছেলের দলে গোছা-গোছা
আনে কলার পাত—
নলেন গুড়ের সুবাসে ভাই,
পল্লী হল মাৎ !

পাশাপাশি যাওনা বসে,—
দাও সবে সাথ্ সাথ্,—
(আজ) ভর্ত্তি সবার ভিটা—
(তাই) লাগে বড় মিঠা—
পৌষ মাসের পিঠা !

বাণী-বন্দনার গান
(মাঘ মাস)

দেবী বীণাপাণি—বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই তাঁর অপর নাম বাণী দেবী।

মাঘ মাসে বাংলার ঘরে-ঘরে বাণী-বন্দনা হয়। আর এই বন্দনার সেরা পুরোহিত হচ্ছে ছেলে-মেয়ের দল। তাদের চেষ্টা আর আন্তরিকতাতেই ঘরে-ঘরে বাণী-বন্দনার আয়োজন হয়ে থাকে। কিশোর-কিশোরীরা এই উপলক্ষে নিজের হাতে মূর্তি নির্ম্মাণ করে,—নানাভাবে দেবীর পূজা-বেদী সাজায়, নৃত্য-গীতানুষ্ঠান, অভিনয় ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে। কেননা বীণাপাণি নৃত্য-গীত ও শিল্পকলারও অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ছোটর দল দোয়াতের কালি ফেলে দিয়ে তাতে দুধ ভরে নেয়। খাগের কলম ডান হাতে বাগিয়ে ধরে, আর দেবীর পাদপীঠে সাজিয়ে দেয় তাদের গ্রন্থরাজি। তারপর তারা পুষ্পাঞ্জলি দেয় দেবীর পদমূলে। ছোটরাই এইভাবে সারা দেশময় জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে। বাণী-বন্দনার এই বিশেষ দিনটিতে অনেক অঞ্চলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই শুভদিনে ছেলে-মেয়ের দল আন্তরিকভাবে কামনা করে—দেবী বীণাপাণি যেমন সর্ব্বশুক্লা—তেমনি ছোটদের মনও সর্ব্ব-কালিমা-মুক্ত হয়ে শুভ্র ও সুন্দর হোক।

এইবার শুরু হচ্ছে বাণী-বন্দনার 'উৎসব'। বোনের দল মায়ের চরণে অঞ্জলি দিতে এগিয়ে আসছে—

আয় ভাই-বোন, বাণী-বন্দনা আজি—
মায়ের চরণে অঞ্জলি দিতে কুসুমে ভরে নে সাজি।
খাগের কলম রাখ্ ডান হাতে—
কাঁচা দুধ সবে ঢাল না দোয়াতে—
নিষ্ঠাই তোর হউক মন্ত্র,—মিথ্যাতে নহে রাজি!
বাণী-বন্দনা আজি!

জ্ঞানের প্রদীপ জ্বাল ভাই-বোন
দেশে-দেশে ঘরে-ঘরে—
আপন বিদ্যা দান করে দিবি—
আজি সকলের তরে।
সর্ব্ব-শুক্লা মোদের জননী—
অজ্ঞান মনে জ্বাল মহামণি—
জীবন তোদের বিকশিত হোক—
যেন শতদল রাজি—
বাণী-বন্দনা আজি।

দোল-পূর্ণিমার গান
(ফাল্গুন মাস)

ফাল্গুন মাসে দোল-পূর্ণিমা।

দোল-পূর্ণিমায় হোলি খেলা ভারতবর্ষের চিরন্তন উৎসব।

এই বিশেষ দিনটিকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হোলি খেলা চলে। গুরুজনদের পায়ে আবির দিয়ে এই দিন প্রণাম করতে হয়। আর তাঁদের শুভাশিস্ চেয়ে নিতে হয়। যাদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক, তাদের নিয়ে সারাদিন ধরে চলে হোলি খেলা। লালে লাল হয়ে যায় সারা দেহ, আর সেই সঙ্গে সবাইকার মন। আবীরে কুঙ্কুমে রঙের পিচ্‌কারীতে রঙীন হয়ে যেন সবাইকার মন মিতালীর অদেখা বাঁধনে বাঁধা পড়ে।

এই দিন মনে কোনো হিংসা-দ্বেষ-গ্লানি রাখতে নেই। সকলের প্রীতি আর শুভেচ্ছার পশরা সাজিয়ে মধুর হয়ে ওঠে রঙীন দিনটি।

পুরাণের কাহিনীতে পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ এই দোল-পূর্ণিমায় শ্রীরাধিকা ও ষোলশ গোপিনীর সঙ্গে বৃন্দাবনের মধুবনে হোলি খেলেছিলেন। সেই মধুর সন্ধ্যায় প্রতিটি গোপিনীর মনে হয়েছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ তারই সঙ্গে নৃত্য করছেন। সেদিন বসন্ত-সমাগমে গাছে গাছে নানা রঙের ফুল ফুটেছিল, বনের যত পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ—সবাই এসে সমবেত হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের দোল খেলা দেখতে। অন্তরীক্ষে দেবতারা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন রাধাকৃষ্ণের দোললীলা মনে-প্রাণে উপভোগ করতে। সেদিন সাপ হিংসা ভুলে মধুবনে এসে দোল-পূর্ণিমায় উপস্থিত হয়েছিল। বনের হরিণীর দল স্তব্ধ বিস্ময়ে রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলন দেখে নিজেদের ধন্য মনে করেছিল। ময়ূরের দল

সেদিন পেখম মেলে গোপিনীদের সঙ্গে নৃত্য করেছিল। বনের বাঘ-সিংহ প্রভৃতি হিংসা ভুলে মধু-বনে সমবেত হয়েছিল পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোছনায় অবগাহন করতে। রাধা-কৃষ্ণের নৃত্যের তালে তালে কোকিল তার কুহুতানে মধু-বনকে করেছিল মধুময়।

সেদিন সেই পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে প্রতিটি প্রাণে যেন জোয়ার জেগেছিল। মনে হয়েছিল, এই মর্ত্ত্যভূমে যেন আর দুঃখ কষ্ট-বেদনা নাই। শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলী-ধ্বনিতে সকল যন্ত্রণার উপশম হয়েছিল। রঙীন আবীরে সারা মধু-বন রাঙা হয়ে উঠেছিল। গোপিনীদের মধুর নূপুর নিক্কণে প্রাণে-প্রাণে এক শিহরণের সৃষ্টি করেছিল। সখির দল এক বৃক্ষ শাখে দোলনা দুলিয়ে দিয়েছিল। তাতে বসে রাধা-কৃষ্ণ দোল খেলেছিল! সেই দোলনার দোলায় যেন সারা বিশ্ব অসীম আনন্দে দুলে উঠেছিল।

মধুর বসন্তকালে এই দোল পূর্ণিমা বা হোলি উৎসব সম্পন্ন হয়ে থাকে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই উৎসবের বিভিন্ন নাম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-রাধার নৃত্যোৎসবকে কেন্দ্র করেই দোল পূর্ণিমার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে। যুগে যুগে বৈষ্ণব কবিগণ এই দোল-পূর্ণিমার নামে কত গান রচনা করেছেন—তা যেমন মধুর, তেমনি অফুরন্ত। কৃষ্ণ-কথা চিরকালের মধুরতা মাখানো। যত শোনো—তত মধুময় হয়ে ওঠে।

রাধা কৃষ্ণ দোলে !
মধুবনে কি বাঁশুরী মন-প্রাণে ভোলে !
গোপিনীরা জ্যোছনায় খেলিছে হোরি—
রাধা-শ্যাম মাঝখানে মরি লো মরি।

ময়ুর মনের সুখে পেখম তোলে।
রাধা কৃষ্ণ দোলে ।।
পূর্ণিমা চাঁদে বলো ফাগে কে রাঙায়?

শুক-সারি শীষ দিয়ে ইতি-উতি চায়!
যমুনার রাঙা জলে কি মুখ ভাসে—
যে প্রাণে জোয়ার জাগে—ছুটে যে আসে!
পিক তার কুহু তান পঞ্চমে তোলে—
জ্যোছনায় ভোলে—
রাধা-কৃষ্ণ দোলে !

গাজনের গান
(চৈত্র মাস)

চৈত্র মাসের গাজন হচ্ছে—পালা-পার্ব্বণের শেষ অনুষ্ঠান।

এই চৈত্র মাসে—বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিতে হতে থাকে —"বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে—হর হর মহাদেব।"—শঙ্কর শিব।

শিব-ভক্তেরা এই মাসটি কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের ভেতর দিয়ে কাটায়। এক বেলা খায়, রুক্ষ চুলে তেল দেয় না। দোরে দোরে ভিক্ষা করে, আর শিবঠাকুরের নামে নানারকমে ছড়া কাটে, গান গায়। ড্যা-ড্যা-ড্যাং—ড্যা-ড্যাং—ড্যা-ড্যাং শব্দে ঢাক বাজতে থাকে পল্লীর এ কোণ থেকে ও কোণ অবধি।

তাই আমরা বলবো—পল্লী-বাংলার প্রাণ স্পর্শ করতে হলে, জনসাধারণের সঙ্গে গাজন নৃত্যে যোগদান করতে হবে। আভিজাত্যের উঁচু চূড়ো থেকে নেমে আসতে হবে ধূলির ধরণীতে—ওই সর্ব্বত্যাগী শঙ্করের মতো। গাজনের গান বাংলার জনসাধারণের লোক-সঙ্গীত। কাজেই সেই ভাবেই সে গান রচনা করা হয়েছে।

ভোলানাথ ভুল করে বেশী ভাং খেয়ে ফেলেছেন—তাই নিয়ে কি রগড়ের সৃষ্টি হল— গাজনের গানে তাই ফুটে উঠবে। উমারাণী রাগ করে বাপের বাড়ী চলে যেতে চাচ্ছেন। ইঁদুর-বাহন গণেশদাদা মুখ হাঁড়ি করে বসে আছেন। নন্দীখুড়ো, ভৃঙ্গীখুড়ো কি বিপদেই পড়েছেন! সাপগুলি কিলবিলিয়ে নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। আর শিবের বাহন ষাঁড় শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছে। এসো, আমরা সবাই গাজন-নৃত্যের হুল্লোড়ে মেতে উঠি—

এবার ভোলা ভুল করে ভাই
ভাং খেয়েছে ভারী—
গাজনের বাজনা বাজা,
আয় না তাড়াতাড়ি!
ড্যাড্যাড্যাং—ড্যাড্যাং—ড্যাড্যাং—

মান করে ভাই উমারাণী
যাবে বাপের ঘর—
ভেবে আকুল ভোলা কি যে
করবে অতঃপর ॥

ইঁদুর-বাহন গণেশ দাদা,
মুখ করেছে ভারী—
তোরা আয় না তাড়াতাড়ি
ড্যাড্যাড্যাং—ড্যাড্যাং—ড্যাড্যাং—

নন্দীখুড়ো, ভৃঙ্গীখুড়ো
যাবে মায়ের সাথে—
সিদ্ধি-দাতা সিদ্ধি বিনা
দুই নয়নে কাঁদে!

সাপগুলি সব কিল্‌বিলিয়ে
সুড়সুড়ি দেয় নাকে
শিবের বাহন ষাঁড় যে রে ভাই
শিং উঁচিয়ে ডাকে!

তাইত ভয়ে মহেশ্বরের
ছাড়েই বুঝি নাড়ি—
তোরা আয় না তাড়াতাড়ি-
ড্যাড্যাড্যাং—ড্যাড্যাং—ড্যাড্যাং—

মনীষীদের জন্মদিন পালন

তোমরা বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন মনীষীর জন্মদিন পালন করে থাকো। এই জন্মদিন-পালনের উৎসবটি ভারী সুন্দর। শুচিতা বজায় রেখে সুন্দর পরিবেশে যদি মহাপুরুষের জন্মদিন পালন করো, তবে সেই অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তোমরা সকলেই অনেক কিছু শিখতে পারো।

যেমন ধরো, বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের জন্ম। এমনি ভাবে তোমরা বছরের গোড়া থেকে একটি নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করো ত' দেখতে পাবে, প্রায় প্রতি মাসেই এক একজন মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের জন্মদিন পালন করার দায়িত্ব ত' তোমাদের।

কেন না— মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধরে
তোমরাও হবে বরণীয় ।।

যে মনীষীর জন্মদিন পালন করবে—তাঁর একটি বিশ্বাসযোগ্য জীবনী সংগ্রহ করে তোমরা সকলে বসে পাঠ করবে। তারপর স্থির করবে, সেই মহাপুরুষের জীবনী থেকে তোমরা কি শিক্ষা লাভ করতে পারো।

মনীষীদের জন্মদিন পালনের উৎসবে তোমরা সব সময় শ্বেত-শুভ্র বস্তু ব্যবহার করবে। যেমন ধরো—সাদা মালা, সাদা ফুল, শ্বেত-শুভ্র আলপনা, সাদা চাঁদমালা, সাদা চাদরের সুন্দর যবনিকা ইত্যাদি। এতে অনুষ্ঠানের শুচিতা সকলের কাছে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

প্রথমেই জন্মদিন পালনের একটি সুন্দর পরিকল্পনা তোমরা করে নাও। ধরো, তোমরা ঘরোয়া বৈঠকে ঠিক করলে, সন্ধ্যেবেলা সকলে শুদ্ধ মনে মিলিত হয়ে এই জন্মদিন পালন করবে।

প্রথমে সেই মনীষীর জীবনী একজনে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করলে। অন্য কেউ তাঁর উল্লেখযোগ্য বাণীগুলি পৃথক কাগজে লিখে নিলে। তোমাদের মধ্যে যারা ভালো ছবি আঁকতে পারো, তারা কেউ সেই মনীষীর ছবি এঁকে ফেললে। অপর কয়েকজন তাঁর ভালো বাণীগুলি বড় বড় অক্ষরে কাগজে অথবা পিস্‌বোর্ডের ওপর লিখে অনুষ্ঠান-প্রাঙ্গণের চারদিকে টাঙিয়ে দিলে। সেই মনীষীর সুন্দর ছবিটি আর একজন সাদা ফুল ও মালা দিয়ে সাজিয়ে ফেললে।

মেয়েদের মধ্যে যারা ভালো আলপনা জানো, তারা একসঙ্গে বসে মেঝের ওপর একটি কারুশিল্প-মণ্ডিত আলপনা অঙ্কিত করে নিলে। ঘন করে পিটুলি গোলা জলের সঙ্গে ডালবাটা মিশিয়ে তাই দিয়ে আলপনা দিলে—শুকিয়ে যাবার পর অতি চমৎকার দেখাবে। এই আলপনা মাটির মেঝেতে কিম্বা সিমেন্টের ওপরও দেওয়া চলবে। মনীষীর প্রতিকৃতির সামনে তোমরা ধূপ-ধূনো জ্বালিয়ে দেবে—তাতে উপস্থিত সকলকার মনে একটা পবিত্র ভাব জাগবে।

প্রথমে তোমাদের মধ্যে যে ভালো গান জানো, সে একটি সুন্দর গান গাইবে।

এই জন্মদিন উপলক্ষে যদি আগে থেকে একটি উপযোগী গান তৈরী করে রাখো, তবে সব চাইতে ভালো হয়।

প্রয়োজনমতো তোমরা গানটি এককও গাইতে পারো; আবার যদি মনে করো সমবেত কণ্ঠে গীত হলে সঙ্গীতটি সুমধুর হবে, তা হলে তোমরা ছেলে-মেয়েরা মিলে গানটি গাইবে।

মনীষীদের জন্মদিনে উদ্বোধন-সঙ্গীত-হিসেবে তোমরা নীচের গানটি সমবেত-কণ্ঠে গাইতে পারো—

জন্মোৎসবের গান

মঙ্গলক্ষণে শঙ্খ বাজিছে...লগ্ন যে মধুময়
আজিকার দিনে পুণ্য-ভবনে তোমার জনম হয়।
তাই মিলি মোরা ছেলে-মেয়ে-দল—
জ্বালি ধূপ-দীপ, আনি ফুল-ফল
তোমার জীবনী শুনি আর ভাবি—এই নব-পরিচয়
লগ্ন যে মধুময় ।।
তোমার চরণ-চিহ্ন ধরিয়া আমরা চলিব পথ—
মহাজ্ঞানী তুমি, তোমার আশিসে পূরে যাবে মনোরথ।
যদি নেভে আলো ঝড়ের হাওয়ায়
জ্বেলো আঁখি-দীপ গগনের গায়
তোমারে বরিব, তোমারে স্মরিব,.....জয় জয় তব জয়!
আজিকার দিনে পুণ্য-লগনে তোমার জনম হয়।।

ধরো, তোমরা ঘরোয়া আলোচনা-সভায় ঠিক করলে যে, বুদ্ধদেবের জন্মদিন পালন করবে। সেই সঙ্গে এ কথাও ধার্য হল যে, সেইদিন সন্ধ্যায় তোমরা বুদ্ধদেবের জীবনীকে কেন্দ্র করে একটি নৃত্য-নাট্য অভিনয় করবে। বৈশাখী-পূর্ণিমায় অভিনয় করতে

পারো—সেই ভাবে নাটকটিকে সাজিয়ে নিতে হবে। আমি তোমাদের অভিনয়ের সুবিধের জন্যে বুদ্ধদেবের জীবনীকে কেন্দ্র করে একটি নৃত্য-নাট্য করে দিলাম।

এই নাটকটি অভিনয়ের পূর্ব্বে তোমরা ভালো করে শিল্পী নির্ব্বাচন করে নেবে। যারা নাচ ভালো জানে তাদের নৃত্যাংশের ভূমিকা দেবে। যার গান ভালো জানে তারা মাইকে বসে নেপথ্য থেকে অভিনয় কালে গানগুলি গাইবে। নাচতে হবে না, কিম্বা গাইতে হবে না—এ জাতীয় কয়েকটি ভূমিকাও নাটকে থাক্‌লো। যারা সুন্দর অভিনয় করতে পারো তারা সেই ভূমিকাগুলি গ্রহণ করে নিজেদের গুণপণা দেখাতে সচেষ্ট হবে।

ভূমিকা অনুযায়ী পোষাক-পরিচ্ছদ যদি নিজেরা হাতে-হাতে তৈরী করে নাও—তা হলে তার চাইতে আনন্দের কথা আর কিছু হতে পারে না।

"বুদ্ধদেব"

[একটি সুন্দর উদ্যান। কপিলবাস্তুর রাজা শুদ্ধোদন কথা বলতে বলতে সেই উদ্যানে প্রবেশ করলেন। চারদিকে সুন্দর ফুল ফুটে আছে। পাখীর গান শোনা যাচ্ছে: রাজা শুদ্ধোদনের সঙ্গে রয়েছেন রাজ-জ্যোতিষী]

শুদ্ধোদন ।। রাজ-জ্যোতিষী, আমি আপনার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করতে চাই। তাই এই নির্জ্জন উদ্যানে আপনাকে ডেকে এনেছি।

রাজ-জ্যোতিষী ।। আদেশ করুন, মহারাজ শুদ্ধোদন। আপনি কপিলবাস্তুর রাজা আর আমি আপনার আশ্রিত রাজ জ্যোতিষী আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবো।

শুদ্ধোদন ।। আচ্ছা, রাজ-জ্যোতিষী, আপনি ত' রাজকুমার গৌতমের করকোষ্ঠী দেখেছেন?

রাজ-জ্যোতিষী ।। আজ্ঞে, হ্যাঁ মহারাজ, দেখেছি—

শুদ্ধোদন ।। কুমারের কোষ্ঠীবিচার করে আপনি তার ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে আমায় কিছু বলুন। আমি কুমারের সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। আপনি ত' জানেন যে, ওর জন্মের পরেই মহারাণী দেহরক্ষা করেছেন। তাই একাধারে পিতা ও মাতার স্নেহ দিয়ে আমি ওকে পালন করেছি। সুন্দরী কন্যা গোপার সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছি। এখন কুমারের ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে আমি সত্যি ব্যাকুল হয়ে পড়েছি।

রাজ-জ্যোতিষী ।। মহারাজ—[মাথা নত করলেন]

শুদ্ধোদন ।। একি জ্যোতিষী-প্রবর, আপনি মাথা নত করেছেন কেন? কুমারের করকোষ্ঠীতে কি আছে—কোনো কথা গোপন না করে আমায় সব খুলে বলুন—

রাজ-জ্যোতিষী ।। মহারাজ, ভয়ে বলবো—কি নির্ভয়ে বলবো?

শুদ্ধোদন ।। জ্যোতিষী-প্রবর, আপনার আচরণ দেখে সত্যই আমি বিস্মিত হচ্ছি। কুমার গৌতম কি দীর্ঘজীবী হবে না?

রাজ-জ্যোতিষী।। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন, মহারাজ। আমাদের কুমার আশি বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন।

শুদ্ধোদন।। তবে আপনি ইতস্তত করছেন কেন জ্যোতিষী-প্রবর? কুমার কি রাজ্যহারা হয়ে অতিকষ্টে দিন কাটাবে?

রাজ-জ্যোতিষী।। ঠিক তাও নয়, মহারাজ। কুমার গৌতমের হাতে রয়েছে সন্ন্যাস-যোগ। সংসারের কোনো আকর্ষণই তাঁকে বেঁধে রাখতে পারবে না!

শুদ্ধোধন।। সন্ন্যাস-যোগ! আপনি বলছেন কি, রাজ-জ্যোতিষী? আমার কুমার সন্ন্যাসী হবে? কিসের তার অভাব? কপিলবাস্তু রাজ্যে রাজপ্রাসাদ, দাস-দাসী, সৈন্য-সামন্ত, মণি-মুক্তো, আমোদ-প্রমোদ কিছুরই ত' অভাব নেই। লক্ষ্মী-প্রতিমার মতো রাজবধূ আমি ঘরে এনেছি। তার দিকে চাইলে দু' চোখ আমার জুড়িয়ে যায়। তবে কিসের দুঃখে কুমার গৌতম সন্ন্যাসী হবে?

রাজ-জ্যোতিষী।। সে কথা ত' বলতে পারিনে, মহারাজ। তবে এইটুকু ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, কুমার রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে যে সম্মান পেতো, তার লক্ষগুণ বেশী সম্মান আর শ্রদ্ধা লাভ করবে বিশ্ববাসীর কাছ থেকে। আপনার পুত্রের জয়গানে সমগ্র জগৎ মুখরিত হয়ে উঠবে, মহারাজ।

শুদ্ধোদন।। আমি শুনতে চাইনে সন্ন্যাসীর জয়গানের কথা—পুত্রকে আমি সিংহাসনে বসাতে চাই—ওর মায়ের কাছে যে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—কুমারকে সিংহাসনে বসিয়ে তবে আমি বানপ্রস্থ অবলম্বন করবো—

রাজ-জ্যোতিষী।। হয়ত আপনার সে সাধ পূর্ণ হবে না, মহারাজ!

শুদ্ধোদন।। ওই অলক্ষুণে কথা আপনি আমায় আর শোনাবেন না, রাজ-জ্যোতিষী। আচ্ছা, আপনি এখন বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন।

রাজ-জ্যোতিষী।। যথা-আজ্ঞা, মহারাজ— [ধীরে ধীরে প্রস্থান]

[মহারাজ শুদ্ধোদন হতাশ হয়ে একটি বেদিকার ওপর বসে দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকলেন। তারপর হঠাৎ ডাকলেন ঃ]

শুদ্ধোদন।। ছন্দক—ছন্দক— (ছন্দকের প্রবেশ)

ছন্দক।। আদেশ করুন মহারাজ...

শুদ্ধোদন।। আজ থেকে আমি তোমায় কুমার গৌতমের সারথি আর সকল সময়ের সঙ্গী নিযুক্ত করলাম...

ছন্দক।। (প্রণাম জানিয়ে) এ আমার পরম সৌভাগ্য, মহারাজ! যে সম্মান আমি আজ আপনার কাছ থেকে লাভ করলাম—আমি যেন তার যোগ্য হতে পারি।

শুদ্ধোদন।। শোনো ছন্দক, সব সময় কুমারের সঙ্গে সঙ্গে তুমি থাকবে! দেখবে, কোনো বিকৃত মানুষ কিংবা কোনো কুৎসিত দৃশ্য যেন কুমারের সম্মুখে না পড়ে। শুধু হাসি, গান, আনন্দ, এই দিয়ে কুমারকে সর্ব্বদা ভুলিয়ে রাখবে। কুমার যখন বেড়াতে বেরোবে—কখনো তুমি তাকে একা যেতে দেবে না। সব সময় ছায়ার মতো তার সঙ্গে থাকবে। ওই যে কুমার গৌতম এই দিকেই আসছে, আমি যাই। দেখো, সব সময় লক্ষ্য রাখবে—

ছন্দক।। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, মহারাজ—

[শুদ্ধোদনের একদিক দিয়ে প্রস্থান, অপরদিক দিয়ে গৌতমের প্রবেশ]

গৌতম।। এই যে ছন্দক, তুমি এখানেই রয়েছ। আমি এতক্ষণ তোমাকেই খুঁজছিলাম—

ছন্দক।। কুমার কি এখন বেড়াতে যাবেন? তা হলে আমি রথ নিয়ে আসি—

গৌতম।। না-না ছন্দক, রথ নয়। বিলাস, ঐশ্বর্য্য, সমারোহ, আনন্দ, উল্লাস যেন আমাকে দম বন্ধ করে মেরে ফেলতে চায়।

ছন্দক।। সে কি কথা, কুমার? মহারাজ ত' আপনার কোনো অভাবই রাখেননি। তবু আপনার মন এত বিষণ্ণ থাকে কেন?

গৌতম।। কেন বিষণ্ণ সেকথা আমি বলতে পারি না, ছন্দক। আমার মনের তারে কেবলি যেন একটি বিষাদের সুর ঝঙ্কৃত হতে থাকে। আমার পাশে থেকেও তোমরা কেউ সে সুর শুনতে পাও না। কিন্তু সেই কান্নার সুর আমাকে পাগল করে তোলে। মনে হয় কোথাও চলে যাই। দূরে—দূরে—অনেক দূরে!

ছন্দক।। (আপন মনে) সর্ব্বনাশ! কুমারের এ ভাবান্তর ত' ভালো নয়। মহারাজকে সব কথা আগে থেকেই জানাতে হবে।

[হঠাৎ একটি করুণ সুর ধ্বনিত হয়ে উঠলো। জরাগ্রস্ত একটি লোক নৃত্যের ভঙ্গিতে প্রবেশ করল। তার প্রতি পদক্ষেপে হতাশা ও অক্ষমতা ফুটে উঠলো।]

গৌতম।। ছন্দক—ছন্দক—ওকি হতাশার প্রতিমূর্ত্তি? কোথায় আনন্দ, কোথায় উৎসবের গান? আমি ত' শুনতে পাচ্ছি এক সর্ব্বহারার বিলাপ। কে এই সর্ব্ব-হারা—আমায় বলো, ছন্দক—

ছন্দক।। এও আমাদের মতো মানুষ, রাজকুমার। জরার আক্রমণে এই লোকটি একেবারে অথর্ব্ব হয়ে গেছে। জীর্ণ-শীর্ণ দেহ নিয়ে সোজা হয়ে চলতে পারছে না—

গৌতম।। আচ্ছা ছন্দক, সব মানুষেরই কি একদিন এই অবস্থা হবে? জরার হাত থেকে কি কারো নিস্তার নেই?

ছন্দক।। সত্যি তাই, রাজকুমার। বেঁচে থাকলে একদিন সবাইকেই এমনিভাবে জরায় স্থবির হতে হবে। তখন অন্যের সাহায্য ছাড়া সে পথ চলতে পারবে না—

গৌতম।। ছন্দক—ছন্দক—একথা জেনেও তুমি আমাকে আনন্দে আর উল্লাসে মেতে থাকতে বলো? [জরাগ্রস্ত লোকটির কাছে গিয়ে] কি করে তোমার এই অবস্থা হল—আমায় খুলে বলো! একদিন কি তুমি সুন্দর তরুণ ছিলে? এই পৃথিবী কি তোমার কাছে অপরূপ ছিল? ফুলের গন্ধ, পাখীর গান, চাঁদের আলো কি তোমার মনে একদিন দোলা লাগাতো? সব খুলে বলো আমায়, আমি শুনতে চাই, আমি জানতে চাই......

জরাগ্রস্ত লোকের নৃত্য-গীত

[দেহের ভঙ্গিমায় সে তার করুণ-কাহিনী ব্যক্ত করবে। মঞ্চের ভেতর থেকে মাইকের সাহায্যে গানটি শোনা যাবে]

জরাগ্রস্তের গান

একদিন ছিল...এই দেহে মোর জ্বলিত উজল ধূপ....!
ফুলের গন্ধে বিহগের গানে শিহরিত অপরূপ!
কুঞ্চিত কেশ, নয়ন উজল,
ছিল আনন্দ, গান অবিরল....
ভাবিতাম বুঝি জীবন-জোয়ারে আমি জগতের ভূপ!

জানিতে পারিনি কবে দেহখানি হয়ে এলো নিশ্চুপ!
আজি আমি ভাই জরায় জীর্ণ, শীর্ণ চরণে চলি–
জগতের যত উদ্ধত লোক যায় মোরে পায়ে দলি!
আঁখিতে আমার আর আলো নাই—
সব হারাবার গানখানি গাই ....
জীর্ণ-শীর্ণ-ভগ্ন এ দেহ–যেন ভস্মের স্তূপ!

গৌতম ।। মানুষের শেষ পরিণতি ভস্মের স্তূপ! একথা বিশ্বাস করতে যে আমার মন চায় না! ছন্দক, তুমি চুপ করে রইলে? বলে যাও জরাগ্রস্ত মানুষ, একথা কি সত্যি?

[জরাগ্রস্ত মানুষ সে কথার কোনো উত্তর দিলে না। হতাশাব্যঞ্জক নৃত্যের ভেতর দিয়ে তার মনের কথা জানিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল]

গৌতম ।।[ছন্দকের কাছে গিয়ে] ছন্দক, এখনো তুমি কোন কথা বলবে না! নির্ব্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? এই যদি মানুষের জীবন....তবে সেখানে আনন্দের স্থান কোথায়?

ছন্দক ।। চল রাজকুমার, আমরা নগর ভ্রমণে যাই....

গৌতম ।। নগর ভ্রমণে যাবো? কিন্তু আবার কোথা থেকে কান্নার সুর ভেসে আসছে?

[একটি ব্যাধিগ্রস্ত লোক সকলের করুণা ভিক্ষা করে অতি দীনভাবে—নৃত্যের ভঙ্গীতে প্রবেশ করল। নেপথ্যে একটি করুণ সঙ্গীত ধ্বনিত হতে থাকলো—। এই লোকটির দুর্দ্দশা দেখে কুমার গৌতম শিউরে উঠলো। তাঁর মুখ-চোখে বেদনার ভাব ফুটে উঠলো। তিনি ধীরে ধীরে নৃত্যের ভঙ্গীতে তার কাছে অগ্রসর হলেন]

ব্যাধিগ্রস্ত লোকের নৃত্য-গীত

জীবনে তোমারে আমি ত' ডাকিনি কভু!
তোমার করুণা তাই কি হারানু প্রভু!
কাল-ব্যাধি এসে দেহখানি ছায়—
কাহার পরশ লভিব ধরায়!
জীবন্মৃতের বাঁচিবার সাধ তবু—
তোমার করুণা কবে হারায়েছি, প্রভু!

রোগ-যাতনায় আমি একা কাঁদি, শিয়রে যে কেহ নাই....
পিপাসার জল, করুণ-পরশ শুধু এক কণা চাই!

তুমি এসে প্রভু ধর মোর হাত—
এ অমানিশার হউক প্রভাত—
তোমারে ভুলেছি....হে করুণাময় আমারে ভুলো না তবু!

[চরম নৈরাশ্যে ব্যাধিগ্রস্ত লোকটি ধীরে ধীরে চলে গেল। কুমার গৌতম সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দুই নয়নে করুণার মেঘ ঘনিয়ে উঠলো]

গৌতম ।। ছন্দক, এর পরেও কি আমাকে বিলাসে আরামে দিন যাপন করতে বলো? রথে করে নগরভ্রমণে বেরোতে অনুরোধ জানাও?

ছন্দক ।। মহারাজেরও তাই বাসনা, রাজকুমার! তাতেই আপনার শরীর ও মন তাতেই ভালো থাকবে।

গৌতম।। আমি ত' চাই—আমার দেহ-মন ভালো থাকুক। কিন্তু ওই করুণ-কান্নার সুর!সেই সুর ঘুমে আর জাগরণে আমায় পাগল করে তোলে।

ছন্দক।। চলুন রাজকুমার গৌতম, এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই—

গৌতম।।[মৃদু হেসে] কোথায় পালাবো, ছন্দক? পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এই বিষাদের সুর আমায় অনুসরণ করে চলবে। এর হাত থেকে আমার নিস্তার নেই! ওই শোনো, ওই আবার!

ছন্দক।। কিন্তু আমি ত' শুনতে পাচ্ছি না, রাজকুমার?

গৌতম।। কান পেতে শোনো ছন্দক, তুমিও শুনতে পাবে।

[আবার সেই কান্নার স্রোত যেন করুণ সুরধারা হয়ে ভেসে এলো। চারজন লোক একটি মৃতদেহকে বহন করে উদ্যানের পাশ দিয়ে যেতে লাগলো]

গৌতম।। ওরা কারা, ছন্দক? কা'কে এমন করে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে ? একি! তুমি কথা বলছো না, ছন্দক? আমি তোমাদের রাজকুমার, আমি তোমায় আদেশ করছি—আমার প্রশ্নের তুমি উত্তর দাও—

ছন্দক।। রাজকুমারের আদেশ কি আমি লঙ্ঘন করতে পারি? তবে শুনে রাখুন রাজকুমার গৌতম, ওই লোকটি মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েছে। ও আর জাগবে না, কথা বলবে না, আর কারো ডাকে ও সাড়া দিতে পারবে না!

গৌতম।। প্রত্যেক মানুষকেই কি একদিন মরতে হবে? এর থেকে রক্ষা পাবার কি কোনো উপায় নেই?

ছন্দক।। না যুবরাজ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুকে কেউ জয় করতে পারে না। এই বিধিলিপি!

[নেপথ্যে গানের সুর ভেসে উঠলো—গান গাইতে গাইতে এক বাউল এসে ঢুকলো]

সব হল অবসান!

জীবনের পথে চলিতে চলিতে থেমে গেছে ওর গান!
আর না জাগিবে, কহিবে না কথা—
থেমে গেছে ওর যত ব্যাকুলতা—
নিথর, অসাড় দেহ শুধু পড়ে, সেথায় ত' নাই প্রাণ!
সব হল অবসান!

অরুণের আলো, পাখীর কাকলী আর না ডাকিবে ওরে—
আর জাগিবে না, কেউ যদি ওকে ডাকে নামখানি ধরে
শেষ হয়ে গেল ধরণীর খেলা—
এবার যে তার ফুরাইল বেলা—
মহাকাল যবে করিবে পরশ নাহি রে পরিত্রাণ!
সব হল অবসান!

গৌতম।। ছন্দক, ছন্দক, তা হলে কি আমি এই বুঝবো...এই জানবো যে, মানুষ জরা, ব্যাধি আর মৃত্যুর ক্রীতদাস?

ছন্দক।। এই জগতের নিয়ম। সেকথা মেনে নিতেই হবে, রাজকুমার।

গৌতম।। ছন্দক, আমি আর সইতে পারছি না! আমি আর ভাবতে পারছি না! তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো! এ পৃথিবীতে কোথাও কি শান্তি নেই...?

[হঠাৎ উদাত্ত কণ্ঠের গান ভেসে এলো—গান গাইতে গাইতে একজন সন্ন্যাসীর প্রবেশ]

সন্ন্যাসীর গান

পথ যে আমায় ডাক দিয়েছে, তাই ত' পথে চলি—
দুঃখ-বেদন পথের কাঁটা যাই চরণে দলি!
নীড় বাঁধিবার কামনা নাই—
সকল ঘরে ডাক দিয়ে যাই—
সোনা-দানা-যশের লাগি নই ত কৌতূহলী।।

যে ধন আমার মনে আছে—প্রদীপ জ্বালায় প্রাণে—
শান্তি সেথায় পেলাম খুঁজে পথের ধূলির গানে।
সকল জনায় ডাকবো কাছে—
আয়রে আমার প্রাণের মাঝে—
শান্তি যদি চাসরে পেতে—আয়রে পথে চলি।
ঘর বাঁধিব সবার মনে—যাবো না রে ছলি।।

গৌতম।। কে তুমি সন্ন্যাসী, আপন মনে গান গেয়ে পথ চলেছ? মুখে তোমার কী প্রশান্তি, মনে তোমার কী আনন্দ! তুমি কি সুখের সন্ধান পেয়েছ?

সন্ন্যাসী।। তা পেয়েছি, রাজকুমার। পথের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে আমার মনের শান্তি জড়িয়ে আছে। প্রতি মানুষের অন্তর জয় করার যে সুখ—রাজপ্রাসাদে বসে তুমি কি তার সন্ধান পাবে?

[গান গাইতে গাইতে চলে গেল]

গৌতম।। দেখলে, ছন্দক?

ছন্দক।। দেখলাম রাজকুমার, ও এক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। কিন্তু তুমি ত' তা নও। তুমি রাজারকুমার। তোমার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, বিরাট এক রাজ্যশাসনের ভার তোমার হাতে এসে পড়বে। তোমার সন্ন্যাসীর পথচলার স্বপ্ন দেখলে চলবে কেন?

গৌতম।। ছন্দক, দুর্ভাগ্য যে আমি রাজারকুমার। ওই সন্ন্যাসীর মুখে কী জ্যোতি! আমি যদি পৃথিবীর বিনিময়েও ওই জ্যোতি আর ওই প্রশান্তি পেতাম!

[একটি সুমিষ্ট বাদ্যধ্বনি শোনা গেল। সেই বাদ্যের সঙ্গে রাজকুমারের দীর্ঘশ্বাস মিশে গেল]

—২য় দৃশ্য—

[বধূরাণী গোপার কক্ষ। কক্ষটি নানা ফুলে সজ্জিত আর অগুরু গন্ধে আমোদিত। রাজকুমার গৌতম আর গোপা পালঙ্কে বসে আছেন]

গোপা।। রাজকুমার, তোমার মুখের হাসি শুকিয়ে গেল কেন? আমি কি কোনো অপরাধ করেছি?

গৌতম।। না—না, গোপা, তুমি অপরাধ করবে কেন? আমি যেন সব সময় বিশ্বের কান্না শুনতে পাই। কিছুই আমার ভাল লাগে না, গোপা—

গোপা।। না না, এ ত' ভালো কথা নয়। মহারাজকে বলে আমি রাজবৈদ্যকে খবর পাঠাবো। তুমি আর অমত কোরো না।

গৌতম।। না গোপা, আমার শরীর খুব সুস্থ আছে। এ আমার দেহের ব্যাধি নয়, মনের ব্যাধি।

গোপা।। আমি তোমার পাশে রয়েছি। আমাদের সোনার পুতলী রয়েছে ঘর আলো করে। দাস-দাসী, নর্ত্তক-নর্ত্তকী—বিলাস-ঐশ্বর্য্য কিছুরই আমাদের অভাব নেই, তবু তুমি বিষণ্ণ মুখে থাকবে —এ আমি সইতে পারিনে রাজকুমার। তুমি হাসো, তুমি কথা কও। তোমার মুখে হাসি না দেখলে আমার সারা বিশ্ব মেঘে ঢাকা পড়ে। রাজকুমার, কিসে তুমি প্রসন্ন হবে আমায় খুলে বলো।

গৌতম।। প্রসন্ন আমি হতে চাই, গোপা! তুমি আমায় ঘিরে থাকো, তুমি আমার মনের বেদনা সব দূর করে দাও! কিন্তু ওই কান্নার সুর! বিশ্বে এত ব্যথা, এত অভাব, এত যাতনা—আমি সইতে পারি না—সইতে পারি না! গোপা তুমি আমায় বাঁচাও—! আমাকে সব ভুলিয়ে দাও।

গোপা।। ওরে চারুণিকা, ছন্দালিকা, বৃন্দালিকা, অরুণিমা—তোরা সবাই আয়, আমাদের রাজকুমারের মন খারাপ হয়েছে। তোরা সবাই মিলে নাচে-গানে ওর মুখে হাসি ফুটিয়ে তোল্!

[নর্ত্তকীদের প্রবেশ ও নৃত্য-গীত]

চাঁদ বলে, আমি জাগিব গগনে, তুমি সাথে জেগে রও।
ভীরু সমীরণ দোলা দিয়ে যায়, কানে-কানে কথা কও!
এত হাসি গান—এত আনন্দ—
আমার চরণে নতুন ছন্দ—
তব মুখে কেন হাসি নাই প্রিয়, কী ব্যাথা যে তুমি সও!
চাঁদ জেগে আছে, তুমি মোর পাশে চুপি চুপি জেগে রও।

জ্যোছ্নায় আজি জেগেছে জোয়ার, পাখী দেয় শাখে দোল
তোমার আমার নবীন পরাণে সমীরণ উতরোল!
কাছে আছি তবু কেন এত দূর?
তোমার শ্রবণে পশে নাকি সুর?
আমার গগনে তুমি কেন প্রিয় সুদূরের তারা হও?

গোপা।। ওরে তোরা কেউ থামিস্ নি—সারারাত চলুক তোদের নাচ, চলুক তোদের গান। রাজকুমারের ভালো লেগেছে এই সুর। আমি ওর পাশে রয়েছি, আর আমার কি ভয়? কিন্তু আমার চোখেও ঘুম নেমে আসছে। রাজকুমারের পাশে আমি একটু শুয়ে থাকি। যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি—তোরা আমায় কেউ ডাকিস্ নি। তোরাও গিয়ে ঘুমিয়ে থাকিস্।

[বধূরাণী গোপা পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়লো]

[আরো খানিকক্ষণ নৃত্য-গীত সেইভাবেই চলল। আস্তে আস্তে রাজকুমার গৌতমও ঘুমিয়ে পড়লো]

চারুণিকা।। ওরে, রাজকুমার আর বধূরাণী ঘুমিয়ে পড়েছে !

মন্দালিকা।। চুপ! আর নাচ নয়, আর গান নয়। আয়, এইবার আমরা পা টিপে-টিপে পালিয়ে যাই।

ছন্দালিকা।। ঠিক বলেছিস্ সই ! কয় রাত ওদের চোখে ঘুম নেই! আমাদের নাচে, আমাদের গানে ওদের চোখের পাতায় ঘু.. এসেছে। ওরা ঘুমুক...! এইবার আমাদের ছুটি।

[চুপিচুপি নর্ত্তকীদের প্রস্থান]

[নেপথ্যে একটি মৃদু বাদ্যধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। এই ঝঙ্কার যেন মানুষকে জাগায় না, আরো ঘুম পাড়িয়ে দেয়। কিন্তু রাজকুমার গৌতমের চোখে ঘুম নেই। ধীরে ধীরে চুপিচুপি তিনি উঠে বসলেন। একবার গোপার দিকে তাকালেন। তারপর পালঙ্ক থেকে নেমে এলেন]

গৌতম।। না—না! ওরা আমায় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়। কিন্তু আমি যে পৃথিবীর কান্নার সুর কিছুতেই ভুলতে পারছি নে! ঘুমে আর জাগরণে সেই কান্না ক্রমাগত আমায় ডাকছে ! সত্যি! এ আমার কি হল? পিতার স্নেহ, পত্নীর ভালবাসা, শিশুপুত্রের মায়া, ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার, কিছুই আমায় গৃহ-কোণে আটকে রাখতে পারছে না! ওই যে! আবার কার ডাক শুনতে পাচ্ছি!

[দূর থেকে করুণ-গীতি ভেসে এলো]

মায়ার ভুলো না হায়!
বিশ্বের ব্যথা ডাকিছে তোমায়, সবে যে মুক্তি চায়!
প্রিয় বাহু-ডোরে বন্ধন তব নয়!
সবে ডাকে তোমা আঁখির সলিলে, এ ডোর ছিঁড়িতে হয়!
গৃহকোণ তব নহে ত' কুমার, পৃথিবী তোমারে চায়!
রাজার প্রাসাদ ছেড়ে চলে এসো, দেশে দেশে তব ঘর।
বিশ্বের লোক তোমারে চাহিলে—কেহ নহে তব পর।।

মণি-আভরণ ফেল গো ধূলায়
পাখী ফিরে চলো নিজের কুলায়
সাগরের বুকে জোয়ার জেগেছে—পাল তুলে দাও নায়।।

গৌতম।। না—না, আমি আর মায়ায় ভুলবো না। সত্যি কথা! সারা বিশ্ব যদি আমায় ডাকে, তা হলে কেন আমি রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্যের মাঝে প্রিয়ার বাহু-ডোরে বাঁধা থাকবো? সারা পৃথিবীর মানুষের কান্না আমি শুনতে পেয়েছি। ওরাই আমার আপনার জন। যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি,—ওরে তোরা দাঁড়া। আজ থেকে তোদের সঙ্গে আমি কেঁদে কেঁদে বেড়াবো—

[প্রস্থান]

—তৃতীয় দৃশ্য—

[রাজকুমার গৌতমের গৈরিক বেশ। তিনি একটি বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। দূর থেকে একটি প্রশান্ত সুর-ঝঙ্কার শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ সেই সুর-ঝঙ্কারের পরিবর্ত্তন ঘটলো। একটি উচ্ছৃঙ্খল দ্রুত সুর শোনা গেল। হঠাৎ মারের প্রবেশ। মারের উগ্র ও বীভৎস চেহারা। লাল ও কালোতে চোখ-ধাঁধানো পোশাক। কপালে লাল ফোঁটা, চোখের কোণে কালি, একটা চমক-লাগানো উদ্দাম নৃত্যের ভেতর দিয়ে মার এগিয়ে এলো]

মারের নৃত্য-গীত

ভয়ঙ্করের অট্টহাসি ভাঙবে চতুর্দ্দিক!
অনিয়মের ধ্বজা তুলে চাইব নির্নিমিখ!
হলাহলে ভাসাই ধরা—
মরণ নাচে জাগবে মরা
মহাশ্মশান-মাঝে জ্বালি চিতার অনল ঠিক।

তাথৈ-তাথৈ নৃত্য করি অমানিশার রাতে—
জীবন-মরণ এক সাথে ভাই দোলে আমার সাথে।
অমঙ্গলের ধূপ যে পোড়াই—
দৈত্যি-দানা সঙ্গী তারাই—
জাহান্নামের পথে পথে মাগবো আমি ভিক্!

মার।। হা—হা—হা! আমায় বিশ্বের লোক কে না চেনে! মঙ্গল আমি সইতে পারিনে! শান্ত-প্রদীপ দেখলে ফুৎকারে আমি নিভিয়ে দি! তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করাই আমার একমাত্র কাজ! ওই যে মানুষটি...কুমার গৌতম ওর নাম। ও নাকি তপস্যা করে বিশ্বের মুক্তি আনবে! হা—হা—হা! শুনে আমি না হেসে

থাক্‌তে পারি নে! বলে, হাতী-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল! কত দাড়িওলা মুনিঋষিদের আমি ভীরমি লাগিয়ে দিলাম। ওই পুঁচকে ছোঁড়া তপস্যা করবে! হুঁ! খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে! দিব্যি রাজপ্রাসাদে রাজভোগ খাচ্ছিলি—সেটা বুঝি ভালো লাগলো না? তাই বনে এলি তপস্যা করতে? এইবার মশার কামড় খেয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে! হা—হা—হা!

(খানিকক্ষণ পায়চারি করে)

এ কি! আমার নৃত্য-গীতেও রাজকুমারের ঘুম ভাঙলো না। তপস্যার জোর আছে বলতে হবে। না, শুধু চোখ বন্ধ করে মজা দেখছে! হুঁ! আমার নাম মার। রাজকুমারকে পরীক্ষা করতে হল। এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি ছলনাময়ী নারীদের। আমার নাম মার—কিছুতেই আমি পিছ্‌পা নই—হা—হা—হা!!

[মারের প্রস্থান]

[আবার একটি শান্ত-স্নিগ্ধ সঙ্গীত-ঝঙ্কার ধ্বনিত হতে লাগলো। খানিক বাদে অপরূপ সুন্দরী দুটি মেয়ে হাস্যে-লাস্যে-নৃত্যে বনভূমি সচকিত করে প্রবেশ করলো। তাদের আঁখিতে বিদ্যুৎ-দীপ্তি, মরাল-গমনে তারা ধ্যানমগ্ন গৌতমের দিকে এগিয়ে এলো]

ছলনাময়ীদের নৃত্য-গীত

মোর পানে তুমি চাও যদি প্রিয়,—রবি-শশী থেমে থাকে,
কাননের মাঝে জাগে শিহরণ,—ফুল ফোটে লাখে লাখে।
সাগরের সুর সব থেমে যায়—
চপলা চমকি আঁখি পানে চায়—
সোনালী মেঘেরা গগন-কিনারে তুলিতে কি ছবি আঁকে!

বনের বিহগ গাহে ঘুম-ভাঙা গান
সে গানের সুরে জেগে রয় দুটি প্রাণ।
পৃথিবীর গতি হয় বুঝি অবসান!
বনের মাঝারে রজনীগন্ধা গন্ধ বিলায় কাকে?
তোমার আমার না-বলার বাণী জাগে রক্তিম রাগে!

[নৃত্যে ও গীতে বনভূমি মুখরিত হয়ে উঠলো, কিন্তু ধ্যানমগ্ন গৌতমের তপস্যা-ভঙ্গ তাতে হলো না। মেয়ে দুটি গান গাইতে গাইতে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মারের প্রবেশ]

মার।। এ কি! আমি কি ইন্দ্রজাল দেখছি! ছলনাময়ীরা হার মেনে চলে গেল। এ ত' ওদের হার নয়,—এ যে মারের পরাজয়! না—

না—না! আমি পরাজয় মানবো না! এইবার আমি সর্ব্বগ্রাসী সংহারকে রাজকুমারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবো। দেখি তার হাত থেকে গৌতমকে কে রক্ষা করে—

[অট্টহাস্য করতে করতে মারের প্রস্থান]

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল, নৃত্যরত দু'টি কঙ্কাল প্রবেশ করল]

কঙ্কালের নৃত্য-গীত

সর্ব্বনাশা ক্ষুধা আমার, অনল-জ্বালাই বুকে...
জ্বলে পুড়ে মরবি যদি—আয়রে পরম সুখে!
ধিকি ধিকি তুষের আগুন—
নিরিবিলি করবে কি গুণ,
বুকের আগুন ফুৎকারে তুই জ্বালা আপন মুখে!
যতই ঝরুক বর্ষা-বাদল অনল শিখা জ্বলে—
চিরকালই এই হুতাশন পোড়ায় ধরাতলে!
অমঙ্গলের মন্ত্র হেঁকে—অলক্ষ্মীরে আন না ডেকে—
দিবার দাহে, রাতের কালোয়—মরণ-কৌতুকে!

[নাচতে নাচতে কঙ্কাল দু'টি হতাশ হয়ে চলে গেল। মঞ্চ তীব্র ধূমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কেবল একটি ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো]

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি!
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি!...

মার।। আমি হার মানছি! আমি পরাজয় স্বীকার করছি। এই মন্ত্র আমার বুকে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে—আমি পালাই—আমি পালাই—

[মারের পলায়ন]

[মঞ্চ আবার আলোকিত হতে দেখা গেল, রাজকুমার গৌতম ঠিক একই ভাবে তপস্যা-মগ্ন রয়েছেন। তাঁর মস্তকের চারদিক থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। নাচতে নাচতে সুজাতা পরমান্নের থালি নিয়ে প্রবেশ করলো]

সুজাতার নৃত্য-গীত

আমি যে সুজাতা, গরীবের মেয়ে শুনেছি তোমার বাণী—
বুদ্ধ তোমার অভয়-মন্ত্র প্রাণে করে কানাকানি!
প্রতি গৃহে জ্বলে মঙ্গল-দীপ
ললাটে দিয়েছ আশিসের টিপ
হে করুণা-ঘন, তোমার মন্ত্রে থেমে গেছে হানা-হানি!

বিশ্ববাসীরে ডাক দিয়ে কও, "মুক্তির পথ আছে—
সব প্রলোভন দূর করে দিয়ে দাঁড়া এসে মোর কাছে!"
তুমি তথাগত সবার জন্য—
সুজাতা এনেছে পরম-অন্ন
ক্ষুদ্র অর্ঘ্য গ্রহণ করিলে নিজেরে ধন্য মানি।।

চারিদিক থেকে শঙ্খ-ঘন্টা বেজে উঠলো। ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো—]

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি!
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

—যবনিকা—

স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা দিবসের উৎসব তোমরা তোমাদের বিদ্যালয়ে, প্রতিটি পল্লীতে, ক্লাবে, আসরে, প্রতিষ্ঠানে পালন করে থাকো। প্রত্যেক স্বাধীনদেশের ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতা-উৎসবে মেতে ওঠে।

লাখো-লাখো লোকের স্বার্থত্যাগে আর রক্তদানে আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছি, তাকে আমাদের প্রতি বছর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে ১৫ই আগস্ট। এই দিনটি পালন করবার জন্যে তোমাদের ছুটি নির্দ্ধারিত আছে।

স্বাধীনতা দিবস পালনের পরিকল্পনাটি তোমরা শুনে রাখো—

খুব সকালে সবাই ঘুম থেকে উঠ্‌বে। প্রত্যূষকাল যাকে বলে ঠিক সেই সময়। স্বাধীনতা দিবসে একটি "প্রভাত ফেরী" বের করা ছেলেমেয়েদের দিক থেকে একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। এই প্রভাত ফেরীতে তোমরা নানারকম স্বদেশী গান গাইতে পারো। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, কান্তকবি, নজরুল প্রভৃতির গান আগে থেকে নির্বাচন করে যদি তোমরা তৈরী করে রাখো, তবে "প্রভাত ফেরী" অতি সহজেই সকলের উপভোগ্য হবে, আনন্দদায়ক হবে। তোমরা দলবদ্ধভাবে প্রভাত ফেরী গেযে তোমাদের অঞ্চলেব লোকদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে। তাদের জানিয়ে দেবে যে, আজ স্বাধীনতা দিবস। অলস হয়ে বিছানায় শুয়ে থাক্‌বার সময় আজ আর নেই। তোমরা শয্যা ত্যাগ করে উঠে এসো, সবাইকার সঙ্গে "স্বাধীনতা দিবসে" যোগদান করো। হাতে হাত মেলাও, আর পাশাপাশি এসে দাঁড়াও। তবেই আমাদের উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হবে।

ছোটদের স্বাধীনতা দিবসের জন্যে আমি একটি গান রচনা করেছি। এই গানটি কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানীতে রেকর্ড করা হয়েছে। কাজেই এর সুর জানা তোমাদের পক্ষে অসুবিধে হবে না। গানটি আমি এখানে তুলে দিলাম। স্বাধীনতা দিবসে এই গানটিও তোমরা শোভাযাত্রায় গাইতে পারো—

স্বাধীনতা দিবসের গান

জাগো কিশোরী, জাগো কিশোর!
পরাধীনতার অমানিশা হল ভোর!
রঙীন তপন জাগে—!
ঘুম-বিজড়িত নয়নে দীপ্তি লাগে!

তিন-রঙা ওই উড়িছে নিশান—
ভাঙে শৃঙ্খল ডোর!
জাগো কিশোরী, জাগো কিশোর।।

কারাগারে আর ফাঁশির মঞ্চে যাঁরা নিবেদিল্ প্রাণ,
মোদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে তারাও গাহে যে গান!
এ মহা-শ্মশানে ফোটে কি মুকুল—!
গন্ধে-বর্ণে শোভায় অতুল—!
লোহার-শিকল—সোনার মুকুট হল আজি শিরে তোর!
জাগো কিশোরী, জাগো কিশোর।।

স্বাধীনতা দিবস পালন করতে গিয়ে আরো একটি প্রয়োজনীয় কথা তোমরা ভুলবে না। সে কথাটি হচ্ছে, "শহীদ্-বেদী" তৈরী করা। এই শহীদ্-বেদী তোমরা নিজে হাতে রচনা করবে। পল্লী-অঞ্চলে কাদা-মাটি দিয়ে আর শহরাঞ্চলে ইঁট সাজিয়ে, তার ওপর চূণ দিয়ে রঙ্ করে দিতে পারো। আসল কথা হচ্ছে এই যে, শহীদ্-বেদী সব সময় সাদা হবে। তার ওপরে থাক্‌বে পতাকা তোলার দণ্ড।

এই শহীদ-বেদীর সাম্‌নে তোমরা সবাই সমবেতভাবে দাঁড়াবে। হাতে থাক্‌বে তোমাদের সাদা ফুল। ওপরের গানটি গাওয়া হয়ে গেলে—ফুলগুলি অঞ্জলি করে শহীদ-বেদীতে অর্পণ করবে। আর স্মরণ করবে সেই সব শহীদ্‌দের যাঁরা যুগ-যুগ ধরে স্বাধীনতার বেদীমূলে তাঁদের তপ্ত রক্ত অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। কল্পনা করবে—তাঁরা যেন সবাই ঊর্দ্ধ আকাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তোমাদের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে গান গাইছেন, আর তোমাদের শিরে শুভাশিস বর্ষণ করছেন।

দুপুরবেলা তোমরা অনাথ বালক-বালিকাদের নিজে হাতে রান্না করে যদি খাওয়াও, তবে তার চাইতে আনন্দের কথা আর কিছু হতে পারে না।

এই রান্নার ব্যাপারেও আগে থাক্‌তে তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে। একমাস আগে থেকে তোমাদের অঞ্চলের প্রত্যেকটি বাড়ীতে মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ করবে। চাল, ডাল, আলু, তেল, যা সহজে নষ্ট হয় না—এমনি জিনিস যোগাড় করে ভাণ্ডারে মজুত করবে। এ ছাড়া অভিভাবকদের কাছ থেকে কিছু চাঁদাও তুলবে। পাড়ার মহিলাদের সাহায্য চাইবে। তাঁরা যদি তোমাদের রান্নার কাজে সাহায্য করেন, তবে ত' কোনো কথাই নেই। খিচুড়ী, কিছু ভাজাভুজি, সব রকম আনাজ দিয়ে একটা তরকারী এবং শেষে একটা চাট্‌নীর ব্যবস্থা করতে পারো। যদি কোনো মিষ্টান্ন-বিক্রেতা তোমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তবে দৈ অথবা মিষ্টির ব্যবস্থা করতে পারো। কিন্তু এ আয়োজন করা হয়ত সব সময় সম্ভবপর না-ও হতে পারে।

যাদের বাপ-মা, নেই, যারা অতিকষ্টে দিন যাপন করে, শুধু সেই সব অনাথ ছেলে-মেয়েদের ডেকেই যত্নের সঙ্গে খাওয়াবে। পরিবেশনের দায়িত্বটা তোমরা নিজেরাই নেবে এবং প্রখর দৃষ্টি রাখবে, যাতে কোনো খাদ্যের অপচয় না ঘটে।

বিকেলের দিকে তোমরা একটি আলোচনা-সভা ডাকবে। তাতে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আহ্বান করে খ্যাতিমান বিপ্লবীদের জীবনী আলোচনা করবে। যে অঞ্চলে তোমরা বাস করো সেইখানকার নামকরা সাহিত্যিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, ক্রীড়াবিদ্, সঙ্গীতজ্ঞ—এঁদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানাবে। যে পাড়ায় উৎসব হবে—সেইখানকার মায়েদের আহ্বান করতেও ভুলবে না। এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে তোমরা নতুন নতুন কথা জানতে পারবে। তোমরাও শহীদদের জীবনী সংক্ষেপে রচনা করে আলোচনা-সভায় পাঠ করতে পারো।

সন্ধ্যাবেলা নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করবে। বিখ্যাত শহীদ্দের জীবনীকে ভিত্তি করে নাটক রচনা করা হবে। সেই নাটক তোমরা সকলে মিলে অভিনয় করবে। অভিনয় করার সময় ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের রূপসজ্জার দিকে বিশেষ সর্তক দৃষ্টি রাখবে। ধরো, যারা শ্রীঅরবিন্দ, ক্ষুদিরাম, যতীনদাস প্রভৃতি সাজবে, তাদের রূপসজ্জা যেন নিখুঁত হয়। দর্শকবৃন্দ যেন তাকে দেখে—ঠিক মানুষটি বলে চিনে নিতে পারে।

তোমরা ছোটরা শহীদ ক্ষুদিরামের জীবনীকে কেন্দ্র করে একটি ছোট্ট নাটিকা অভিনয় করতে পারো। এইখানে তোমাদের জন্যে ক্ষুদিরামের জীবনীকে ভিত্তি করে একটি নাটিকা প্রকাশ করা হল।

ক্ষুদিরাম

(এক দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটিকা)

(১০ই আগস্ট। নির্জ্জন কারাকক্ষ। গভীর রাত। ক্ষুদিরাম একা জেগে বসে আছে। পরদিন প্রত্যুষে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হবে। কিশোর বীর কি ফাঁসির নামে ভয় পেয়েছে? না। মৃত্যুঞ্জয়ী কিশোরকুমার কৃতকর্ম্মের কথা মনে-মনে আলোচনা করছে। কারাগারের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজলো। ক্ষুদিরাম উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগলো। নেপথ্যে সঙ্গীত দ্রুততর হতে থাক্‌লো। সেতারের একটা মূর্চ্ছনা ঊর্দ্ধ আকাশে উঠে মিলিয়ে যেতে লাগলো। এমন সময় নেপথ্যে গম্ভীর কণ্ঠে কে চীৎকার করে উঠ্‌লো—তুমি খুনী, —তুমি খুনী। এই কথা শুনে ক্ষুদিরাম থম্‌কে দাঁড়ালো।)

ক্ষুদিরাম।। আমি খুনী ?

নেপথ্য কণ্ঠ।। হ্যাঁ, তুমি খুনী। নিরপরাধিনী বিদেশিনীকে তুমি ইচ্ছে করে হত্যা করেছ। তুমি খুনী। তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।

ক্ষুদিরাম।। কে তুমি—আমাকে খুনী বলে অভিযোগ করছো—আমি জানি না। কিন্তু তোমার অভিযোগ সত্যি নয়।

নেপথ্য কণ্ঠ।। সত্যি নয়? তুমি অস্বীকার করতে পারো?

ক্ষুদিরাম।। নিশ্চয় পারি। তুমি বলছো, আমি ইচ্ছে করে হত্যা করেছি। কিন্তু সত্যি কি তাই? অত্যাচারীর গাড়ীতে উঠে দুটি মহিলা অকালে প্রাণ দিয়েছে। আমি গিয়েছিলাম অত্যাচারীর কণ্ঠরোধ করতে। সে আমার দেশবাসীকে মানুষ বলে মনে করেনি। দিনের পর দিন তাদের সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করেছে। তারপর যখন নিজের বিপদের কথা জানতে পারলো—সে ভীরু কাপুরুষের মতো পালিয়ে এলো এই মজঃফরপুরে।

নেপথ্য কণ্ঠ।। তুমি কার কথা বলছ?

ক্ষুদিরাম।। হা—হা—হা! তুমি আমায় খুনী বলে অভিযোগ করছো, আর আমি কোন্ অত্যাচরীর কথা বল্‌ছি—তুমি কিন্তু বুঝতে পারছ না? এ কি তোমার ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা? তাই যদি হয়, তবে নেপথ্যের ভীরু কণ্ঠস্বর জেনে রাখো, আমি অত্যাচরী কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের কথাই বল্‌ছি।

নেপথ্য কণ্ঠ।। কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের বিচারে ভার কি তোমার ওপর পড়েছে? তুমি বিচার করবার কে?

ক্ষুদিরাম।। কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের বিচারের ভার আমার ওপর নয়, একথা সত্যি। কিন্তু তিনি যদি অকারণে আমার দেশের মানুষের ওপর অত্যাচার করেন, পশুর মতো তাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তবে বাধ্য হয়ে আমাদেরও কঠোর হতে হয়। জানো ত' আমাদের কবি বলেছেন—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।।"

অত্যাচারী অন্যায় করেছিল বলেই তাকে উচিত শাস্তি দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু দুই নিরপরাধ মহিলা নিজের জীবন দিয়ে সেই অত্যাচারীকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে! তবু তোমায় জানিয়ে রাখছি—অদৃশ্য কাপুরুষ, রক্তবীজের বংশ আমরা। আমি পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছি বিচারের প্রহসনে, কিন্তু এমনি হাজার-হাজার ছেলে আছে। তাদের হাতে কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের নিস্তার নেই! তোমাকে তার হিতৈষী বলে মনে হচ্ছে। কথাটা সাহেবকে জানিয়ে দিও। আজ থেকে সাহেবকে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হবে। নইলে সাত-সমুদ্দুর-তের-নদীর পারে—নিজের দেশে পালিয়ে যেতে হবে।

নেপথ্য কণ্ঠ।। তোমার সঙ্গে আমি বৃথা বাক্যব্যয় করতে চাইনে। আমি চললাম। কাল সকালবেলার জন্যে প্রস্তুত হও! [প্রস্থান]

ক্ষুদিরাম।। কাল সকাল বেলা? তার জন্যে আমার এতটুকু উদ্বেগ নেই। কাল সকালে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করে আমি ফাঁসির দড়িকে আলিঙ্গন করবো। বিদেশী রাজশাসনের বিচার আমায় এতটুকু দমন করতে পারেনি। বরং বিচারের প্রহসন দেখে আমি কখনো হেসেছি—কখনো ঘুমিয়ে পড়েছি সেই বিচারশালায়। বিচারক আমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো! কাল প্রত্যুষের জন্যেও আমি উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করবো। আমি জানি, আমার ভস্মরাশি সারা ভারতে রক্তবীজের বংশ সৃষ্টি করবে। অত্যাচারী হাজার-হাজার কিংস্‌ফোর্ডের এইবার আর নিস্তার নেই! জন্মভূমি থেকে বিদায় নেবার আগে—এইটেই আমার সব চাইতে বড় সান্ত্বনা। এইবার আমার দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। আমি এখন ঘুমুবো।

[শুয়ে পড়লো]

[একটা ক্লান্ত সুরের ঐক্যতান বেজে চললো। ঝিমঝিম থমথমে পরিবেশ। ক্ষুদিরামকে দেখে মনে হল যে ওর মনে কোনো গ্লানি নেই। যেন পরম শান্তিতে সে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়লো! হঠাৎ দেখা গেল, কারাগারের দেয়ালের একটি অংশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেখানে প্রফুল্ল চাকীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। প্রফুল্লর কপাল ও গলা দিয়ে রক্ত পড়েছে।]

প্রফুল্ল।। ক্ষুদিরাম, ক্ষুদিরাম, তুই ঘুমিয়ে পড়লি?

ক্ষুদিরাম।। [চমকে উঠলে] কে? প্রফুল্ল চাকী? একি! তোর মাথা আর গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে? সেই বোমা ছোঁড়ার পর তুই পালালি এক পথে, আর আমি ছুটলাম আর এক দিকে। কিন্তু তোর এ দশা কে করলে, ভাই?

প্রফুল্ল।। কে করলে? দেশের মানুষকে বিশ্বাস করবার এই পুরস্কার!

ক্ষুদিরাম।। ব্যাপার কি প্রফুল্ল ? আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছিনে । সব খুলে বল!

প্রফুল্ল ।। তবে শোন্। বোমা ফাটাবার পর তোর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি। প্রথমে ত' রওনা হলাম মোকামাঘাট স্টেশনের দিকে। তারপর সেখান থেকে গিয়ে হাজির হলাম সমস্তিপুরে। ভাগ্যের লিখন ভাই, সেই স্টেশনে আলাপ হলো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে—

ক্ষুদিরাম।। কে সে ? সে কি আমাদের দলের কেউ?

প্রফুল্ল।। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম তাই। নানারকম দেশের কথায় সে আমার বিশ্বাস উৎপাদন করলে। ভাবলাম—তার আদর্শ আর আমাদের আদর্শ এক। অকপটে তার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। আশা ছিল—সে আমাকে আশ্রয় দান করতে পারবে।

ক্ষুদিরাম।। আমাদের বোমা-বিস্ফোরণের কথা তুই বললি?

প্রফুল্ল।। তা বললাম বই কি, ভাই। তখন কি আর জানি যে, আদর্শ বলে কোনো বস্তু নেই। আসলে সে নন্দলাল ব্যানার্জ্জি নামে এক পুলিশের দারোগা.

ক্ষুদিরাম ।। অ্যাঁ! পুলিশের দারোগা? তখুনি তাকে সাবাড় করে দিলিনে কেন?

প্রফুল্ল।। যখন তার আসল পরিচয় জানতে পারলাম—তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তার আগে লোকটি আমায় আশ্রয় দেবে বলে স্বীকার করলো। আমাকে মোকামাঘাটে নিয়ে এলো। একজন পুলিশ কনেস্টবলকে গোপনে আমার উপরে দৃষ্টি রাখতে বলে মোজাফরপুরের পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্ট্ মিঃ আর্মস্ট্রংকে সমস্ত ঘটনা জানালো। তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সে এলো আমাকে গ্রেপ্তার করতে।

ক্ষুদিরাম ।। কী সর্ব্বনাশ! বন্ধুর ছদ্মবেশে আবার সেই মীরজাফর! এই বিশ্বাঘাতকতার দোষেই বাঙালী গেল!

প্রফুল্ল ।। ততক্ষণে আমি আসল ব্যাপারটা জানতে পেরেছি। ও এসে আমাকে ধরবার আগেই আমি কণ্ঠনালীতে গুলী চালিয়ে দিয়েছি।

ক্ষুদিরাম।। তুই আত্মহত্যা করেছিস, প্রফুল্ল? সাবাস!

প্রফুল্ল ।। হ্যাঁ! আত্মহত্যা করেছি—চরম অপমান থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। আজ এসেছি তোকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।

ক্ষুদিরাম।। সাবাস্ প্রফুল্ল, সাবাস ! ভারতবর্ষে তুই-ই প্রথম শহীদ্। তোকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর আমিও প্রস্তত হয়ে আছি—তোর সঙ্গে মিলবো বলে।

প্রফুল্ল।। শোন ক্ষুদিরাম, প্রাণের মায়া ছেড়ে চলে এসেছি, কিন্তু এখনো আমি পরাধীনতার জ্বালা ভুলতে পাচ্ছিনে। বড় একা এখানে, সময় কাটতে চায় না। তুই এলে আমার খুব ভাল লাগবে।

ক্ষুদিরাম।। দুঃখ করছিস কেন, প্রফুল্ল? আর ত' মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি! তারপর আবার দুই বন্ধুর মিলন ঘটবে। দেশের কথাই ত' আমাদের একমাত্র কথা। দেশের কথা ছাড়া আর কি চিন্তা করবার আছে? যতদিন আমাদের মাতৃভূমি তার শৃঙ্খল ছিন্ন করতে না পারছে—আমরা বার বার জন্মাবো, বার বার মৃত্যুকে বরণ করে নেবো। এই ত' আমাদের আর্দশ— এই ত' আমাদের জীবনের ব্রত।

প্রফুল্ল। তুই আয় ক্ষুদিরাম। স্বর্গপুরীর দ্বারে আমি তোর জন্যে বরণমালা গাঁথি গে—

[প্রফুল্লর মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল]

[আবার একটা শান্ত ঐক্যতান শোনা যেতে লাগলো। দেখা গেল, ক্ষুদিরাম তার কারাকক্ষে ঘুমিয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে কারাকক্ষের দেয়ালের সেই জায়গায় মিঃ কেনেডির স্ত্রী-কন্যার মুখ ভেসে উঠলো]

কেনেডির স্ত্রী।। তরুণ কিশোর—একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখ—

ক্ষুদিরাম ।। [আঁৎকে উঠে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাদের চিনতে পেরেছি। তোমরা মিঃ কেনেডির স্ত্রী আর কন্যা! কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ীতে করে তোমরাই যাচ্ছিলে। রাত্তিরের অন্ধকারে আমরা বোমা ছুঁড়ে মেরেছিলাম। কিংসফোর্ড সাহেব বেঁচে গেল, কিন্তু তোমরা মৃত্যুকে বরণ করে নিলে! একি! তোমাদের মাথা থেকে রক্ত ঝরছে! আমি তোমাদের দিকে আর তাকাতে পারছি না! আমায় ক্ষমা করো! [দু'হাতে মুখ ঢাক্‌লো]

কেনেডির কন্যা।। তরুণ কিশোর, আমরা ত' তোমাদের কাছে কোন দোষ করিনি। তবে কেন বোমা ছুঁড়ে আমাদের হত্যা করলে?

ক্ষুদিরাম ।। শোনো বোন, বাঙালীর ছেলে কাপুরুষ নয়। তারা নারীকে দেবীর সম্মান দিয়েছে। তোমাদের ওপর ত' আমাদের কোন আক্রোশ নেই ! শুধু দুর্জ্জনের সংসর্গের জন্যেই তোমাদের এই অকাল মৃত্যু হল। নইলে যে বোমা আমরা কিংসফোর্ড সাহেবকে নিধন করবার জন্য তৈরী করেছিলাম—তাতে তোমরা নিহত হবে কেন? হয়ত এ তোমাদের নিয়তি। কিন্তু জেনে রাখো বোন, সেদিন কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের গাড়ীতে না উঠলে তোমাদের এ দশা হতো না। তবু আমি তোমাদের কাছে যুক্ত করে ক্ষমা চাইছি। ভগবান তোমাদের আত্মার শান্তি বিধান করুন। আমরা মুক্তিকামী কিন্তু কাপুরুষ নই।

কেনেডির স্ত্রী।। তবু তোমাদের একটি কথা জিজ্ঞেস করি ক্ষুদিরাম, এই হিংসাবৃত্তি দ্বারাই কি তোমরা দেশ স্বাধীন করতে পারবে?

ক্ষুদিরাম ।। কেন নয় দেবী ? তোমাদের দেশের লোকেরা যদি দিনের পর দিন আমাদের ওপর অত্যাচার করে, আমাদের অপমান করে, তবে প্রতিশোধের আর কি পন্থা আছে ? তখন হিংসাই উগ্র হয়ে ওঠে! পৃথিবীর সব দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই একই কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। তোমরা নারী, করুণার প্রতিমূর্তি। তোমরা কেন তোমাদের অত্যাচারী পুরুষদের নিবারণ করো না?

কেনেডির স্ত্রী।। সত্যি, তুমি আমায় লজ্জা দিলে, ক্ষুদিরাম। আর তোমাদের ওপর আমাদের কোনো ক্ষোভ নেই। কামনা করি, তোমাদের তপস্যা জয়যুক্ত হোক। তোমরা স্বাধীনতা লাভ করো।

[কেনেডির স্ত্রী-কন্যার মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল]

[আবার মৃদু বাদ্য ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। সেই ঐক্যতান উচ্চতর হয়ে উঠলো। হঠাৎ দেয়ালের গায়ে ফতে সিং ও শিউপ্রসাদের মূর্ত্তি ভেসে উঠলো]

ফতে সিং।। কেয়া বাঙালীবাবু—

ক্ষুদিরাম ।। হ্যাঁ, চিনেছি তোমাদের। তোমরাই আমাকে গ্রেপ্তার করেছিলে—ফতে সিং আর শিউপ্রসাদ—হঠাৎ আমার কোমর থেকে রিভলভারটা পড়ে গেল বলেই বাগে আনতে পেরেছিলে আমাকে, নইলে দেখিয়ে দিতাম তোমাদের।

ফতে সিং ।। হা—হা—হা—! মেরা ক্যেরামতি ত' দেখা বাঙালীবাবু! এক মিনিট মে পাকড় লে লিয়া—

শিউপ্রসাদ।। ইসিকিওয়াস্তে বহুৎ বকশিশ মিল গিয়া। জরুকা ওয়াস্তে খাড়ু, বাজুবন্দ্ ভি মিল্ গিয়া—এই দেখো—সব চাঁদিকা চিজ—হা—হা—হা!

ক্ষুদিরাম ।। আচ্ছা শিউপ্রসাদ, তোমাদের একটি কথা জিজ্ঞেস করবো?

শিউপ্রসাদ ।। হাঁ—হাঁ—পুছো না, বাঙালী বাবু—

ক্ষুদিরাম ।। এই যে তোমার স্ত্রীর জন্য কয়েকটা রূপোর গয়না পেয়েছ—একি তুমি মরবার সময় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে?

ফতে সিং ।। আরে কেয়া বল্‌তা তোম্?

ক্ষুদিরাম ।। আমি বলছি এই কথা যে, নিজের ঘরের কথা, নিজের দেশের কথা কখনো ভেবেছে ? এই যে দিনরাত ইংরেজের লাথি খাচ্ছ—এটা কি রকম বক্‌শিশ্? আপন জন্মভূমি স্বাধীন হোক—একি তোমরা চাও না, এ দেশ কি তোমাদের নয়? সে কথা কি কোনো দিন ভেবেছে তোমরা?

শিউপ্রসাদ ।। আর বাঙালীবাবু, ইয়ে ত' সিডিশনকা বাৎ। হামলোক এহি বাৎ নেহি শুনে গা—

ক্ষুদিরাম।। আর একটি কথা আমার কাছ থেকে শুনে রাখো, শিউপ্রসাদ আর ফতে সিং—! তোমরা দেশের লোক হয়ে দেশের লোককে ধরিয়ে দিচ্ছ—সামান্য কয়েকটা রূপোর গয়নার লোভে! কিন্তু ভেবে দেখ, একদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। তখন স্বাধীন দেশের লোকরা ঘৃণায় তোমাদের নাম উচ্চারণ করবে না। যদিও বা করে—বিশ্বাসঘাতক বলে তোমাদের উদ্দেশ্যে—থু থু ফেলবে—

ফতে সিং ।। আরে রাম! রাম! এ কেয়া বাৎ বলতা হ্যায়, বাঙালীবাবু ?

শিউ প্রসাদ।। হাম্‌লোকে সরকারকা নিমক খায়া হ্যায়। হাম ত' সরকার কা গোলাম হ্যায়।

ক্ষুদিরাম ।। হ্যাঁ, সারাজীবন গোলামী করো আর জাহান্নামে যাও—

শিউপ্রসাদ ।। চলো ভাই ফতে সিং চলো, বহুৎ রূপেয়া আউর চাঁদিকা চিজ মিল গিয়া—

ফতে সিং ।। হাঁ ভাই, আজ ঘরমে আনন্দ্ রহো। জয় সরকার কো জয়।

[উভয়ের প্রস্থান]

[আবার মৃদু ঐক্যতান শোনা গেল। ঘুমন্ত ক্ষুদিরামের মুখের ওপর আলো এসে পড়লো। দেখা গেল শান্তমনে সে ঘুমুচ্ছে। আরো খানিকক্ষণ বাদে কারাকক্ষের দেয়ালে কিংসফোর্ড সাহেবের মূর্ত্তি ভেসে উঠলো]

কিংসফোর্ড ।। হা—হা—হা! বাঙালীবাবু, তুমি হামায় মারতে গিয়েছিলে? হামাকে মারা ওতো সহজ হবে না! হা—হা—হা।

ক্ষুদিরাম ।। কিংসফোর্ড? তোমার লজ্জা করে না, —আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ ? মূর্তিমান মৃত্যুদূতের মতো আমি তোমার পেছনে পেছন ফিরেছি। তুমি ভীতু, তুমি কাপুরুষ। দুটি নারীর জীবনের বিনিময়ে—নিজের প্রাণরক্ষা করেছ ! লজ্জায় তোমার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত। তুমি আবার লোকের কাছে মুখ দেখাচ্ছ! এখন মানে-মানে দেশে চলে যাও সাহেব, নইলে তোমার নিস্তার নেই। ভেবেছ, এক ক্ষুদিরামের জীবন নিয়েই তুমি রক্ষা পাবে? আমার ভস্ম থেকে লাখো ক্ষুদিরাম গজিয়ে উঠবে। তাদের হাত থেকে কে তোমায় বাঁচাবে সাহেব?

কিংসফোর্ড ।। হা—হা—হা! যুগ যুগ ধরে হাম্‌রা টোমাদের শাসন করবো। টোমরা পায়ের টলায় থাক্‌বে। হা—হা—হা!

ক্ষুদিরাম ।। শয়তান সাহেব! এখন মনে হচ্ছে, তুমি তোমার বিপদের কথা জান্‌তে পেরেছিলে! তাই ইচ্ছে করে কেনেডি সাহেবের স্ত্রী-কন্যাকে নিজের গাড়ীতে তুলে দিয়ে নিজে আত্মগোপন করেছিলে। নারীর আঁচলে মুখ লুকিয়ে তোমরা আবার বীরত্বের গর্ব্ব করো সাহেব?

কিংস্‌র্ফোড।। প্রিজন্ সেলে বসে টুমি কী বীরট্ব দেখাবে, ক্ষুদিরাম ? Be prepared for the morning.

ক্ষুদিরাম ।। হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমার কৃতকর্ম্মের ফলভোগের জন্য প্রস্তুত হও। নিয়তির মতো সব সময়ে তোমার পিছনে মৃত্যুদূত ফিরছে ! কোন অমানিশায় আবার তার সঙ্গে তোমার মুখোমুখী হবে—তার জন্যে তৈরী থেকো কিংসফোর্ড সাহেব—হা—হা—হা!

কিংসফোর্ড।। Oh! horrible ! Oh God, help me ! I am undone !

[কিংসফোর্ড সাহেবের মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল]

[পুনরায় মৃদু বাদ্যধ্বনি শোনা গেল। ক্ষুদিরাম অঘোরে ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল দেয়ালের গায়ে ফুটে উঠেছে উকিল কালিদাস বসুর মূর্ত্তি। মূর্ত্তির মুখে বেদনার ছায়া]

কালিদাস ।। ক্ষুদিরাম, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু তোমায় বাঁচাতে পারলাম না! এ দুঃখ আমার কিছুতেই যাবে না!

ক্ষুদিরাম।। কে, উকিলবাবু? কালিদাসবাবু? আপনাকে প্রণাম। আপনি আমার জন্যে যথেষ্ট করেছেন।

কালিদাস।। কিন্তু তুমি যদি আমার শেখানো কথাগুলি কোর্টে বলতে তা হলে আমি আবার চেষ্টা করতে পারতাম।

ক্ষুদিরাম।। কালিদাসবাবু, আপনার আন্তরিকতা আমি বুঝি। কিন্তু ওই কিংসফোর্ড সাহেব যেমন দুটি নারীর জীবনের বিনিময়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারল, তেমনি আমি মিথ্যে কথা বলে আপন প্রাণ বাঁচাবো? না, না, আপনি আমায় সে অনুরোধ করবেন না। আপনি পিতৃতুল্য। আপনার স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আবার যেন আমি এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করতে পারি, আবার যেন মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচন করতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি।

কালিদাস।। ক্ষুদিরাম, তোমার দেশপ্রেম দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। মামলা চলাকালে তোমাকে আমার ছেলে বলে মনে হয়েছে। আমার নিজের যদি এমনি একটি দেশভক্ত পুত্র থাক্‌তো ত' নিজেকে আমি ধন্য মনে করতাম। যে দেশে তোমার মত ছেলে জন্মায়—সে দেশ বহুদিন পরাধীন হয়ে থাক্‌তে পারে না। এই আত্মত্যাগে তুমি অমর হয়ে থাক্‌লে ক্ষুদিরাম। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হবে—তখন ঘরে ঘরে তোমার মূর্তি পূজিত হবে। তোমার বীরত্বের কথা শুনে দেশের ছেলে-মেয়েরা অনুপ্রাণিত হবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি—সে শুভদিনের আর বেশী বিলম্ব নেই। তুমি বিশ্রাম গ্রহণ করো ক্ষুদিরাম, আমি চলি—

[কালিদাসের মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল]

[আবার বাদ্যধ্বনি। মঞ্চে ক্ষুদিরাম আবার অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ক্ষণিক বিরতির পর দেয়ালে শ্রীঅরবিন্দের মূর্ত্তি ফুটে উঠল]

শ্রীঅরবিন্দ।। বৎস ক্ষুদিরাম—

ক্ষুদিরাম।। একি ! শ্রীঅরবিন্দ! আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, দেব।

শ্রীঅরবিন্দ ।। তুমি অদ্ভুত মনোবলের পরিচয় দিয়েছ—সেইজন্যে আমি তোমায় অভিনন্দন জানাতে এসেছি ! আমরাও আজ কারাগারে বন্দী হয়েছি, কিন্তু তরুণ কিশোর তুমি, তোমার মতো এতখানি মনের বল দেখাতে পারিনি!

ক্ষুদিরাম।। একথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না। আপনার আদেশে যে মহান দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছিলাম—তা পালন করতে পারিনি, এ জন্যে আমি ত্রুটি স্বীকার করছি দেব। কিন্তু আমাদের এই প্রচেষ্টায় নিষ্ঠার অভাব ছিল না—এ কথা আপনি নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন।

শ্রীঅরবিন্দ ।। বিশ্বাস করবো বৈ কি! নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবো। আর সেই কথা জানাতেই ত' আজ নিশীথ রাতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তুমি জানো, রাজা সুবোধ মল্লিক, আমি আর চারু দত্ত একসঙ্গে সিদ্ধান্ত করেছিলাম—কিংসফোর্ড সাহেবের মৃত্যু চাই। কাজেই এ ব্যাপারে আমার দায়িত্ব কতখানি—তুমি কিশোর হলেও অতি সহজেই তা বুঝতে পারবে।

ক্ষুদিরাম ।। তা আমি জানি, দেব। মেদিনীপুরের বিপ্লবী নেতা—আমার গুরুদেব সত্যেন বসু—আমাকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ যদি তোমাকে কোনো কার্য্যে নিয়োগ করেন— তবে জীবন পণ করে তা পালন করবে। মেদিনীপুরের গুরুদেবের কাছে আমি বুকের রক্ত দিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। তাঁর ইচ্ছাই আমার কাছে গুরুর আদেশ।

শ্রীঅরবিন্দ।। সবই আমি জানি, ক্ষুদিরাম। আমার অবিদিত কিছুই নেই। তোমার ভেতর যে কী স্ফুলিঙ্গ আছে, তা তোমাকে এক মুহূর্ত্ত দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই ত' হাজার ছেলের মাঝখান থেকে তোমাকে আর প্রফুল্লকে নির্ব্বাচন করেছিলাম। আমার সে নির্ব্বাচনে যে ত্রুটি ছিল না, তা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। তবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভগবান বিরূপ। কিন্তু আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবো না। কারাগারের ভেতরে আর বাইরে বহু কর্ম্মী ছড়িয়ে আছে। তারা আবার নবোদ্যমে মন্ত্রের সাধন করতে এগিয়ে আসবে।

ক্ষুদিরাম।। দেব, আমার সব মনে আছে। কলকাতায় কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে হত্যা করবার জন্যে দুই বার চেষ্টা করা হয়েছিল। তারপর সাহেব যখন মজঃফরপুরে চলে আসে—তখন তার নামে অতি যত্ন সহকারে একটি পার্শেল পাঠানো হয়। সেই পার্শেলের ভেতর ছিল বই। আর বইয়ের মধ্যে সুকৌশলে বসানো ছিল একটি বোমা। কিন্তু কিংস্‌ফোর্ড সাহেব সে পার্শেলটা খোলে নি। ফলে সে প্রাণে বেঁচে গেছে।

শ্রীঅরবিন্দ।। তারপরেই ত' আমরা অন্যপথ বাছাই করে নিলাম। নির্ব্বাচন করলাম দুটি আগুনের ফুলকীকে। তার একটি ফুলকী তুমি, আর একটি হচ্ছে ভারতের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী। আজ দুঃখ এই যে, তোমাদের

দুটিকেই হারালাম, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হল না। তোরা দুটিতে আমার দুই বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে গেল! কিন্তু আমি আশাবাদী। আমি বিশ্বাস করি—বিলম্বে হোক্—তবু আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হবেই। মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন।

ক্ষুদিরাম।। আপনি দুঃখ করবেন না। আমরাই আবার ভারতের বুকে ফিরে আস্‌ব। যতদিন না বিদেশী দস্যু ভারত থেকে চলে যায়, আমরা ক্রমাগত সংগ্রাম করে চল্‌বো। মাতৃভূমিকে শৃঙ্খল মুক্ত করতেই হবে।

শ্রীঅরবিন্দ ।। তোর কথায় আবার নতুন করে মনে বল পাচ্ছি। জীবনের চলার পথে বাধা আস্‌বে, আস্‌বে—ঝড় আর ঝঞ্ঝা। কিন্তু আমরা বিপ্লবী দল, কখনো পেছু হটবো না। কবির বাণী মনে আছে ত' ?

" যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—
তুই এক্‌লা চল্‌রে—
বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে এক্‌লা চলরে।"

[শ্রীঅরবিন্দের মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল]

[আবার সেই মৃদু বাদ্যধ্বনি শোনা যেতে লাগল। ক্ষুদিরাম অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ক্ষণিক বিরতি। ধীরে ধীরে দেয়ালের গায়ে ফুটে উঠল—ক্ষুদিরামের দীক্ষাগুরু মেদিনীপুরের বিপ্লবী কর্ম্মী সত্যেন বসুর মূর্ত্তি]

সত্যেন ।। বৎস ক্ষুদিরাম—

ক্ষুদিরাম ।। আমার দীক্ষাগুরু সত্যেন্দ্রনাথ ? আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, দেব!

সত্যেন ।। ক্ষুদিরাম, আমার শিষ্যের গৌরবে আমি আজ সত্যই গৌরবান্বিত। আমি নিজে জীবনে যা করতে পারিনি, তুমি তাই সাধন করেছ। তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি, ক্ষুদিরাম।

ক্ষুদিরাম ।। গুরুদেব, স্বাধীনতার মন্ত্রে আপনিই আমায় সর্ব্বপ্রথম মেদিনীপুরে দীক্ষা দান করেছেন। আমি জানি, আপনি ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। আপনার কাছে জীবনের আদর্শই বড় কথা। সেই আপনার কাছে দীক্ষা লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি। আদর্শসিদ্ধির জন্যে আপনিই আমায় কলকাতায় পাঠিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, শ্রীঅরবিন্দ আমায় যে কাজে নিয়োগ করবেন— তার জন্যে যেন আমি জীবন পণ করি। আমি গুরুবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। পরলোকে যাত্রা করার পূর্ব্বে আমি আপনার আশীর্ব্বাদ মনে মনে কামনা করছিলাম, গুরুদেব! সেইজন্যই আপনার সাক্ষাৎ মিল্‌লো।

সত্যেন।। আশীর্ব্বাদ আমি তোমায় সব সময়ই করছি, ক্ষুদিরাম। একি আমার কম

গৌরবের কথা! তোমার কিশোর জীবনকে অঞ্জলি করে তুমি দেশমাতৃকার চরণে অর্পণ করেছ। সে সৌভাগ্য আমার আজও হয়নি! সেদিক থেকে তোমার গুরু হয়েও আমি শিষ্যকে ঈর্য্যা করি। এমন আদর্শ-প্রীতি আমি আমার দীর্ঘ জীবনে আর কারো দেখিনি। তুমি আমার বহু আগেই চলে যাচ্ছ। সে বেদনা আমার মনে তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। সুরলোকের দ্বারে তুমি যে সম্মান লাভ করবে— তার তুলনা নেই। তোমার অমর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক এই কামনা জানাই। [সত্যেন বসু মিলিয়ে গেলেন]

[মৃদু বাদ্যধ্বনি শ্রুত হল। মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে গেল। ক্ষুদিরামের দেহের ওপর একটা নীল রঙের আলো গিয়ে পড়ল। তাতে দেখা গেল—ক্ষুদিরাম অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ কারাকক্ষের দেয়ালে ক্ষুদিরামের দিদি অপরূপা দেবীর মূর্ত্তি ভেসে উঠ্‌ল। দেখা গেল, অপরূপা দেবীর চোখ জলে ভরা]

অপরূপা ।। ক্ষুদি ! না—না, আমার ক্ষুদি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ওকে আর ডাকবো না—

ক্ষুদিরাম ।। বড়দি, তুমিও তা হলে আমায় দেখা দিলে! যত ঘুমই আমার চোখে এসে বাসা বাঁধুক, তোমার ডাক শুনলে কি আমি চুপ করে থাকতে পারি, দিদি!

অপরূপা ।। ক্ষুদি, এই দেখবার জন্যেই কি আমি তোকে মানুষ করেছিলাম? মা যখন মারা যায়, তখন তুই এতটুকু। ভগবান জানেন, নিজের ছেলের মতোই আমি তোকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি।

ক্ষুদিরাম।। তাই ত দিদি ফাঁসিকাঠে ঝোল্‌বার আগে বারে বারে তোমাকেই দেখতে ইচ্ছে করছিল! ভগবান আমার সে সাধও পূর্ণ করেছেন!

অপরূপা ।। ফাঁসি কাঠে বিসর্জ্জন দেবার জন্যেই কি তোকে আমি মানুষ করেছি রে ক্ষুদি? আমার বুকের দুধ খেয়ে তুই বড় হয়েছিস। সে দুধের কি কোনো পুণ্যি ছিল না?

ক্ষুদিরাম ।। পুণ্যি ছিল না? তুমি বলছ কি, দিদি? তোমার পুণ্যির জোরেই ত' আমি এমন কাজ করতে পেরেছি। তোমার বুকের সুধা আমায় অমিত শক্তিশালী করেছে। তাই ত' আমি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি। মনে নেই কবির সেই বাণী— কত্তদিন তোমাকে আর ভাগ্নেদের শুনিয়েছি—

"সমুখে দাঁড়াতে হবে, উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি,
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা—
দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক।।"

আজকের মরণবিজয়ী ক্ষুদিরাম, তাকে ত' তিল-তিল করে তুমিই গড়ে তুলেছ, দিদি! আজ তোমার আনন্দ করবার দিন!

অপরূপা।। [অশ্রু-সজল চোখে] হ্যাঁ, আনন্দ করবার দিনই বটে! তোর এ বেশ যে আমি চোখ তুলে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছিনে রে, ক্ষুদি। মনে পড়ে সেইদিনকার কথা। মার শিয়রে মরণ এসে দাঁড়িয়েছে। মা সেদিন সেকথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন। মা আমায় কাছে ডাকলেন। তার দুটি চোখ জলে ভরে এলো। তিনি আমার দুটি হাত ধরে অনুনয় করে বললেন, খুকি, এক মুঠো ক্ষুদ দিয়ে তুই আমার কাছ থেকে ছেলেটিকে কিনে রাখ। আমি চলে গেলে ওর দশা কি হবে? আমায় কথা দে খুকি, নিজের ছেলের মতই ওকে তুই মানুষ করবি?

ক্ষুদিরাম।। তারপর দিদি? তারপর?

অপরূপা ।। আমার মুখে আর কোনো কথা সরে না। মা যত কাঁদেন, আমি তত চোখের জল ফেলি। শেষকালে একমুঠো ক্ষুদ এনে মার হাতে দিয়ে তোকে কিনে নিলাম আমি। সেই থেকেই ত' তোর নাম ক্ষুদিরাম, আমরা সবাই 'ক্ষুদি' বলে ডাকি।

ক্ষুদিরাম।। তোমার হাতে মানুষ হয়ে—ক্ষুদি সার্থক হয়ে উঠেছে দিদি। তুমি মনে কোনো দুঃখ রেখো না। তুমি ত' শুধু আমার দিদি নও, তুমি আমার মা, বাবা, বন্ধু, ভাই সব। জীবনে তোমার কাছে কোনো কথা লুকোইনি। সেই যে প্রথম স্বদেশী ডাকাতি করে মেদিনীপুর থেকে রাত্রে পালিয়েছিলেম—সেদিনও ত' তোমার কাছে কোনো কথা গোপন করিনি, দিদি। আজও আমার জীবনের কোনো কথা তোমার কাছে গোপন নেই। মেয়েরা শুদ্ধ দেহে, শুদ্ধ মনে স্নান করে পূজোর ফুল তোলে দেবতার পায়ে অঞ্জলি দেবার জন্যে। মনে করো, তোমার সারা জীবনের তপস্যার ফল ক্ষুদিকে—দেশের মায়ের পায়ে সমর্পণ করে গেলে—

অপরূপা ।। তোর মুখে এসব কথা আমি সইতে পারিনে, ক্ষুদি। আমি চোখের জল ফেলবার জন্যে বেঁচে রইলাম, আর তুই আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাবি, এ আমি কেমন করে সইব? ওরে তোর কাউকে দেখতে ইচ্ছে করে না?

ক্ষুদিরাম ।। তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। আর আমার ভাগ্নেদের খুব দেখতে ইচ্ছে করে। তা সব আশা ত' পূর্ণ হয় না'—

অপরূপা ।। তোর জামাইবাবু কিন্তু খুব ভয় পেয়েছেন—

ক্ষুদিরাম।। শোনো দিদি, জামাইবাবুকে বোলো, তিনি যেন আমার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার কথা অস্বীকার করেন। যেন বলেন, তিনি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন। নইলে তাঁর চাকরী নিয়ে গোলমাল হতে পারে।

অপরূপা ।। কোন্ প্রাণে আমি তাঁকে এই সব কথা বলবো? না-না আমি তা পারবো না। তোর সঙ্গে আমিও কাল মাথা খুঁড়ে মরবো—

ক্ষুদিরাম ।। দিদি—দিদি—

[চক্ষের পলকে অপরূপার মূর্তি দেয়াল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।]

[একটা ভোরের সুর নেপথ্যে বাজ্‌তে লাগ্‌লো। ছোট্ট জানালা দিয়ে খানিকটা ভোরের আলো এসে পড়ল ক্ষুদিরামের মুখে। সে তখনো অঘোরে ঘুমুচ্ছে। এমন সময় দুইজন জমাদারের প্রবেশ]

১ম জমাদার ।। আরে ভাই, তাজ্জবকা বাৎ! বাঙালী লেড়কাকো আজ ফাঁসি হোগা— আউর দেখো, উ নিদ্ যাতা হ্যায় !

২য় জমাদার ।। স্বদেশী বাবুকা কামই এইসা তাজ্জব হ্যায়! কাঁহাকা আদমী—কাঁহা চলা আয়া—! আপ্‌না ঘর, সুখ্-শান্তি সব ছোড়কে। এই বাবুকা মাফিক হামকোভি একটো লেড়কা হ্যায়! মেরা আঁখোমে পানি আতা হ্যায়। কেয়া করে গা ভাই ! নোকরীকা ওয়াস্তে সব কুছ্ করনে হোগা—

১ম জামাদার ।। আরে ছোড়ো তেরি ঝামেলা বাৎ! এ বাঙালীবাবু, উঠ্ যাও—টাইম হো গিয়া—

ক্ষুদিরাম।। [সোজা উঠে দাঁড়িয়ে] চলো জামাদার সাহেব, খুব ঘুমিয়েছি। আমি এখন প্রস্তুত। বন্দেমাতরম্—

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে ধ্বনিত হল ব-ন্দে-মা-ত-র-ম্]

—য-ব-নি-কা—

চিঠি লেখা শেখো

বাড়ীর দোর গোড়ায় হাজির হয়ে যদি ডাকপিয়ন হাঁক দেয়—"চিঠ্‌ঠি হ্যায় বাবু—" তবে কার না ভালো লাগে!

সেই চিঠি যদি খামে আঁটা হয়, তবে ত' আরো রোমাঞ্চকর ব্যাপার! কে চিঠি লিখলে, চিঠির ভেতর কি সন্দেশ লুকিয়ে এলো—একথা ভাবতে ভারী ভালো লাগে।

মানুষ থাকে কত দূরে, কিন্তু তার মনের কথা ভেসে আসে এই চিঠির ভেতর দিয়ে। কখনো-সখনো এমন সুন্দর চিঠিও আসে, যা পড়তে পড়তে মনে হয়—মানুষটি বুঝি একেবারে সামনে বসে কথা বলছে।

স্বপনবুড়ো-হিসেবে দেশের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে মাসে হাজার হাজার চিঠি পাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসে এই সব চিঠি। কত গ্রাম পেরিয়ে, কত নদী-নালা সাঁতরে, কত পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙিয়ে, কত শহরের ওপর দিয়ে বিমানে চড়ে আসে এই সব চিঠি। যেন মৌমাছি ঝাঁক বেঁধে আসে বন থেকে বনান্তরে। কে ছোট্ট মানুষটি ঠিকানা লিখে দিয়েছে, তাই ভরসা করে এই ছোট্ট চিঠি পাড়ি দেয় দীর্ঘ পথ।

কত ক্ষুদে মানুষের মনের কথা লুকিয়ে থাকে এই সব চিঠিতে। তোমাদের মধ্যে কেউ চিঠি লেখো ক্ষুদে-ক্ষুদে অক্ষর সাজিয়ে। মজার মজার কথা দিয়ে পাতা ভরাট করে। কেউ লেখো তড়বড় করে—লাইনগুলো ঠিক থাকে না। উচুঁ-নীচু হয়ে যায়—ঢেউ খেলানো পাহাড়ের মতো, কেউ চিঠি লিখতে বসে এত কাটাকুটি করো যে, সে চিঠি পড়া আর ধাঁধার উত্তর দেওয়া একই কথা। ভুরু কুঁচকে, চোখ বাঁকিয়ে, চশমা উঁচু নীচু করে, তবে সে চিঠি অনেক কষ্টে পড়তে হয়। আবার তোমাদের মধ্যে এমন ছেলেমেয়েরও অভাব নেই, যে নাকি চিঠি লেখবার আগেই এক দোয়াত কালি কাগজের ওপর ঢেলে বসে থাকো। তখন সে চিঠি পড়ে কার সাধ্য?

চিঠি এত কামনার জিনিস, এত আকাঙ্ক্ষার বস্তু—কিন্তু সেই চিঠি যদি সুন্দর করে না লেখা যায়, তবে—চিঠিখানি যে পায়—চট্‌ করে তার মন বিরক্ত হয়ে ওঠে।

একটি সুন্দর চিঠি পেতে কার না ভালো লাগে? ঝরঝরে মুক্তোর মতো অক্ষরগুলি পরপর সাজানো থাকবে, লাইন একেবারে সোজা, ভালো কাগজে ঘন কালিতে লেখা, বেশ সহজ সরল ভাষায় কথাগুলি গুছিয়ে বলা, পড়তে বেশ মজা লাগে—এমন চিঠি কে না পেতে চায় বলো?

রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা চিঠি দেখেছ? আমি শুধু দেখিনি, নিজেও পেয়েছি।

এমন মুক্তোর মত হাতের লেখা আর কয়জনের ছিল বলো? আমি তখন তোমাদেরই মতো ইস্কুলের নীচু ক্লাশের ছাত্র। হঠাৎ কি মনে হল। রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠি লিখলাম শান্তিনিকেতনের ঠিকানায়।

চিঠি লিখে, খামে পুরে, ঠিকানা লিখে ডাক বাক্সে ফেলে দিয়েছি। কখনো ভাবিনি—সেই চিঠির আবার জবাব আসবে। ভুলেই গেছি সেই চিঠি লেখার কথা। আর দশটা ছেলে-মানুষী ব্যাপারে সে চিঠি মন থেকে হারিয়ে গেছে !

এমনি সময় হঠাৎ একদিন বাড়ীর দোর গোড়ায় ডাকপিয়ন এসে হাঁক্ দিলে—"চিঠ্‌ঠি হ্যায়!" তারপর সে যে নামটি উচ্চারণ করলে সে যে আমারই নাম!

সত্যি অবাক হয়ে গেলাম! আমার নামে আবার কে চিঠি লিখবে? আড় চোখে তাকিয়ে দেখলাম—পোস্টকার্ড নয়, —খাম। কি আশ্চর্য! আমার কাছে খামে চিঠি আবার কে লিখল! আকাশ-পাতাল ভেবে আর কূল-কিনারা পাই না। ডাকপিয়ন ততক্ষণে অধীর হয়ে উঠেছে। হাঁকলে, "চিঠ্‌ঠি লেও।"

ভুল করে আর কারো চিঠি আমায় গছিয়ে দিচ্ছে না ত'? যা থাকে কপালে ! বরাৎ ঠুকে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানি নিয়ে নিলাম।

খামের ওপর চোখ পড়তে সত্যি কথাই বল্‌ব তোমাদের—দেহে-মনে যেন একটা শিহরণ জাগলো। এ যে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর!

এটা যে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা সেটা কি করে চিনলাম, বলো ত'? তবে ব্যাপারটা তোমাদের খুলেই বলি শোনো।

সেই সময় প্রতি মাসে "প্রবাসী" কাগজে 'কুন্তলীনের ' বিজ্ঞাপন ছাপা হত। আর সেই বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর ব্লক করা থাকতো।

চট্ করে দেখেই বুঝতে পারলাম—সে লেখা আর এ-লেখা হুবহু এক। ছেলেবেলায় আমরা রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর নকল করতাম কি না! তাই ওই হাতের লেখার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল।

তখন একেবারে ব্যাঘ্র-ঝম্পটে চিঠিখানি খুলে ফেললাম। সত্যি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই চিঠির উত্তর দিয়েছেন। তখন ভেবে দেখ আমার মনের অবস্থা। যেন সাত রাজার ধন খুঁজে পেয়েছি।

একটি ছোট ছেলের আঁকাবাঁকা হাতের লেখা চিঠির উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ? এই ঘটনা. থেকেই তোমরা বুঝতে পারবে যে, ছোটদের তিনি কি চোখে দেখ্‌তেন! এইরকম অজস্র চিঠির উত্তর তিনি প্রতিদিন দিতেন। যখন বয়স খুব বেশী হয়ে গিয়েছিল— লিখতে হাত কাঁপত—তখন রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁর মুখের কথা শুনে চিঠিখানি লিখে দিতেন—আর রবীন্দ্রনাথ তলায় নাম স্বাক্ষর করতেন। সে রকম চিঠিও আমি অনেক দেখেছি।

আর একজন নামকরা সাহিত্যিকের হাতের লেখা ছিল—অতি সুন্দর। যেন একেবারে ছাপার অক্ষর। তিনি হচ্ছেন সকলের প্রিয় শরৎচন্দ্র। তাঁর লেখা সব চিঠিও আমি দেখেছি।

এসব কথা তোমাদের বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে— হাতের লেখা সুন্দর হলে লোকে তোমার চিঠিখানি পড়বে, আর যত্ন করে রেখে দেবে। কিন্তু যদি তোমার চিঠিতে খারাপ হাতের লেখা থাকে, এখানে ওখানে কাটাকুটিতে চিঠিখানি বিশ্রী হয়ে ওঠে, তার ওপর প্রচুর বানান ভুল থাকে— তবে অতি সহজেই বুঝতে পারছ যে, তোমার চিঠিখানি একবার হাতে নিয়েই লোকে তাচ্ছিল্য করে ফেলে দেবে।

সত্যি কথা বল্‌তে কি, হাতের লেখা চিঠিখানি দেখে বলা যায়, মানুষটি কেমন ! গুছোনো না অগোছাল? অব্যবস্থিত চিত্ত না ধৈর্য্যশীল? শিক্ষিত কি অশিক্ষিত?

মানুষের হাতের লেখা চিঠি দেখে এত কথা অতি সহজেই বলা চলে।

কাজেই তোমরা অতি ছেলেবেলা থেকেই হাতের লেখাটি মুক্তোর মতো সুন্দর করবে। একটু ধৈর্য্য থাকলেই এ জিনিসটি করা চলে। প্রতিদিন যদি তোমরা মন দিয়ে হস্তলিপি লেখো তা হলে দেখতে পাবে যে, কয়েক মাসের মধ্যেই তোমাদের হাতের লেখা বেশ ভালো হয়ে উঠেছে। সারা-জীবনের সুবিধের জন্যে এ কষ্টটুকুকে আশা করি তোমরা কষ্ট বলেই মনে করবে না।

এখন ভালো করে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, ভালো চিঠি লিখতে গেলে কি কি গুণ থাকা দরকার। সকলের আগে প্রয়োজন সুন্দর হাতের লেখা। তারপর দরকার বক্তব্য বিষয় সুন্দর করে গুছিয়ে লেখা। তুমি আবোল-তাবোল অনেক কিছু বক্‌লে— কিন্তু তোমার বলবার কথা পরিষ্কার হল না। তা হলে আমি নিশ্চয়ই তাকে ভালো চিঠি বলবো না।

তোমার মনোভাব ঠিক ঠিক অল্প কথায় প্রকাশ করতে হবে।

কোনো চিঠি লিখতে বসে এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে, এযুগে মানুষের সময় বড় কম। তাই অতি অল্প কথায় মোদ্দা কথাটা পাঠককে বুঝিয়ে দিতে হবে।

কবিত্ব করে চিঠি লেখার অবশ্য আলাদা সাহিত্যিক মূল্য আছে এবং বহু সৎ-সাহিত্য চিঠির ঢঙে লেখা হয়েছে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের চিঠি হবে— সহজ, সরল এবং সংক্ষিপ্ত।

অবশ্য একথাও তোমাদের ভুললে চলবে না যে, জোরালো লেখনীর পাল্লায় পড়লে চিঠিও সাহিত্যের পর্য্যায়ে গিয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে— রবীন্দ্রনাথের লেখা অজস্র চিঠিগুলি। ও গুলি আর শুধু চিঠি নেই, সাহিত্যের পাকা আসনে স্থান পেয়েছে। তোমরা যদি রাশিয়ার চিঠি, ছিন্নপত্র প্রভৃতি মন দিয়ে পড়ো

তা হলে আমার কথা ঠিক বুঝতে পারবে। অবশ্য তাঁর সব চিঠি বুঝতে হলে তোমাদের আরো বড় হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের রকমারী চিঠি পড়লে তিনি মানুষটি কেমন ছিলেন, তা অতি চমৎকারভাবে বোঝা যায়। অনেক সময় মনে হয় যে, তিনি সামনে বসে কথা কইছেন।

এইবার চিঠি লেখার মূল সূত্রগুলি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি।

চিঠি লিখতে বসে কাগজের ডানদিকে একেবারে ওপরে ঠিকানা ও তারিখ পরিষ্কার করে আগে লিখে নেবে। অস্পষ্ট করে ঠিকানা কিম্বা অসম্পূর্ণ ঠিকানা লেখার দরুণ তোমরা অনেক সময় চিঠির উত্তর পাও না। ঠিকানা লিখ্‌তে অনেকেই ভুল করো। এই ভুলটি যে শুধু ছোটরাই করে থাকে তা নয়, অনেক সময় বয়স্করাও এই সাংঘাতিক ভ্রমে পতিত হন। খুব জরুরী চিঠি কেউ লিখেছেন, প্রত্যহ পত্রের উত্তর আশা করেছেন, কিন্তু তিনি যে গোড়াতেই গলদ করে বসেছেন—সে কথা একবারও তাঁর মনে হচ্ছে না। মানে— নিজের ঠিকানা লিখ্‌তেই ভুলে বসে আছেন। চিঠির উত্তর আসবে কি করে?

ছোটরা ত' এই ভুলটা হামেশাই করে থাকো। তাই তোমাদেব সকলকেই আমি জানিয়ে দিচ্ছি—চিঠি লিখ্‌তে বসেই সকলকার আগে ঠিকানা ও তারিখ বসিয়ে নেবে। এই দুটো জিনিস যে কত দরকারী, যত বড় হবে— তোমরা ততই বুঝতে পারবে।

এর পরেই ভাষাটা ঠিক করে নাও। কি ভাষায় তুমি চিঠিখানি রচনা করবে? পাঠ্য-পুস্তকের ভাষায়, না চলতি ভাষায়? তার মানে—'করিয়া' 'খাইয়া' করে লিখবে—না, 'করবো', 'খাবো' বলে চালাবে? আমার বলবার কথা হচ্ছে, যাই করো না কেন একটা ধারা বরাবর বজায় রাখবে। অনেক চিঠিতে দেখতে পাই ভাষার একেবারে জগা-খিচুড়ি হয়ে গেছে। যেমন ধরো—

স্বপনবুড়ো,

আমাব এই চিঠিখানি পেয়ে তুমি খুব অবাক হয়ে যাবে। অনেক উঁচু জায়গা অর্থাৎ সিম্‌লা পাহাড় থেকে চিঠিখানি লিখছি। এখানকার শুভ্র শৈলমালা দেখিয়া আমি রোজ বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকি। ইত্যাদি—

ওপরের এই ছোট্ট চিঠিখানিতে কি ত্রুটি রয়েছে আশা করি তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছ। চিঠি সুরু করেছে—অবাক হয়ে যাবে বলে—কিন্তু খানিকটা এগিয়েই— 'দেখিয়া ও তাকাইয়া থাকি—' হয়ে গেল পাঠ্য-পুস্তকের ভাষা। কিন্তু এই দুই জাতীয় ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলে তোমাদের রচনা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। যাকে বলে— এক কলসী দুধে গোচনা ফোঁটা চোনা! কাজেই চিঠির ভাষার দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখ্‌বে। নইলে 'গুরুচণ্ডালী' দোষ থেকে যাবে।

চিঠি সম্পর্কে আর একটি জরুরী কথা—তোমার বক্তব্য বিষয়টি আগে মনে মনে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে। তা হলে দেখ্‌বে পর পর ঠিক বলার বিষয়গুলি সাজানো হয়েছে, ভাষাটিও হয়েছে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর।

আজকের যুগে মানুষের সময় খুব কম। তাই দীর্ঘ চিঠি পেলে সহজে কেউ পড়তে চায় না। টেবিলের একপাশে সরিয়ে রেখে দেয়। তোমাদের চিঠি হবে সংক্ষিপ্ত, ভাষা হবে সরল, বক্তব্য বিষয় হবে—পরিষ্কার। ঘোর-প্যাঁচের ভাষা ব্যবহার করলে তাতে পত্র-লেখক নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তোমরা লক্ষ্য করে দেখে থাকবে, ইদানীং সরস্বতী পূজোর নেমন্তন্ন চিঠিতে এমন সব অদ্ভুত ভাষা ব্যবহার করা হয়, যার প্রশংসা কোনো মতেই করা চলে না। কিন্তু সহজভাবে যদি পত্র রচনা করা হয়, তা হলে তা' সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করে।

অবশ্য পূজনীয়দের কাছে, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, এবং ছোটদের কাছে চিঠি লেখ্‌বার ভাষার কিছুটা তারতম্য হবেই। আর সেই মুসাবিদা পড়েই বোঝা যাবে চিঠিখানি কাকে লেখা হয়েছে।

ওপরের এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিদের কি রকম 'পাঠ' দিতে হবে? সেটাও একটা ভাববার কথা। যাঁরা নিকট আত্মীয় এবং পূজনীয়, তাঁদের লিখ্‌বে 'শ্রীচরণকমলেষু', অনাত্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লিখতে পারো 'শ্রদ্ধাস্পদেষু'। অথবা 'সবিনয় নিবেদন' বলেও চিঠিখানি সুরু করা অন্যায্য কিছু নয়। যারা তোমাদের সমবয়সী কিম্বা বন্ধু— তাদের 'শ্রীতিভাজনেষু' 'সুপ্রিয়েষু' বলে সম্বোধন করতে পারো। বয়সে ছোট যারা তাদের কাছে 'স্নেহাস্পদেষু' অথবা 'সুপ্রিয়েষু' বলে সম্বোধন করতে পারো। বয়সে ছোট যারা তাদের কাছে 'স্নেহাস্পদেষু' বলে চিঠি লেখা যেতে পারে। বয়েসে ছোট অনাত্মীয় মেয়েদের কাছে 'সুচরিতাষু' বলে চিঠি সুরু করা যেতে পারে।

অনেক চিঠির মধ্যে বহু গালভারী সম্বোধনও লক্ষ্য করা যেতে পারে যেমন—'নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু', 'সম্মানপুরস্মরনিবেদনমেতৎ', 'সাবিত্রীসমানেষু', 'পরমস্নেহাস্পদেষু', 'প্রীতিনিলয়েষু', 'পবমভাগবত-পরমভট্টারকেষু' 'মহামহিমার্ণব' ইত্যাদি—

আজকাল অবশ্য এই জাতীয় দাঁতভাঙা সম্বোধন ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। তার বদলে আসছে সহজ পাঠ। 'ভাই', 'প্রিয়বন্ধু', 'শ্রদ্ধেয়', 'প্রিয়বর' প্রভৃতি পাঠ আজকাল চল্‌তি হয়েছে বেশ।

তোমরা অনেকে চিঠিতে 'ইতি' দেবার সময় শুধু নামটা লেখ। যেমন—ইতি পবিত্র, কিম্বা ইতি জ্যোৎস্না। কিন্তু যার কাছে চিঠি লিখছো, তার পরিচিত একাধিক 'পবিত্র' কিম্বা 'জ্যোৎস্না' থাকতে পারে। তাই সব সময় ইতির পর পুরো নাম ব্যবহার করবে—নিজের উপাধি সহ।

ঠিকানা লেখা আর একটি জরুরী ব্যাপার, যার দিকে তোমাদের সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তোমরা অনেক সময় একেবারেই ঠিকানা না লিখে—চিঠি ডাক বাক্সে ফেলে দাও। ফলে সেগুলো একেবারে "ডেড্‌লেটার" অফিসে গিয়ে হাজির হয়। আবার, এমন ছেলেমেয়েও অনেক আছে—যারা তাড়াতাড়ি অর্দ্ধেক ঠিকানা লিখে ছেড়ে দাও। ফলে, সেই সব চিঠি নিয়ে ডাকপিয়নদের একেবারে গলদঘর্ম্ম সুরু হয়। কেউ হয়ত পোস্টাপিস উল্লেখ করলে না। আবার কেউ জেলার নামটা বেমালুম বাদ দিলে। এ জাতীয় কাজ তোমরা কখনই করবে না। বেশ মন দিয়ে পুরো ঠিকানা লিখবে এবং লেখবার পর বার বার মিলিয়ে দেখে নেবে।

টিকিট লাগানোটাও একটা মস্তবড় সমস্যা। অনেকে বেমালুম টিকিট লাগাতেই ভুলে গেলে। কেউবা প্রয়োজনীয় টিকিটের অর্দ্ধেক লাগালে, বাকি অর্দ্ধেক লাগালে না। ফলে চিঠিখানি বেয়ারিং হয়ে গেল। যার নামে চিঠি তিনি যদি না রাখেন, তবে ওটা আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে। তখন অনেক পয়সা খরচ করে তোমাকেই আবার সেই চিঠি ছাড়িয়ে নিতে হবে। তবেই বুঝে দেখ, সামান্য ভুলের জন্য কত জরিমানা তোমাদের দিতে হয়! যারা পোষ্টকার্ডে চিঠি লিখবে— তাদের এতটা হাঙ্গামা নেই। কিন্তু যারা খামে লিখ্‌বে, তাদের ঠিকানা ও ডাকটিকিটের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে—নইলে বুঝতে পারছ পদে-পদে বিপদ।

আরও একটি মারাত্মক ভুল তোমরা প্রায়ই করো। যেমন ধরো, তোমরা কয়েকজন 'পাত্‌তাড়ির' সভ্য হবে বলে চিঠির সঙ্গে ডাকটিকিট পাঠাবে। হিসেবে হয়ত আট আনা কি দশ আনা হল। সেই ডাকটিকিটগুলো তোমরা চিঠির সঙ্গে খামের ভেতর না দিয়ে কেউ কেউ খামের ওপরই মেরে দাও। ফলে ডাকপিয়ন তার ওপর ডাকঘরের ছাপ লাগিয়ে দেয়।

ফলে সবগুলো টিকিটই অকেজো হয়ে গেল। ডাকটিকিট পাঠানোর কোনো ফলই আর হল না! এতগুলো পয়সা মিছিমিছি তোমাদের নষ্ট হল। কাজেই এই ব্যাপারে তোমাদের খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

তোমাদের সকলেরই ভালো করে গুছিয়ে চিঠি লেখা শেখা উচিত। যা-তা করে, অগোছালভাবে, কাটাকুটি করে, ভুল বানানে ভর্তি চিঠি তোমরা কেউ লিখবে না। একখানি চিঠির ভেতর দিয়ে তোমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, সাধারণ জ্ঞান সব কিছু ধরা পড়ে। কাজেই সামান্য চিঠি উপেক্ষার বস্তু নয়। একটু চেষ্টা করলেই সামান্যকে তোমরা অসামান্য করে তুলতে পারো।

ঘর-সাজানোর খেলা

তোমাদের মধ্যে কেউ খুব বড়লোক, কেউ মধ্যবিত্ত, আবার কেউ বা খুবই গরীব। সমাজের বিভিন্ন স্তরের ছেলে-মেয়ে তোমরা। কিন্তু অবস্থার এত তারতম্য থাকা সত্ত্বেও তোমাদের প্রত্যেকেরই মাথা গোঁজবার একটি করে ঠাঁই আছে।

সেই মাথা গোঁজবার ঠাঁই—কারো অতি বড়—কারো বা নেহাৎই ছোট—যাকে বলে ভালো করে হাত-পা মেলে থাকা যায় না! তবু তো সেটা তোমাদের আশ্রয়। ওইখানে বসে সবাই পড়াশোনা করো, ছোট ভাই-বোনদের সঙ্গে গল্প জমিয়ে তোলো, বৃষ্টি-ঝরঝর সন্ধ্যায় সবাই ঘিরে বসে মুড়ি আর ছোলা ভাজা খাও। আবার, পড়তে পড়তে ওইখানেই মাদুরের ওপর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ো।

এই যে তোমাদের একান্ত আপনার ঠাঁই—একে কি তোমরা অগোছাল—আবর্জ্জনায় পূর্ণ করে রাখবে—না, সুন্দর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে মনোরম করে তুলবে?

কোনো একটি বাড়ীতে ঢুকলে—তার পরিবেশ চট্ করে আমাদের চোখে পড়ে। কোনো গৃহে প্রবেশ করেই দেখা যায়—এখানে-ওখানে জঞ্জাল ছড়ানো, উঠোনের মাঝখানে ময়লা জমে আছে; ঘুঁটে, কয়লা, ছাই চারদিকে আবর্জ্জনার সৃষ্টি করেছে। ছেঁড়া খবরের কাগজে ঘরগুলি বিশ্রী হয়ে আছে। ছোট ছেলেমেয়েদের পড়বার বইগুলি এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। হুঁকোর জল, আর তামাকের গন্ধে সেখানে দাঁড়ায় কার সাধ্যি ? দেখেই মনে হয় এটা যেন একেবারে অলক্ষ্মীর সংসার । বাড়ীর গৃহিণী কোনো দিকেই নজর দেন না । ঝাঁটাটা সদর দরজার সামনেই পড়ে আছে। সবাই সেইটে ডিঙিয়ে পথ করে চলছে, কিন্তু কেউ ওটাকে তুলে ঘরের এককোণে রেখে দিচ্ছে না। দেখেই মনে হয়, এটা যেন একেবারে অলক্ষ্মীর সংসার।

আবার, আর একটি বাড়ীতে ঢোকো—দেখবে, উঠোনটি ঝক্‌ঝকে করে নিকানো। (হোক্ না সেটা চাষার বাড়ী) একেবারে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যায় । মাঝখানে একটি তুলসী-মঞ্চ । সেখানে গৃহলক্ষ্মী সন্ধ্যা-প্রদীপ দেয়। এদিক-ওদিক তাকালেই বুঝতে পারবে—সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। মরাই ভর্ত্তি ধান, গোয়ালে সুন্দর গাই, হাঁস, ছাগলগুলিও দিব্যি পুরুষ্টু। ঘরের ভেতর উঁকি দাও—দেখবে—এককোণে লক্ষ্মীর পট—সেখানে সন্ধ্যাবেলায় পূজো দেওয়া হয়। জিনিস-পত্র, বাসন-কোসন সব সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। ছেলেদের বই-পত্তর জামা-কাপড় একটা ঘরে বেশ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। টল্‌টলে পুকুরের জল, বাড়ীর সামনে সাজানো ফুলের বাগান, বাড়ীর পেছনে ফলের বাগানেও কোনো জঞ্জাল জমে নেই। এই সব দেখে তোমাদের মনে হবে, মা লক্ষ্মী যেন এখান দিয়ে পায়ের ছাপ রেখে হেঁটে চলে গেছেন।

পর পর এই দুটো বাড়ী দেখলে—কোন্ বাড়ীটা তোমাদের ভালো লাগবে? আমাকে বোধ করি কিছুই বলে দিতে হবে না। তোমরা নিজেরাই একটা মতামত গড়ে নিতে পারবে।

এখন বলবার কথা হচ্ছে এই যে, একটা না একটা ঘরে তোমাদের মাথা গুঁজে থাকতে হয়। জায়গা ছোট হোক্ আর বড় হোক্ তাকে তোমরা মনের মতো করে সাজিয়ে রাখবে কি না?

দেয়ালে আজে-বাজে ক্যালেণ্ডার না ঝুলিয়ে কয়েকটি নির্ব্বাচিত ছবি রাখলে এবং প্রয়োজনীয় দু' একটি রুচি সম্পন্ন ক্যালেণ্ডার ঠিক যেখানটায় মানায় ঠিকভাবে সাজিয়ে দিলে। জান্‌লাগুলিতে হাল্‌কা রঙের পর্দ্দা খাঁটিয়ে দিলে। যদি মনে করো পর্দ্দা খাঁটাবার পয়সা জুটছে না—তবে মা, দিদিদের পুরানো রঙীন সাড়ী দিয়েও অতি সুন্দরভাবে পর্দ্দা তৈরী করা চলবে। যদি রুচি থাকে, তবে নিজের চেষ্টাতেই একটু মাথা ঘামিয়ে, খানিকটা পরিশ্রম করে বেশ ঘর সাজিয়ে নেওয়া চলে।

ধরো, তোমার পড়বার একটা টেবিল আছে। একদিকে তোমার পড়বার বইগুলি সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখবে। বইয়ের ওপর বই, আর খাতার ওপর খাতা।

ছোট একটি মূর্ত্তি সংগ্রহ করে নাও। সে মূর্ত্তি নটরাজের হতে পারে, বুদ্ধদেবের হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের হতে পারে—তোমাদের যার যেমন ইচ্ছে। দুটি ফুলদানি সংগ্রহ করে নাও। যদি পয়সা না জোটে—নিজের হাতেও ফুলদানি তৈরী করে নিতে পারো। এঁটেল মাটি দিয়ে কিম্বা কাগজের মণ্ড দিয়ে।

তোমরা যে অঞ্চলে থাকো—হয়তো সেখানে সব সময় ফুল সংগ্রহ করতে পারা যায় না। তাতেই হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। কাগজ দিয়ে রঙ-বেরঙের ফুল তৈরী করে নাও। একটু চেষ্টা করলেই এই ফুল তোমরা তৈরী করা শিখে নিতে পারবে। নিজে শিখে—অপরকেও শিখিয়ে দাও। দেখবে— এতে বিশেষ কিছু খরচ হয় না। কাগজের সেই ফুল, ফুলদানিতে বসিয়ে দাও। চমৎকার হবে দেখতে, ঘরের সৌন্দর্য্য অনেকটা বেড়ে যাবে। আবার সাদা কাগজ কুচিয়ে সাদা ফুলের মালা তৈরী করো। তাই বুদ্ধদেব কিম্বা রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তির গলায় দুলিয়ে দাও। পড়বার সময় যদি একটি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে নিতে পারো ত' দেখবে, সেই সুগন্ধে কেমন চমৎকার পড়ায় মন বসেছে।

পড়তে বসবার আগে পরিবেশটি সুন্দর করে তৈরী করে নিতে হবে। পড়বার সময় যদি তোমরা খালি বিছানায় গড়াও, তা হলে লেখাপড়ায় একেবারেই মন বসবে না। যা পড়বে সেটাও বেমালুম ভুলে যাবে।

ঘরে কখনো জঞ্জাল জমতে দেবে না। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, জানালার ধারে—ঘরের কোণে মাকড়সা জাল বোনে, আরশুলা ডিম পাড়ে, টিক্‌টিকি ওৎ পেতে বসে থাকে। ডি. ডি. টি. পাউডার ছড়িয়ে দিলে এগুলো পালাতে পথ পাবে না। অনেক সময় ছারপোকা বিছানায় সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ঘাপ্‌টী মেরে থাকে । সুযোগ পেলেই গৃহ স্বামীকে আক্রমণ করে । ডি. ডি. টি. হচ্ছে এ সবের মহৌষধ । দেখবে হাতে হাতে ফল ফলেছে । ঘরের মেঝে মাঝে মাঝে ফিনাইল গোলা জল দিয়ে মুছে উপদ্রব কমে যায়।

জুতো তোমাদের এত দরকারী বস্তু—অথচ এর দিকে আদৌ দৃষ্টি থাকে না কারু। অনেকে ত' পথ চলবার সময় জুতো জোড়া সাম্‌নের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও। তারপর সেই কাদামাখা জুতো জোড়া বাসায় এসে কোথায় যে ডিগবাজী খাইয়ে রাখো, কাজের সময় আর তাদের সন্ধান মেলে না!

জুতোর যত্ন না করলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তা ছিঁড়ে যায়। কাজেই প্রত্যহ বাড়ী ফিরে একটা ন্যাকড়া দিয়ে জুতো পরিষ্কার করে রাখবে। সপ্তাহে একদিন করে নিজে হাতে কালি দেবে। তাহলে পয়সাও কম খরচ হবে, আর জুতোও বহুদিন টিকবে। একটি বিশেষ জায়গায় জুতো রোজ গুছিয়ে রাখবে। তাহলে কাজের সময় আর সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াতে হবে না।

ঘর সাজানোর কাজে এ সবেরও প্রয়োজন আছে। অনেকে রাস্তার জুতো শোবার ঘরে এনে ঢোকায়। তাতে ভয়ানক রোগ ছড়ায়। কেন না রাস্তার জুতোর নীচে বহু রোগের বীজাণু লুকিয়ে আছে। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলেছেন, আমাদের দেশে যে যক্ষ্মা রোগ এত ছড়াচ্ছে—তার অন্যতম কারণ হচ্ছে রাস্তার জুতো শোবার ঘরে নিয়ে আসা। তোমরা এই কাজটা কখনো করবে না।

ঘরকে যত সুন্দর করে সাজিয়ে পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে করে রাখবে, তত তোমাদের পড়ায় মন বসবে। অপরিচ্ছন্ন গৃহে কি পড়তে মন বসে? সব সময়ে মন ঘিন ঘিন করে। আর যাও বা পড়া যায়—শেষ পর্যন্ত কিছুই মনে থাকে না।

ঘর সাজানোটা একটা মস্ত বড় শিল্পের কাজ। এ সব কাজে যাদের নিষ্ঠা আছে, তারা নিজেদের চেষ্টায় বেশ মাথা খাটিয়ে সুন্দরভাবে ঘর সাজিয়ে রাখে। তা দেখে সবাই বলে, বাঃ! চমৎকার সাজানো-গুছানো ঘরটি ত'। যারা একটু ফাঁকা জায়গায় বাস করো, তারা ইচ্ছে করলেই ঘরের সামনের জমিতে ছোট-খাটো একটি ফুলের বাগান তৈরী করে নিতে পারো। ফুলের বাগানের মতো নির্মল আর পবিত্র জিনিস আর কিছু নেই। পড়বার সময় ফুলের সুবাস যদি ঘরে আসে, পড়ায় তোমাদের নিশ্চয়ই মন বসবে। প্রতিদিন বিকেল বেলা খানিকক্ষণ করে পরিশ্রম করলেই একটি ছোট-খাটো ফুলের বাগান তোমরা তৈরী করে তুলেতে পারবে।

যদি তোমাদের ঘরে বেশ জায়গা থাকে, তবে যে কোনো উপায়ে হোক একটি আলমারী সংগ্রহ করবে। তাতে নির্ব্বাচিত ভালো-ভালো বই রাখবে। অবসর-সময়ে বা ছুটির দিনে—সেই বইগুলি পড়বে। ভালো বইয়ের মতো খাঁটি বন্ধু আর কেউ নেই। সেই জন্যে একজন পাশ্চাত্য মনীষী বলেছেন, বাড়ীতে যদি সুগৃহিণী থাকে, একটি সুন্দর ফুলের বাগান থাকে, এবং সুনির্বাচিত একটি পাঠাগার থাকে, তবে সে বাড়ী নন্দন-কাননের সমান।

তোমরা ইচ্ছে করলে ঘরে ঘরে নন্দন-কানন গড়ে তুল্‌তে পারো, একটু চেষ্টা করেই দেখ না!

ছোটদের আনন্দ আসর

বর্ষামঙ্গল উৎসব

আষাঢ়ের প্রথম দিনের ধারা বরিষণের মাঝখানে তোমাদের মন ময়ূরের মত পাখা মেলে দিয়ে উৎসবে মত্ত হতে চায়। সে উৎসবের নাম হচ্ছে "বর্ষা-মঙ্গল উৎসব"। কবি কালিদাসের যুগ থেকে আমাদের ভারতবর্ষে এই "বর্ষা-মঙ্গল উৎসব" প্রচলিত আছে।

কদম-কেশর বনতলের ধূলি ঢেকে ফেলেছে—মৌমাছিরা কেয়া বনে উৎসবের আনন্দে পথ হারিয়ে ফেলেছে—পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে আকাশ ছেয়ে রেখেছে—বর্ষার এই অপরূপ সমারোহ দেখে কবি বালকের দলে ভিড়ে গিয়ে গাইছেন—

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে!"

এই বর্ষা-মঙ্গল উৎসবের আয়োজন তোমরা কিভাবে করবে? প্রথমেই ভেবে দেখতে হবে বর্ষা আমাদের জীবনে কিসের আনন্দ বারতা বয়ে নিয়ে আসছে? বর্ষা ঋতু হচ্ছে প্রাচুর্য্য আর শ্যামলিমার শুভলগ্ন। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ধরণী তৃষিত-কণ্ঠ হয়ে ছিল। বর্ষার বারি ধরিত্রীর পিপাসা দূর করে দেবে, আর সেই সঙ্গে আয়োজন করবে বর্ষা-মঙ্গল উৎসবের।

যখন কবি বলেছেন—

"আজিকার কাজরী গাথায়—ঝুলনের দোলা লাগে শাখে শাখে, পাতায় পাতায়",

—তখন ছোটর দলই বা চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে থাকবে কেন? এসো আমরা বর্ষা-মঙ্গলের একটি কর্ম্মসূচী তৈরী করে ফেলি।

প্রথমেই মেয়েরা উৎসব-প্রাঙ্গণে পিটুলি গুলে অতি সুন্দর করে আল্পনা দেবে। আল্পনা প্রাচীন ভারতের অতি সূক্ষ্ম কারুশিল্প। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এমন নিপুণভাবে আল্পনা দেবার প্রথা প্রচলিত নেই। উৎসব-অঙ্গনটি তারপর ধূপ-ধূনোর পবিত্র গন্ধে আমোদিত করে তুলবে। বর্ষার ফুল—কদম্ব, রজনীগন্ধা, কেয়া, জুঁই, বেলি প্রভৃতি দিয়ে আসরটি সুন্দরভাবে সাজাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ছবি আঁকতে পারো, তারা দুটি প্রতিকৃতি আঁকবে। একটি কবি কালিদাসের, অপরটি রবীন্দ্রনাথের। ভারতের এই দুই কবির চোখে বর্ষা ঋতু যে মনোরম ছন্দের গাথায় ধরা পড়েছে এমন আর কোনো দেশের কোনো কবির রচনায় পড়েনি। কবি কালিদাস বর্ষাকে আবাহন করেছেন "মেঘদূত" কাব্যের ভেতর দিয়ে, আর রবীন্দ্রনাথ তাকে নিজের অন্তরে বরণ করে নিয়েছেন বিচিত্র বর্ষা-সঙ্গীতে। তাই বর্ষা-মঙ্গল উৎসবে আমাদের প্রিয় এই দুই কবি স্মরণীয় আর বরণীয়।

অতি প্রত্যূষে তোমরা বৃক্ষ-রোপণ উৎসব করবে। বট, অশ্বত্থ, অশোক, বকুল

জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করবে একটি সুন্দর স্থান নির্ব্বাচন করে,—যাতে কয়েক বছরে এই বৃক্ষটি বড় হয়ে বহু পথিককে তার ছায়ায় আতিথ্য প্রদান করতে পারে। সন্ধ্যাবেলা—বর্ষা-মঙ্গল আসর বসবে।

রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান বহু আগে থেকেই বাছাই করে নেবে। সেই নির্ব্বাচিত সঙ্গীতগুলি কখনো ছেলের গলায়, কখনো মেয়ের কণ্ঠে, কখনো বা সমবেতভাবে গাইবার ব্যবস্থা করবে। সেই সঙ্গে থাকবে নির্ব্বাচিত বাদ্য-যন্ত্র। কণ্ঠের গানে আর সুর ঝঙ্কারে যে মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হবে বরুণদেব তাতে তোমাদের দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবেন—আমাদের এই শুষ্ক ধরণী ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে।

তারপর নৃত্যের ভেতর দিয়ে মেয়েরা এলায়িত-বেণী মেঘ-রাণীকে আহ্বান জানাবে। নেপথ্য-সঙ্গীতে ও নৃত্যের তালে তালে যাতে সামঞ্জস্য বজায় থাকে অনুষ্ঠানের পরিচালককে সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে। সহর অঞ্চলে যারা 'মাইক' ব্যবহার করতে পারবে, তারা সঙ্গীত ও নৃত্যের ফাঁকে ব্যঞ্জনা করে বর্ষা-মঙ্গলের অন্তর্নিহিত তথ্য সবাইকে সহজ ভাষায় জানিয়ে দেবে।

এই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে ছেলে-মেয়েরা মিলে বর্ষা ঋতুর একটি রূপক-নাট্য অভিনয় করতে পারো। সেই নাট্যের বিভিন্ন পাত্রপাত্রী হবে—নদী, সাগর, মেঘ, বারিধারা, ফুল, ফল, ফসল, বরুণদেব, পর্ব্বত, সমতল ভূমি, ময়ূর প্রভৃতি। ভূমিকা অনুযায়ী ছেলে কিম্বা মেয়ে সেই অংশটি ফুটিয়ে তোলবার ভার গ্রহণ করবে। এখানে স্থানের অভাব; নতুবা একটি ছোট্ট রূপক-নাট্য রচনা করে আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারতাম—বর্ষা ঋতুর মূল কথাটি কী। তোমরা ভূগোল পড়েছ, কাজেই জানো কিভাবে নদী-নালা, সাগরের জল বাষ্প হয়ে মেঘ হয়। তারপর সেই মেঘ বারি বর্ষণ করলে পৃথিবী উর্ব্বরা হয়ে ওঠে। ফুল ফোটে, ফল ধরে, গাছে লতায় পাতায় শ্যামলিমার সমারোহ সুরু হয়। সমভূমি ফসলে ভরে ওঠে। পর্ব্বত ঝরণার জলে তাকে সিঞ্চন করে। আকাশে মেঘ দেখে ময়ূরী নৃত্য করতে থাকে। এই নাটককে বলে রূপক-নাট্য। এই রূপক-নাট্য তোমাদের একাধারে শিক্ষা ও আনন্দের ভাণ্ডার জোগাবে।

একটা বিষয়ের দিকে তোমরা সব সময় লক্ষ্য রাখবে। যে যে-রকম ভূমিকায় অভিনয় করবে, তাকে ঠিক সেই রকম সাজ-পোশাক পরে নিতে হবে।

'বর্ষা-মঙ্গল উৎসবে'র যে পরিকল্পনা এতক্ষণ ধরে তোমাদের সঙ্গে করলাম, আশা করি তোমরা তা ঠিক বুঝতে পেরেছ।

এসো, আমরা ঘরে ঘরে 'বর্ষা-মঙ্গল উৎসবে'র প্রবর্ত্তন করি, আর যে বাদলধারা ধরণীকে ফুলে-ফলে শোভিতা ও শস্যশ্যামলা করে তোলে তাকে কলধ্বনি-মুখরিত সঙ্গীতে, ছন্দায়িত নৃত্যে এবং মধুময় বাণীতে অভ্যর্থনা জানাই।

সাঁতারকাটা ও নৌকাবাচ

বর্ষায় ভরা নদীর রূপ দেখেছ তোমরা?

যারা পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও গঙ্গার তীরে বাস করে, তারা বুঝতে পারবে আমার মনের কথা।

বাংলাকে 'নদী-মাতৃক' দেশ বলা হয়।

এই নদীর রূপ এক এক ঋতুতে এক এক রকম হয়ে থাকে।

ভরা বর্ষার নদী চঞ্চলা মেয়ের মতোই হাস্যমুখর আর দুরন্ত হয়ে ওঠে। কেননা সে—

"হেসে খল্ খল্
গেয়ে কল্ কল্
তালে তালে দেয় তালি!"

কতকগুলি নদী আছে যাদের দুরন্তপনার অন্ত নেই। উন্মাদের মতো তারা দু'পার ভাঙতে সুরু করে...যেমন পদ্মা, মেঘনা। আবার, কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠে বর্ষার জল একটা স্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি করে। সেই রকম নদীর নাম—গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি।

ভরা নদীতে কিম্বা খালে সাঁতার কাটার মতো আনন্দদায়ক ব্যাপার খুব কমই আছে। এই জন্যে অতি প্রাচীনকাল থেকে বর্ষা ঋতুতে ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটতে এত ভালবাসে। পল্লী-অঞ্চলে নদী-খাল-বিলের ধারে যাদের বাড়ী তারা অতি ছোট অবস্থা থেকেই সাঁতার কাটার ব্যাপারে ওস্তাদ হয়ে ওঠে।

প্রথমে কলাগাছ কেটে ছোটরা ভেলা তৈরী করে—তাই ধরে ধরে সাঁতার কাটার ভারী সুবিধে। নতুন যারা সাঁতার শিখতে চায়, তারা এইভাবে বড়দের সাহায্য নিয়ে অতি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সাঁতার কাটা শিখে নেয়। কেউ কেউ আল্গা কলাগাছ নিয়েও জলে নেমে পড়ে সাঁতার শিখতে। এতে খানিকটা ভয়ের কারণ থাকে নতুন শিক্ষার্থীদের পক্ষে।

অনেকে কলসী ভাসিয়ে সাঁতার শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী। নতুন শিখিয়েদের পক্ষে এই ব্যবস্থাও বিশেষ উপযোগী বলে মনে হয়।

ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি খেলার মধ্যে যেমন প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তেমনি অতি প্রাচীনকাল থেকে সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় সব দেশেই উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় নদী-নালা বেশী বলে ছেলেমেয়েরা প্রয়োজনের তাগিদে আপনা থেকেই সাঁতার শেখে এবং যারা নদী-অঞ্চলে চলাফেরা করে, এই বিদ্যে তাদের জীবন-ধারণের পক্ষে খুবই দরকারী।

সহর-অঞ্চলে যে সব সন্তরণ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, তা অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই বাঁধা পুকুরেই (যেমন—হেদুয়া, গোলদীঘি) সম্পন্ন হয়। এখানে লাইফ বেল্টের ব্যবস্থা থাকে এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সমস্ত আয়োজন সহ চিকিৎসক উপস্থিত থাকেন। গঙ্গা এবং লেক-অঞ্চলেও সাঁতারের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু খোলা প্রকৃতির সঙ্গে তাল বজায় রেখে যদি সাঁতারের প্রতিযোগিতা দেখতে হয়, তবে আমাদের চলে যেতে হবে—সহর থেকে বহুদূরে পল্লী-অঞ্চলে। সেখানকার ছেলেমেয়েদের পক্ষে সাঁতরে নদী-নালা পার হওয়া ত' ডাল-ভাত খাওয়ার মতো। প্রকৃতির আনন্দ-দুলালের মতোই সেখানে ছেলেরা গাছের ডাল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতের জলে—তারপর নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমায়। সাঁতারের মতো সুন্দর ব্যায়াম খুব কমই আছে। এতে দেহের সমস্ত অঙ্গের পরিচালনা হয় বলে শরীর সুস্থ থাকে এবং মাংসপেশীগুলি অতি সহজভাবে গড়ে ওঠে।

কি সহরে, কি পল্লী-অঞ্চলে—এই সময়ে ছেলেমেয়েরা যদি সন্তরণ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে, তবে প্রচুর আনন্দের খোরাক খুঁজে পাবে। প্রতিযোগিতার পথ যদি দীর্ঘ হয়, তবে প্রতিযোগীদের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা করে যাবে স্বেচ্ছাসেবক-দল। তাদের সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থাই থাকা উচিত। যদি কেউ অতিরিক্ত পরিশ্রমে জলের মধ্যে হাঁপিয়ে পড়ে, তবে স্বেচ্ছাসেবকরা অতি ক্ষিপ্রগতিতে তাকে নৌকোর মধ্যে টেনে তুলবে, নইলে সময়-মতো সাহায্য না পাওয়ার দরুণ তার জীবন-সংশয় হতে পারে।

পল্লী-অঞ্চলের কোনো খালে কিম্বা নদীতে যদি সাঁতারের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, তবে উৎসাহী দর্শকে বহু আগে থেকেই দু'পার ভর্ত্তি হয়ে যায়। সে উত্তেজনা খেলার মাঠের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। সহর-অঞ্চলে প্রতিযোগীদের জন্যে আলাদা পোশাক আছে। তার নাম Swimming Costume. কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ওসবের কোনো বালাই নেই! ছেলেরা মালকোঁচা মেরে তৈরী হয়ে নেয়। আর, মেয়েরা শাড়ীতে গাছ-কোমর বেঁধে নদীতে বহু দূরবর্ত্তী স্থান অতিক্রম করতে পারে। তবে সকলকেই সাবধান করে দেওয়া উচিত শক্ত করে কাপড় বা শাড়ী পরে নিতে। নইলে মাঝপথে কাপড় বা শাড়ী খুলে গেলে সেটা পায়ে জড়িয়ে একটা বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারে।

যারা সত্যি ভালো সাঁতার কাটতে পারে, তাদের একটা কৌশল জানা আছে। প্রথমেই বিপুল বেগে হাত-পা ছুঁড়ে, জল ছিটিয়ে যারা রওনা হয়, কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই তারা হাঁপিয়ে পড়ে। সত্যিকারের কৌশলী সাঁতারু দেহটাকে একটু কোণাকোণি-ভাবে রেখে হাত দিয়ে জল কেটে অবলীলাক্রমে এগিয়ে যায়। প্রথমেই তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে না। অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করবার পর যখন অধিকাংশ প্রতিযোগী হাত-পা ছোঁড়ার ফলে পরিশ্রান্ত হয়ে যায় তখন কৌশলী সাঁতারু তার গতিবেগ বাড়িয়ে দেয় এবং নিজের দীর্ঘ দম ও কৌশলের গুণে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে। ক্রমাগত যারা হাত-পা ছোঁড়ে, তাদের নিজেদেরই নাকে-মুখে জল ঢোকে এবং ক্রমশঃ তারা অবশ ও হতাশ হয়ে পড়ে। তখন একেবারে জলের তলায় তলিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। জলের সঙ্গে যুদ্ধ করলে

কোনো কাজ হবে না। ভালো শিল্পী যেমন কাগজের ওপর কৌশলে কলম বা তুলি চালিয়ে সুন্দর ছবি এঁকে ফেলেন, তেমনি জলের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে খেলা করতে করতে দেহ বাঁচিয়ে সাঁতার কাটতে হবে। দেহ হাল্কাভাবে ভাসিয়ে না রাখতে পারলেই যত বিপদ। অভিজ্ঞ শিক্ষক এবিষয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের সচেতন করে দিতে পারেন।

আমাদের দেশের ছোটদের বহু ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান এই সময় সন্তরণ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। গত কয়েক বছর সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে "সব-পেয়েছির আসর" আজাদ হিন্দ বাগে (হেদুয়াতে) ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে সন্তরণ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। এই প্রীতিপ্রদ অনুষ্ঠানে একশতের ওপর ছেলে যোগদান করেছিল এবং সন্তরণ-সম্পর্কে বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন এবং জলে নেমে সাঁতারের বহু কলাকৌশল ছোটদের শিখিয়ে দেন। ঝাঁপ (Diving) একটি সুন্দর খেলা। সেটাও উক্ত উৎসবে প্রদর্শিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন শিক্ষামূলক চিত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। এই ছবিটি যখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছেলেদের মধ্যে দেখানো হয়, তখন সাঁতার শেখবার একটা সাড়া পড়ে যায়। আমরা জানতে পারলাম—ভারত সরকার এই-জাতীয় বহু শিক্ষামূলক চিত্রগ্রহণের পরিকল্পনা করেছেন। 'সব পেয়েছির আসর' প্রতি বছরেই সন্তরণ প্রতিযোগিতার একটা বিপুল ব্যবস্থা করবে। এই অনুষ্ঠানের দিকে ছোটদের দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ জানাই।

বর্ষাকালে আমাদের দেশে নৌকো বাচ একটি চমৎকার খেলা। বাঙলা দেশে যে কত রকম নৌকোর প্রচলন ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবীচৌধুরাণী" পড়লে সে কথা জানতে পারা যায়। সেকালে অতি দ্রুতগামী নৌকো নিয়ে ডাকাতেরা ডাকাতি করত। সেই সব নৌকোর নাম 'ছিপ'। এই ছিপ নৌকোর সাহায্যে 'বাচ' খেলা খুব জমে ওঠে।

পূর্ব্ববঙ্গে শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিনে মনসার পূজো হয়। সেই সময় বহু অঞ্চলে নৌকো বাচের প্রথা এখনও প্রচলিত আছে।

আমরা ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামে এই জাতীয় বাচ খেলা প্রাণভরে উপভোগ করেছি। শ্রাবণ মাসে নদী-খাল-বিল টুইটুম্বর জলে ভর্ত্তি থাকে। কাজেই বাচের জন্যে প্রচুর জায়গা পাওয়া যায়। আরো একটি কথা—আমাদের ছেলেবেলায় দেশ কচুরীপানায় এতটা ভর্ত্তি হয়ে যায়নি। সেইজন্যে নৌকো চলাচলের সহজ পথ সর্ব্বদাই খোলা থাকত।

এই বাচ খেলার জন্য জনসাধারণ বহুদিন থেকে তৈরী হত। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সবাই নিজ নিজ পাড়ায় নৌকা তৈরী করে বাচের মহড়া দিত, এবং পূজার দিন চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার পর তাদের পুরস্কার বিতরণ করা হত।

নৌকো বাচের প্রতিযোগিতা আবার যাতে ছোটদের মধ্যে প্রচলিত হয়, সে বিষয়ে সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

ইংলণ্ডে কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ডের ছাত্রদের মধ্যে যে নৌকোবাচের প্রথা প্রচলিত

আছে, তা দেখতে নদীর দুধারে লোক ভেঙে পড়ে । শুধু ইংলণ্ড বলে নয়,—প্রত্যেক স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়েরাই নৌকো বাচের খেলায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে থাকে।

আমাদের ভারতে নদী অফুরন্ত এবং তার জল-কল্লোল মানুষের মনকে সহজেই আকর্ষণ করে । এইজন্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ লেখা পদ্মার ওপরে বোটে বসে রচনা করেছেন । নদী আমাদের মাতৃভূমির প্রাণস্পন্দন । শহরের ইঁট-কাঠ আর জনতায় আমরা তাকে বেমালুম ভুলে বসে আছি । তবু যদি বর্ষার দু'কূল ছাপানো স্রোতের জলে আমরা ক্ষণিকের তরে সব ভুলে নৌকো ভাসিয়ে দিই—তবে বোধ করি প্রকৃতি মায়ের স্নেহময় সান্নিধ্যই অনুভব করবো ।

বন-ভোজন উৎসব

বাঙলাদেশের ছেলেমেয়ের দল, তোমাদের অনেকের সঙ্গেই ভাদ্রের ভরা গাঙের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। ভাদ্রের ভরা নদীতে চলাচলের অভ্যেস যাদের আছে, তাদের সামনে আমি এক নতুন আনন্দ-আসরের পরিকল্পনা উপস্থিত করছি। ধরো, তোমাদের পাড়ার কয়েকজন বন্ধু মিলে পরামর্শ করে স্থির করলে নৌকো-পথে একটা জায়গায় গিয়ে বন-ভোজনের আয়োজন করবে। এই যে দল বেঁধে নৌকো করে গিয়ে আনন্দ-আসরের ব্যবস্থা, এর মধ্যে চমৎকার একটি অভিযানের আমোদ আছে।

হিসেব করে দেখা গেল— তোমরা সংখ্যায় হলে পনেরো থেকে কুড়ি জন। প্রথমেই এই সংখ্যক লোক যেতে পারে এই রকম একটি নৌকোর ব্যবস্থা করে ফেললে। যদি পরিচিত কোনো লোকের নৌকো যোগাড় করতে পারো, তা হলেই সব চাইতে ভালো; কেননা নৌকো-ভাড়ার খরচটা তোমাদের বেঁচে গেল। নইলে খুঁজে-পেতে একটি ভালো নৌকো ভাড়া করে নিতেই হবে। এই যে নৌকো করে যাওয়া-আসা, তারই সঙ্গে লুকিয়ে রইল অনেকখানি নির্মল আনন্দ। যে ছেলেটি সমস্ত দায়িত্ব নেবে, তাকে একটি তালিকা প্রস্তুত করে ফেলতে হবে। প্রথমেই নামের তালিকা। মাথা পিছু ক' টাকা চাঁদা ধার্য্য করা হবে একটি ঘরোয়া বৈঠকে সেটা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেওয়াই ভালো।

চালের ব্যবস্থাটা আগে দরকার। সব চাইতে ভালো হয়, যদি প্রত্যেকে নিজের নিজের চাল বাড়ী থেকে সংগ্রহ করে আনো। তারপর ঠিক করতে হবে বন-ভোজনে কি কি রান্না হবে। সেই অনুসারে চাল-ডাল, মাছ-তরকারী, দৈ-মিষ্টি ইত্যাদি সংগ্রহ করে একজনের দায়িত্বে রেখে দেবে। রান্নার জন্যে কি কি বাসন-পত্র দরকার হবে, পরিচিত বাড়ী থেকে আগেই সে সব যোগাড় করে ফেলার দায়িত্ব নিতে হবে দু'জনকে । মা-মাসিমাদের পরামর্শ নিয়ে গুঁড়ো মশলার ব্যবস্থা করে ফেলেল কেউ। এইভাবে যখন সব কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসের সুরাহা হয়ে গেল, তখন দু'জন পাকা লোক ঠিক করতে হবে যারা

সত্যি নৌকো বাইতে পারে। কেননা মাঝ নদীতে নৌকো বানচাল হলেই মুস্কিল! অনেক সময় নৌকোর মালিক তার নিযুক্ত মাঝি সহ সব ব্যবস্থা করে দেন। তখন ছোটদের আর কোনো চিন্তাই থাকে না।

অতি প্রত্যুষে নৌকোতে সমস্ত জিনিসপত্র চাপিয়ে রওনা হলে। ভোরবেলাকার হাওয়াটা ভারী মিঠে লাগে, দেহ মনকে স্নিগ্ধ করে তোলে। কেউ কেঠ হয়ত বৈঠের তালে তালে মনের আনন্দে সমবেত সঙ্গীত সুরু করে দিলে। নদীর স্রোত, ঝিরঝিরে হাওয়া, ছোটদের গান—সব কিছু মিলে মধুময় পরিবেশের সৃষ্টি করলো, নৌকো এগিয়ে চলল—প্রয়োজন হলে তোমরা পাল তুলে দিলে। বন-ভোজনের জন্য যে জায়গাটা নির্ব্বাচন করা আছে, সেইখানে গিয়ে নৌকো পৌঁছল। নিজেদের মধ্যে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকরূপে বাসন-কোসন এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ধরাধরি করে নামিয়ে নিলে। যদি কাছে কোনো ঘর কিংবা দালান থাকে, তবে পূর্ব্ব-ব্যবস্থা-মত সেইখানেই সব সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখলে, আর একজনকে ভাণ্ডারী করে তার খবরদারীতে বসিয়ে দিলে। অবশ্য ঘন্টা দুই বাদে এই ভাণ্ডারীর বদলী লোক দেওয়া দরকার, নইলে সে বেচারী একেবারে হাঁপিয়ে উঠবে।

ইতিমধ্যে আর একদল ছায়ায় ঢাকা (গাছের ছায়া হলেই ভালো) একটি নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে উনুন খুঁড়তে সুরু করে দিয়েছে। একদল গেছে শুক্‌নো ডালপাতার সন্ধানে। অবশ্য কিছু জ্বালানি কাঠ সঙ্গে না নিলে সমূহ বিপদে পড়তে হবে। বাসনগুলো যদি ভালো করে ধোয়া থাকে ত' ভালোই; নইলে আর একবার মেজে নিতে কোনো বাধা নেই। কারণ, স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা সকলের আগে দেখতে হবে। তোমাদের সঙ্গে যদি বোনের দল থাকে ত' তরকারী কোটার আর রান্না করবার ভার তাদের ওপরে দিতে পারো।

রান্নার দিকটা যখন খানিকটা এগিয়ে গেছে, তখন দেখা গেল, একদল ছেলেমেয়ে খাতা-পেন্সিল নিয়ে এধারে-ওধারে মনোমত জায়গা বাছাই করে ছবি আঁকতে বসে গেছে। তারা সবাইকে লুকিয়ে কখন্ যে খাতা, পেন্সিল, রবার নিয়ে এসেছে কেউ জানতে পারেনি। আবার আর একদল ছেলে আশে-পাশের অধিবাসী ও কৃষকদের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে সেই অঞ্চলের খবরাখবর নিচ্ছে এবং সেখানকার চলতি গান আর গ্রাম্য ছড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিচ্ছে। কাছাকাছি যদি পুরানো মন্দির, মস্‌জিদ কিংবা জলাশয় থাকে, তবে তারও ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করতে উৎসাহী ছেলের অভাব ঘটে না। যারা সঙ্গে ক্যামেরা নিয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে চিত্তাকর্ষক স্থানের ফটো তুলে নিয়ে আসতে পারবে।

ইতিমধ্যে একবার চা, জলখাবার, গরম মুড়ি, বেগুনভাজা, পাঁপড়ভাজা ইত্যাদি দিয়ে জলযোগ পর্ব সমাধা হয়ে গেছে। কাজেই মনের আনন্দে সবাই এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে পারছে। হয়ত একটা গাছতলায় জুটে ছেলেমেয়ের দল নিজেদের মধ্যে সাহিত্য

আলোচনা করছে কিংবা নামকরা কবিদের কবিতা আবৃত্তি করছে। কে কত বেশী ভালো কবিতা মুখস্থ বলতে পারে, তারও একটা পরীক্ষা চলছে।

ওদিকে এক মজার ব্যাপার! খিচুড়ীটা প্রায় রান্না হয়ে এসেছে। আর একটু পরেই নামাতে হবে। এমন সময় ঝম্‌ঝম্‌ করে এলো বৃষ্টি। যে যেখানে পারলো ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলে। তারপর এক পশলা বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলে দেখা গেল উনুন গেছে নিভে। তখন সবাই মিলে দল্‌ বেঁধে ফুঁ দিয়ে আবার তাকে জ্বালাও। সবাইকার মুখে হাসি, চোখে জল। ধোঁয়ায় সব একাকার! এত ঝামেলার মধ্যেও যে কী মজা, যারা বন-ভোজনে যোগদান করেছে, আমার কথা তারা ঠিক বুঝতে পারবে।

হঠাৎ খবর এলো, রান্না তৈরী হয়ে গেছে, যে যার মতো জায়গা করে বসে পড়ো। কিন্তু মহাবিপদ! কলাপাতা কাটা হয়নি। ছোট্—ছোট্—ছোট্—। কাটারী নিয়ে একদল ছেলে গেল আশে-পাশের কলাগাছ থেকে কলাপাতা কেটে আনতে।

আরো মজার একটা ব্যাপার বাকি আছে। সেটা হচ্ছে নদীর জলে স্নান। সবাই তেল মেখে ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়ল নদীর জলে। যারা সাঁতার জানে না, বোকার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল—জলে নামবার সাহস নেই!

এর পর আসল বন-ভোজন উৎসব। একদল খেতে বসল, আর একদল পরিবেশন করতে লাগল। তাদের খাওয়া হয়ে গেলে আবার পরিবেশনকারীর দল খেতে বসল, অন্য দল তাদের মধ্যে খাবার ভাগ-বাটোয়ারা করে দিলে।

এর পরের ব্যাপারটা বেশ শক্ত। দল বেঁধে সবাইকে বাসন মাজতে হবে।

সব কিছু ব্যাপার চুকে গেল—নৌকো করে আবার ফিরে আসা। যারা কলকাতায় থাকো তারা নৌকো করে দক্ষিণেশ্বর কিংবা বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে এইভাবে বন-ভোজন উৎসব পালন করতে পারো। মজা তাতেও নেহাৎ কম হবে না।

কিশোর অভিনয়

শারদীয় অবকাশে তোমরা বহু জায়গায় অভিনয়ের আয়োজন করে থাকো। সহরে যারা বাস করো, তারা বিভিন্ন সমিতিতে যোগ দিয়ে, পাড়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কিংবা সার্ব্বজনীন পূজোর মণ্ডপে অভিনয়ের ব্যবস্থা করে বসো; আর যারা পল্লী-অঞ্চলে থাকো তারাও এই সময়ে দলবদ্ধ হয়ে নাটকের মহলা সুরু করে দাও। এই সময় তোমাদের অনেক বন্ধু সহর থেকে পূজো-উপলক্ষে দেশের বাড়ীতে আসে।

নাটক-নির্ব্বাচন--কিশোরদের অভিনয়ের প্রথম ব্যাপার হচ্ছে নাটক-নির্ব্বাচন। এই কাজটা সত্যি শক্ত। নির্ব্বাচনের ব্যাপারে যদি ত্রুটি কিংবা গলদ থেকে যায়, তবে সমস্ত অনুষ্ঠানটিই পণ্ড হয়ে যাবার ভয় থাকে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, ছোটরা বড়দের একটা নাটক অভিনয়ের আয়োজন করে বসে থাকে। এ কাজটি তোমরা কখনই করবে না। বড়দের নাটকের যে ভাষা এবং যে ঘটনার সমাবেশ, তা শিশুমনে কখনই দোলা দিতে পারে না। অকারণ তোতা পাখীর মতো কতকগুলো গালভারী কথা মুখস্থ করে মস্তিষ্ককে ভারী করে তোলা ছাড়া এতে আর কোন উপকারই তোমাদের হবে না। তাই সর্ব্বপ্রথম এমন নাটক বাছাই করবে,যা বিশেষ করে শিশু- সাহিত্যিকগণ কিশোরদের জন্যই রচনা করেছেন। যে নাটকে স্ত্রী-ভূমিকা নেই এমন কোনো নাটকই কিশোরেরা বাছাই করে নিলে ভালো হয়।

ভূমিকা-বণ্টন--নাটক-নির্ব্বাচনের পরই ভূমিকা-বণ্টনের ব্যাপার। এই ব্যাপার নিয়ে অনেক সময় নিজেদের মধ্যে সামান্য মনোমালিন্য থেকে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। কাজেই সবাই মিলে ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করে এই ব্যাপারটায় মীমাংসা করতে হবে। যাকে যে ভূমিকায় মানাবে এবং যে ছেলে যে ভূমিকার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তাকে সেই চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলবার ভার দিতে হবে। আবার শুধু চেহারা দেখে বাছাই করলেও চলবে না। দেখতে হবে সত্যি তার অভিনয় করবার গুণপনা আছে কিনা, কথা পরিষ্কার কিনা, সহজভাবে চলাফেরা করতে পারে কিনা। ইংরেজীতে তাকে বলে (stage freeman) অভিনেতার ইচ্ছেমত গলা চড়াবার এবং নামাবার ক্ষমতা থাকা দরকার। প্রথমে নাটকটা সকলের সামনে একবার পড়ে তারপর ভূমিকা নির্ব্বাচন করলে কাজের সুবিধে হয়। কারণ, কেউ বীররসাত্মক অভিনয় ভালো পারে, কেউ করুণারস ফুটিয়ে তুলতে ওস্তাদ, আবার কেউ কৌতুকাভিনয়ে মুন্সিয়ানা দেখাতে পারে।

মহলা—মহলা বা 'রিহার্সেল'-এর ওপর নাটকের পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করে। এই ব্যাপারে তোমরা এমন একজন বয়স্ক লোকের সাহায্য নিতে পারো, যিনি অভিনয় শিক্ষা দিতে পারেন। এই অভিনয় শিক্ষা দেবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ছিল অসীম ধৈর্য্য

ও ক্ষমতা। ছোটদের যিনি শেখাবেন, তাঁকে অল্পেই চটে গেলে চলবে না। কোথায় কার কি গলদ হচ্ছে, সেটা বুঝিয়ে, ভুল উচ্চারণ শুধরে ধীরে ধীরে ধাপে-ধাপে তাঁকে সবাইকার মন অভিনয়মুখী করে তুলতে হবে। অভিনয়কালে মঞ্চে কিভাবে দাঁড়াতে হবে, কিভাবে চলাফেরা করতে হবে, সেটা শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। প্রথমেই নিজ নিজ ভূমিকা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে হবে, ভূমিকাটি একটু তৈরী হয়ে গেলে, দেখতে হবে রাগ, দুঃখ, বেদনা, কৌতুক, কপটতা ঠিক ঠিক মুখে ফুটে উঠছে কিনা। মঞ্চের দু'পাশে দু'ব্যক্তি আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদের কথা বলে দেবেন, তাকে বলা হয় স্মারক বা 'প্রম্পটার'। এই প্রম্পটারের বলার আগে আগে কখনো অভিনেতাকে যেতে হয় না—তা হলে সমূহ বিপদে পড়বার সম্ভাবনা থাকে। মহলা দেবার সময় 'প্রবেশ' ও 'প্রস্থান' বিষয়টি বিশেষ করে বুঝে নিতে হবে। হয়ত মঞ্চের 'ডান' দিকটা হবে অন্দর মহল এবং বাঁ দিকটা হবে বাইরে যাবার রাস্তা। এই নিয়মটি আগাগোড়া সব অভিনেতাকে মেনে চলতে হবে। এক দৃশ্যে হয়ত তিন-চারজন লোক আছে ; যখন একজন কথা বলছে, সেই সময় বাকি কয়েকজনের চুপ করে থাকলে চলবে না। হাবভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে বক্তার কথা তারা শুনছে এবং সেই মত তাদের মুখে আনন্দ, ঘৃণা বা বিস্ময়ের উদ্রেক হচ্ছে। লাফানো, ছুটে পালানো কিংবা যুদ্ধ প্রভৃতিও মহলায় নিখুঁতভাবে তৈরী করে নিতে হবে। মঞ্চে যারা মরে পড়ে থাকবে, তাদেরও মহলার একান্ত প্রয়োজন আছে। 'নেপথ্যে কোলাহল' সেটিও বাদ দিলে চলবে না। যখন এইভাবে গোটা নাটকটি তৈরী হয়ে যাবে, তখন তোমরা সাজ-মহলার (ড্রেস রিহার্সেল) জন্য প্রস্তুত হবে।

রঙ্গমঞ্চ -নির্ম্মাণ— ইতিমধ্যে আর একদল ছেলে রঙ্গমঞ্চ -নির্ম্মাণের কাজে উঠে-পড়ে লেগেছে। সব চাইতে ভালো হয়, যদি তোমরা নিজেরাই পুরোনো কাপড় সংগ্রহ করে তাই সেলাই করে নিয়ে নিজেরাই দৃশ্যপট এঁকে নাও। তোমাদের দলের মধ্যে দু-একজন করে শিল্পী অবশ্য খুঁজে পাবে। তাদের সাহায্যে এই কাজটা সমাধা করে ফেলবে। তারপর বাঁশ ও দড়ির সাহায্যে উৎসাহীরা মঞ্চ খাঁটিয়ে ফেলবে। অনেক সময় বড় দালানের বারান্দায় কিংবা প্রকাণ্ড হলেও তোমরা সুযোগমত মঞ্চ তৈরী করতে পারো।

পোশাক-পরিচ্ছদ— তোমাদের নাটক যদি সামাজিক হয়, তবে পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য খুব বেশী বেগ পেতে হবে না। নিজের নিজের জামা, কাপড়, জুতো ইত্যাদি দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু নাটক যদি পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক হয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত সাজ-পোশাক সংগ্রহ কিংবা ভাড়া করে নিতে হবে। ভাড়া-করা পোশাক যদি তোমরা ব্যবহার করতে না চাও (না করা

ভালো), তবে পুরোনো কাপড় নানা রঙে ছুপিয়ে তাই দিয়ে বিভিন্ন জাতীয় পোশাক তৈরী করতে পারো এবং রূপোলী সোনালী ফিতে, রাংতা ইত্যাদি লাগিয়ে তাকে মনোমত ঝক্‌ঝকে করে তুলতে বেশী বেগ পেতে হবে না। মুকুট, তলোয়ার ইত্যাদি ইচ্ছে করলেই তোমরা হাতে তৈরী করে নিতে পারো, তাতে কারুশিল্পও খানিকটা শেখা হবে। কোরোসিন কাঠের বাক্স দিয়ে সিংহাসন তৈরী করে তাতে নানারকম রঙীন কাগজ লাগিয়ে দিলে চমৎকার হবে। শহরে যারা থাকো এই সিংহাসনে তারা ছোট ছোট বিজলী 'বাতি' জ্বালিয়ে বড়দেরও তাক লাগিয়ে দিতে পারো।

অভিনয়ের টুকিটাকি—অভিনয় করতে গেলে বিভিন্ন দৃশ্যে নানারকম ছোটখাটো জিনিসের দরকার হয়। যেমন ধর, প্রথম দৃশ্যে মাটির প্রদীপ, ষষ্ঠ দৃশ্যে দু'খানি বই, কিংবা শেষ দৃশ্যে খাঁড়া ইত্যাদি। এগুলোকে ইংরেজীতে বলে 'পিস্‌গুড্‌স'। দৃশ্য ধরে ধরে এইসব ছোটখাটো জিনিস আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখতে হবে। এইগুলো সময়মত না পেলে দর্শকদল হেসে উঠবে। ধরো, এক জায়গায় রাজা বলছেন··· "লও এই ছুরিকা ভীষণ।" কিন্তু রাজার হাতে ছুরি নেই! তখন দর্শকদল কি করবে, অতি সহজেই তোমরা অনুমান করতে পারো। এই ছোটখাটো জিনিসের ভার একজনকে নিতে হবে এবং বিভিন্ন দৃশ্যে অভিনেতাদের হাতের কাছে জুগিয়ে দিতে হবে।

সাজ-মহলা—ইংরেজীতে যাকে বলে 'ড্রেস রিহার্সেল, তাই হচ্ছে সাজ-মহলা। নাটক যখন সম্পূর্ণরূপে তৈরী হয়ে যাবে, তখন পাড়ার কয়েকজন নাট্যামোদী ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একেবারে সাজ-পোশাক পরে মহলা দিয়ে তাঁদের দেখাবে এবং কোথায় গলদ আছে পরামর্শ নিয়ে সেগুলো সবাই শুধরে নেবে। সেজন্য সাজ-মহলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সাজ-মহলার সময় 'মেক্‌-আপ'-এর দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে; বুড়োকে শুধু সাদা চুল-দাড়ি পরিয়ে দিলেই ত' চলবে না—তার মুখের কোঁচকানো, কপালের দাগ, ভ্রূর পাকা চুল ঠিকমত হয়েছে কিনা সেগুলোও যথাযথ তৈরী করে নিতে হবে। তোমাদের মধ্যে যারা শিল্পী থাকবে, তারা চাইনিজ ইঙ্ক, ক্রেপ হেয়ার, স্পিরিট গাম এবং নানারকম রঙের সাহায্যে এই কাজে বিশেষ কলা-কৌশল দেখিয়ে খ্যাতি অর্জ্জন করতে পারো।

সাজ-ঘর—এইজন্যে বিশেষ করে প্রত্যেক অভিনয়ের ব্যাপারেই একটি করে 'সাজ-ঘর' থাকার প্রয়োজন। নারদের দাড়ি, বাদশার টুপি, প্রতাপসিংহের তরোয়াল, বৃদ্ধের পাকা চুল, বৈষ্ণবের নামাবলী, হত্যাকারীর হাতের জন্যে আলতা—সব কিছু সেখানে মজুত থাকবে। এই সাজ-ঘরের দায়িত্ব বড় কমখানি নয়। চট্‌পটে ছেলেরা যখন যেটা দরকার ঠিক সময়ে জুগিয়ে দেবে, নইলে নাটক জমবে কি করে? পুরোহিত আরতি করছেন, কিন্তু দেখা গেল ঘণ্টা নেই! অথবা শত্রু পুরী আক্রমণ করছে, নেপথ্যে

পটকা ছুঁড়তে হবে—সময়মত সেটা খুঁজেই পাওয়া গেল না! অভিনয় করতে গিয়ে এই জাতীয় ঘটনা হামেশা ঘটে থাকে। কিন্তু আগে থেকে ব্যবস্থা থাকলে তোমাদের কিছুতেই অপ্রস্তুতে পড়তে হবে না।

কিশোরীদের অভিনয়—কিশোরীরা যখন অভিনয় করবে, তখন ওপরকার সব নিয়মই মেনে চলবে; তবে তাদের নাটক নৃত্য-গীতি-মুখর হলেই ভালো হয়। প্রথমে সেই জাতীয় নাটকই তোমরা বাছাই করে নেবে। সাজ-পোশাক তোমাদের জাঁক-জমকপূর্ণ হলেই অভিনয়টা জমবে ভালো এবং সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করতে পারবে। তোমরা ঝুটো মুক্তো, রাংতা, শোলা ইত্যাদি দিয়ে নানারকম অলঙ্কার নিজেরাই তৈরী করতে পারো, তাতে জিনিসগুলো বাজার-চলতি গয়নার চাইতে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পৌরাণিক নাটক প্রভৃতিতে এই জাতীয় অলঙ্কার এবং তোমাদের বেনারসী ও অন্যান্য রঙীন সাড়ি বিশেষ কাজে আসবে। নাচের জন্যে একজন ভালো ও বিশ্বাসী নৃত্য-শিক্ষকের প্রয়োজন। অনেক সময় তোমাদের দিদিরাও উৎসাহী হয়ে সব কিছু শিখিয়ে দিতে পারেন।

একান্ত প্রয়োজন—একটি নাটক অভিনয় করতে গেলে একজন মঞ্চাধ্যক্ষ, দু'জন স্মারক, সাজ-পোশাক পরাবার লোক, সাজ-ঘরের মানুষ, নেপথ্য-বিধানের ব্যক্তি, নেপথ্য-সঙ্গীতের জন্য ঐক্যতান-বাদক দল, দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের কর্ম্মী প্রভৃতির একান্তভাবে প্রয়োজন। দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের সময় স্মারকের হাতে বাঁশী রাখতে হবে। সমস্ত ভুলচুক শুধরে নিয়ে যদি অভিনয় করতে পারো ত' দেখবে উচ্চ-প্রশংসার সঙ্গে তোমরা অনেকেই স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক লাভ করে সগর্ব্বে বাড়ী ফিরে যেতে পারবে।

সহবৎ শেখো

যদি কোনো অতিথি বাড়ীতে এসে হাজির হন— তা হলে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝে নেন যে, বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সহবৎ কেমন?

সহবৎ মানে কি?— আদব-কায়দা আর আচার-ব্যবহার। ভাত উনুনে চাপিয়ে দিয়ে বাড়ীর গিন্নীরা যেমন ওপরের একটি ভাত টিপেই বুঝতে পারেন,—হাঁড়ির চাল সুসিদ্ধ হয়েছে কিনা, তেমনি কোনো অভ্যাগত কারো বাড়ীতে বেড়াতে এসে ছোটদের সঙ্গে আলাপ করেই বুঝতে পারেন— এরা সত্যিকারের সহবৎ শিখেছে কিনা!

এই সহবৎই বাড়ীর মর্য্যাদাকে বাড়িয়ে দেয়।

আগে পল্লী-অঞ্চলে বাড়ী হিসেবে একটা খ্যাতি বা অখ্যাতি লোকের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ত।

চৌধুরী বাড়ীর ছেলে, ওরা ত' সহবৎ শিখবেই। অথবা—মোক্তার বাড়ীর কথা বলছ ? ওরা অমানুষ হবে না ত' হবে কে ? এইভাবে লোকের মুখে মুখে এক-একটা গৃহের সুনাম বা দুর্নাম রটে যেত। আর সেই সুনামকে সম্মান করত বা দুর্নামকে ভয় করত না, এমন মানুষ পাড়াগাঁয়ে খুঁজে পাওয়া যেত না।

আমরাই ছেলেবেলায় দেখেছি— পল্লী-অঞ্চলে গৃহে কোনো অতিথি এলে গৃহস্বামী স্বয়ং বাড়ীর সব ছেলেমেয়েকে ডেকে পাঠাতেন। তারপর সেই সম্মানিত অতিথির কাছে ছোটদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে আগন্তুককে প্রণাম করতে বলতেন।

এইভাবে অতি ছেলেবেলা থেকেই তারা সহবৎ শিখতো এবং দশজনের স্নেহ-প্রীতিতেও ভাগ বসাতে পারত।

লোকে বলত—অমুকের সংসার যেন ফোটা ফুলের বাগান। ঘর একেবারে আলো করে আছে।

অতিথিকে প্রণাম করবার সময়ও একটা নিয়ম মেনে চলতে হত। তাঁকে প্রণাম করে কাছে যদি ঠাকুর্দ্দা, বাবা কিংবা কাকারা দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে সেই সব প্রণম্যদেরও পায়ের ধূলি নিতে হবে। একেই বলে সহবৎ।

ছোটরা দুষ্টুমী করবে, কোলাহল করবে, হৈ-হুল্লোড় করবে—এটা ত'খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বাইরের লোক কেউ এলে তারা যাতে ভদ্রতায় খাটো না হয়, সে বিষয়ে বড়রাই ছোটদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন।

অনেক বাড়ীতে দেখা যায়, কোনো অতিথিকে খাবার খেতে দিলে বাড়ীশুদ্ধ ছেলেমেয়ে—তাঁর চারিদিকে এসে ভীড় করে দাঁড়াবে এবং ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতে থাকবে।

তিনি যদি কারো হাতে খাবার তুলে দেন, তবে ত' কথাই নেই। সবাই গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। তখন বাধ্য হয়ে সব খাবারই ছোটদের হাতে তুলে দিতে হবে।

কোনো বাড়ীর ছেলেমেয়েরা এই শিক্ষাটা যেন কোনোমতে না পায়। অপরের খাওয়ার সময় ছোটদের না থাকাই ভালো। তবু যদি কেউ উপস্থিত থাকে, তবে যেন সে খাবার-সম্পর্কে অতি উৎসুক না হয়ে ওঠে। সুগৃহিণী বাড়ীর ছেলেমেয়েদের এই শিক্ষাই দেবেন।

অনেক বাড়ীতে এও দেখা যায় যে, অচেনা কেউ এলে বাড়ীর একটা ছেলে মুখ ভেংচে পালিয়ে গেল। এই ব্যাপার ঘটেলে সেই অভ্যাগত বাড়ীটি সম্পর্কে নিশ্চয়ই ভালো ধারণা পোষণ করবেন না। বয়স্কদের এই ব্যাপারে সম্যক্ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

এই সম্পর্কে একটি কথা আমি বলতে চাই যে, ছোটদের অতিরিক্ত শাসন করলে আবার কিছু হবে না। ওদের সঙ্গে মিশে—খেলাধূলা আর গল্পের অবসরে সব কিছু শিখিয়ে দিতে হবে। তাহলেই ওরা ভালো জিনিসটি শিখে নিতে পারবে। একটা চল্‌তি কথা আছে যে, রাজহাঁস নীর পরিত্যাগ করে ক্ষীর গ্রহণ করতে পারে। অভিভাবকবৃন্দ ও মায়েদের সস্নেহ দৃষ্টি থাক্‌লে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও মন্দটা ত্যাগ করে ভালোটা অতি সহজেই গ্রহণ করতে পারবে।

সহজভাবে আর সহজ পথে যদি সহবৎ শেখানো যায়, তবে সেইটেই ছেলেদের মনে থাকে। গালাগাল দিয়ে, মেরে-ধরে কিংবা জোর করে ছোটদের ঘাড়ে কিছু চাপিয়ে দিতে গেলে প্রায় ক্ষেত্রেই উল্টো ফল ফলে।

কোনো ছেলে তার মাথার চুলকে সব সময় আগোছাল করে রাখে, কোনো মেয়ে সব সময় নিজের জামা কামড়ায়। তার ফলে সব জামাই ছিঁড়ে ফেলে। এই বদ অভ্যাসগুলি মায়েরাই আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে দেবেন।

অতিরিক্ত সৌখীনতা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা যে এক জিনিস নয়—ছোটদের খুব ছেলেবেলা থেকেই—হাসি-খুশী-গল্পের ভেতর দিয়ে তাদের মজ্জাগত অভ্যাস করিয়ে দিতে হবে।

প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠেই যাতে বাড়ীর প্রতিটি ছেলেমেয়ে দাঁত মাজে আর মুখ-চোখ ধোয়, সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। একবার অভ্যাসটা ধরিয়ে দিতে পারলে সারাজীবন আর কোনো কষ্টই হবে না।

অতিরিক্ত বড় বড় নখ রাখা আবার কোনো কোনো ছেলেমেয়ের মধ্যে দেখা যায়। এই কু-অভ্যাসটি সযত্নে পরিহার করতে হবে। এই নখের ভেতর যত রাজ্যের সব ময়লা গিয়ে জড় হয় আর খাবার সময় সকলের অজান্তে সেগুলি পেটের ভেতর চলে যায়।

কোনো কোনো ছেলেমেয়েকে দেখা যায় বাড়ীর চৌকাঠের সামনে পা মেলে বসে

থাকে আর প্রত্যেকের যাতায়াতের অসুবিধে সৃষ্টি করে। এই অভ্যাসটি যে ভালো না—তা' অতি ছেলেবেলা থেকেই বুঝিয়ে দিতে হবে।

অন্য বাড়ীর ছেলেমেয়েরা নিজের বাড়ীতে এলে—গৃহস্বামীর পুত্রকন্যারা কি রকম ব্যবহার করবে—এটা খুব যত্নের সঙ্গে সুগৃহিণীকে শিখিয়ে দিতে হবে ।

লক্ষ্য করে দেখেছি কোনো বাড়ীর ছেলেমেয়ে অপর বাড়ীর ছোটরা এলে তাদের সঙ্গে ভাব জমাতে খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠে। নিজেদের খেলাঘরে টেনে নিয়ে যায়, ছবির বই দেখায়,— ছোটদের জমানো সম্পত্তি উজাড় করে সাম্‌নে ঢেলে দেয়, অথবা তাদের নিয়ে লুডো খেলতে বসে যায়। মোট কথা, আগন্তুক ছেলেমেয়েদের আপনার করে নেবার জন্যে তাদের আগ্রহের সীমা থাকে না। এ বিষয়ে তাদের ঐকান্তিকতা স্পষ্ট চোখে পড়ে।

অপরপক্ষে এমন বাড়ীও আছে—যেখানের ছেলেমেয়েরা অপর বাড়ীর আগন্তুক ছোটদের সহ্য করতে পারে না। তারা এলেই বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মুখ গোমড়া হয়ে ওঠে ! এগিয়ে এসে কথা বলা ত'দূরের কথা—নিজেরাই কুনো হয়ে থাকে। অনেক বাড়ীর ছেলেমেয়ে মনে করে—আগন্তুক ছেলেমেয়েরা তাদের সব আদর আর পাওনা কেড়ে নিতে এসেছে। তাই একেবারে প্রথম থেকেই তারা হিংসুটে হয়ে ওঠে। এমন কি, এরা বড়দের লুকিয়ে আগন্তুক ছেলেমেয়েদের সুযোগ-সুবিধে মতো চুল ধরে টানে, চিম্‌টি কাটে, আর নানাভাবে বিব্রত করে তোলে।

কোনো বাড়ীতে গিয়ে যদি বোঝা যায়—ছেলেমেয়েরা ধীর, বিনয়ী, শিক্ষিত এবং বড়দের বাধ্য, তা হলে কেমন ভালো লাগে বলো দেখি? মনে হয়, সব বাড়ীরই যদি এমন পরিবেশ হত, তা হলে আমাদের সংসার নন্দন-কাননে পরিণত হতে পারত।

ছেলেমেয়েদের ছোটখাটো প্রশ্ন করলে জানা যায়, তারা বাড়ী থেকে কি রকম শিক্ষা পেয়েছে।

হয়ত কোনো ভদ্রলোক, এক বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন। উদ্দেশ্য—বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি সদর দরজায় একটি ছোট ছেলেকে দেখে প্রশ্ন করলেন, খোকা, তোমার বাবা বাড়ী আছেন?

খোকা হয়ত আপন মনে পেয়ারা চিবুচ্ছিল। একবার আড়চোখে সে ভদ্রালোককে দেখে নিলে, তারপর মুখ ভেংচে উত্তর দিলে,—আছে কিনা তার আমি কি জানি? এখানে 'আছে কিনা' কথাটাও লক্ষ্য করতে হবে। নিজের বাবাকে পর্য্যন্ত সে সম্মান করতে শেখেনি। বাইরের লোকের সঙ্গে সে কি করে ভদ্র ব্যবহার করবে?

এই ভদ্রলোকই আর একটি বাড়ীতে আর কারো সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সেখানে ছোট্ট একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। তিনি একই প্রশ্ন করলেন। মেয়েটি হয়ত

আপনমনে খেলা করছিল। প্রশ্ন শুনেই সে উঠে এলো। আগন্তুক কার সঙ্গে দেখা করতে চান—তার নামটা জানতে চাইল। বললে, —"ও! উনি ত' আমার কাকা। আচ্ছা, আপনি বসবার ঘরে আসুন।" মেয়েটি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বস্‌বার ঘরে গেল। চেয়ার এগিয়ে দিল বসতে, একটি খবরের কাগজ হাতে তুলে দিল পড়তে, তারপর হয়ত ফ্যানটা খুলে দিয়ে বলেল,—"আপনি কাগজটা পড়ুন, আমি কাকাবাবুকে খবর দিচ্ছি।" এই বলে সে ভেতরে চলে গেল।

আগন্তুক ব্যক্তি মেয়েটির ভদ্র ব্যবহার ও সহবৎ দেখে নিশ্চয়ই মনে মনে তার প্রশংসা করবেন, এবং আগের বাড়ীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করবেন।

শুধু ভদ্রলোক বলে কোনো কথা নেই, বাড়ীতে ভিক্ষুক আসছে, অনাথ-আতুর-প্রার্থী আসছে, গরীব আত্মীয় আসছে, গয়লা, মুদী, ফেরিওয়ালা, ধোপা, নাপিত আসছে··· এদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছোটদের ব্যবহার কেমন, সেটা একটু লক্ষ্য রাখলেই জানতে পারা যাবে, সেই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা প্রকৃত শিক্ষালাভ করেছে কিনা।

আমাদের বাঙালী সংসারের অনেক বাড়ীতেই অনাথ আত্মীয়া আশ্রয় লাভ করে থাকে। কেউ তাদের সুনজরে দেখে না। বাড়ীর কর্ত্তা থেকে সুরু করে ঝি-চাকর পর্যন্ত সবাই তাকে গলগ্রহ বলে মনে করে। ছোটরাও এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে এবং বড়দের মতো একই রকম ব্যবহার করতে শেখে। অনেক বয়স্ক ব্যক্তির ধারণা ছোটরা এসব কিছু বোঝে না! কিন্তু ছোটরা সব দেখে, সব বোঝে। তাদের ধারণা ও অনুভূতি খুব তীক্ষ্ণ। এইজন্য খারাপ উদাহরণ তাদের চোখের সামনে কখনো তুলে ধরতে নেই!

এ সম্পর্কে একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে। কোনো বাড়ীর কর্ত্তা খুব অথর্ব্ব হয়ে পড়েছেন। কর্মক্ষমতা নেই, তাই শুয়ে শুয়েই তাঁর দিন কাটে। তাঁর একমাত্র ছেলে এখন উপার্জ্জন করে। তাই খাওয়া-পরার ব্যাপারে বৃদ্ধ পিতাকে পুত্রের ওপরই নির্ভর করতে হয়। এজন্যে ছেলে আর ছেলের বৌ খুব অসন্তুষ্ট। বুড়ো এখনও মরে না কেন—উঠতে বসতে এই তাদের অভিযোগ। বুড়ো কর্ত্তার জন্যে একটি ভাঙা কলাই করা থালা আলাদা করে রাখা হয়েছে। চাকর গিয়ে তাতেই অনাদরে অন্ন ঢেলে দিয়ে আসে। বাড়ীর একমাত্র নাতি—মা-বাপের এই কাণ্ড দেখে। কিন্তু ব্যাপারটা তার আদপেই ভালো লাগে না। কারণ, ঠাকুর্দ্দাকে সে সত্যি ভালোবাসে আর তাঁর কাছে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় নানারকম গল্প শোনে।

একদিন নাতির মা কথায় কথায় তার স্বামীকে বললে,—"দেখ, বুড়ো কর্ত্তার কলাই-করা থালাটি আরো ভেঙে গেছে।"

ছেলেটির বাবা বললে,—"ওতেই চালিয়ে নাও!"

তখন নাতি বাপ-মাকে বললে—"না··· না, থালা ফেলে দিও না তোমরা। আমার বাবা যখন বুড়ো হবে, তখন ত' আবার এই ভাঙা থালাতেই তাকে ভাত দিতে হবে।"

ছেলের এই একটি কথাতেই বাপ-মায়ের চেতনা হল। তখন থেকে তারা আবার বুড়ো কর্ত্তার সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে দিলে।

এই একই কারণে ছেলেমেয়েদের সামনে চাকরবাকরদের কখনো অভদ্রভাবে গালাগালি দিতে নেই। ওরা নিজেদের অজান্তেই সেই সময় গালাগালি শিখে নেয়।

কবে কখন কার কাছে শোনে,—'জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো' 'বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা' অথবা 'এক লাথি মারবো—'

ছোটরা এইসব গালাগালি তখন শুনে মগজের ভাঁড়ারে তুলে রেখে দিলে। তারপর একদিন সেই সব মুখরোচক গালাগালি এমন জায়গায় প্রয়োগ করল যে বাপ-মা শুনে একেবারে থ!

লোকে অনুযোগ করলে, কেমন শিক্ষা মা-বাপের, ছেলেরা এই জাতীয় গালাগাল শেখে?

কাজেই এই সব ব্যাপারে সব সময় খুব সাবধানে থাকতে হয়। নিজেরা মুখ আলগা করলে পরে বিশেষ বিপদে পড়ার সম্ভাবনা।

ছোটদের সহবৎ শেখাতে গেলে—বড়দের আগে সকল রকম সহবৎ শিখে নিতে হবে। মানে—'আপনি আচরি ধর্ম—অপরে শেখায়।'

খুব ছোটদের ছড়া

ছড়া জিনিসটি ছোট ছেলেমেয়েদের একেবারে ঘরের বস্তু।

ঠাকুমা-দিদিমা আর মা-মাসি-পিশির মুখে ছড়া শুনে ছোট ছেলে-মেয়েরা কত আনন্দ পায়। জীবনে এই প্রথম তাদের মনে মিল আর ছন্দের দোলা লাগে। ওরা ছড়া শুনে ঘুমিয়ে পড়ে, ছড়া শুনে জাগে।

বড় ভাই-বোনেরা যখন অভিনয় করে, গান গায়, আবৃত্তি করে, নাচে—তখন ছোটদেরও মনে ভারী ইচ্ছে জাগে যে, ওরাও দশ জনের সামনে হাত-পা নেড়ে কিছু বলুক। সবাই ওদের গুণপনা দেখে প্রশংসা করুক। তাই ছোটদের আনন্দ দেবার জন্য ছড়ার প্রয়োজন খুব বেশী।

আমাদের দেশে লোকের মুখে-মুখে কত ছড়া ছড়িয়ে আছে। কে সেই ছড়া রচনা করেছে, কেউ জানে না,— কিন্তু ছেলেমেয়েদের মুখে-মুখে সেই সব ছড়া অবলীলাক্রমে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বিনা ভাড়ায় চলে যায়। সেই সঙ্গে উচ্চারণ-ভঙ্গী আর কথারও কিছু পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু আসল রস তাতে নষ্ট হয় না।

আমরা ছেলেবেলায় কত ছড়া মুখস্থ করেছি, তার কিছু হারিয়ে গেছে। একটা ছড়া বেশ মনে পড়ে—

'ধন—ধন—ধন—ধন!
বাড়ীতে ফুলেরই বন!
এ ধন যার ঘরে নাই—তার কিসের জীবন?
তারা কিসের গরব করে?
তারা আগুনে পুড়ে কেন না মরে?'

ছেলেবেলায় যখন আকাশে কালো মেঘ জমে উঠত—অথচ খেলা তখনো শেষ হয়নি, —তখন বৃষ্টিকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে আমরা সুর করে বলতাম—

কচু পাতায় করম্‌চা
ওই মেঘটা উড়ে যা।।

বৃষ্টিকে ডেকে আন্‌বার ছড়ারও অভাব ছিল না। একসঙ্গে চীৎকার করে বলতাম—

আয় বৃষ্টি ঝেপে—
ধান দেবো মেপে!
ধানের ভেতর পোকা—
বৃষ্টি বড় বোকা।।

তারপর,

ইক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি-চাম-চিক্‌ড়ি—
চামে পোকা মজুমদার ধেয়ে এলো দামোদর—

এই ছড়াটা ত' ছেলেমেয়েরা খুব সুর করে বলত!

আমরা আরো একটি ছড়া ছেলেবেলায় দল বেঁধে মাথা দুলিয়ে বলতাম—

আগাডুম—বাগাডুম—ঘোড়াডুম—সাজে
ঢাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝর বাজে।

বাজ্‌তে বাজ্‌তে চললো ডুলি
ডুলি গেল সেই কমলা পুলি— ।

কমলা পুলির টিয়েটা
সূর্য্যি মামার বিয়েটা।

আয় লবঙ্গ হাটে যাই—
পান-গুয়াটা কিনে খাই!

একটি পান ফোঁপ্‌রা
মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া—

হলুদ বনে কলুদ ফুল
তারার নামে টগর ফুল।।

বহুকাল আমরা এই ছড়াটি বলেছি, কিন্তু কলুদ ফুলটা যে কী—তা আজও জানতে পারিনি।

ছড়ার মানে থাকুক আর নাই থাকুক—ওর অদ্ভুত-অদ্ভুত শব্দ আর মজাদার ছন্দ শিশুমনকে পক্ষিরাজ ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে অসীম আনন্দের পথে যাত্রা করে!

কাজেই খুব ছোটদের আনন্দ দিতে হলে ছড়ার একান্ত প্রয়োজন।

জাপানীরা যখন কল্‌কাতায় বোমা ফেলেছিল—সেই সময় ছোটদের মুখে একটি ছড়া এপাড়া থেকে ওপাড়া—এমনি ভাবে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ছড়াটি হচ্ছে এই—

সা—রে—গা—মা—পা—ধা—নি
বোম্‌ ফেলেছে জাপানী!
বোমের ভেতর কেউটে সাপ—
বৃটিশ বলে বাপ্‌রে বাপ!

এই ছড়াটি কে রচনা করেছিল তা অবশ্য জানা যায় নি, কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা আর সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

খুব ছোটদের দিয়ে যদি তাদের জন্মদিনে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে, পুরস্কার বিতরণী সভায়, সরস্বতী পূজোয়, বসন্ত উৎসবে, বর্ষা মঙ্গলে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিদায় অভিনন্দন সভায় ছড়া আবৃত্তি করানো যায় তবে খুব সহজেই অনুষ্ঠান জমে ওঠে।

ছোটদের কচিমুখে আধো-আধো ভাষায় ছড়া যে শুন্‌বে—সে-ই প্রচুর আনন্দ পাবে। এই আনন্দের কোনো তুলনা নেই।

যারা ছড়া বল্‌বে—তারা খুশীতে ঝল্‌মল্‌ করবে, আর যারা সেই ছড়া শুন্‌বে—তারা অক্ষয়-আনন্দের পশরা নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে।

খুব ছোটদের আবৃত্তির জন্যে আমি কিছু ছড়া রচনা করে তাদের উপহার দিলাম।

আশা করি, তাদের মুখে ছড়াগুলি লজেন্স, চকলেট, টফি অথবা দেশী খেজুরের গুড়ের পাটালীর মতো মুখরোচক হয়ে উঠবে।

ব্যাং— ব্যাং— ব্যাং

ব্যাং— ব্যাং— ব্যাং—
তোর লম্বা যে চার ঠ্যাং !

বৃষ্টি হলে গর্ত্ত থেকে—
ডাকিস্‌ গ্যাঙোর গ্যাং!

এক্‌লা যদি পাইরে তোরে
মারবো কসে ল্যাং!

তোর বিয়েতে ফড়িং বাজায়
ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং।

নেমন্তন্ন খেতে এসে—
গোসাপ হারায় ঠ্যাং!
ব্যাং— ব্যাং— ব্যাং !

ওরে বাবা— সাপ্— সাপ্

ওরে বাবা!—
সাপ্! সাপ্!
করিস নে
দুপ্ দাপ্ !
সাত ফুট্
মার লাফ—
বুকে-পিঠে
লাগে হাঁফ্।
মাথায়
বিষম তাপ !
দুই পায়ে
লাগে কাঁপ।
বোমা ফেলে
দুটো জাপ— !
রেগে গিয়ে
দেবো শাপ!
বলবে রে,
বাপ্ বাপ্ !
পালাবে রে
সব সাপ্।

জল ঝরে ঝম্-ঝম্

জল ঝরে
ঝম্ ঝম্ !
পথে জমে
কর্দম!
কালো রাত
থম্ থম্!
বাজ হাঁকে
হর দম্!

সাধু বলে
বম্ বম্!
গা যে করে
ছম্ ছম্!
কি রেঁধেছে ?
আলুদম্?
খাও ভাই
কম কম ?

গাঁজাতে কে
দেয় দম্
ধোঁয়া ওড়ে
নয় কম!
তাল পড়ে
ধম্ ধম্—
গানে-সুরে
এই সম্।

ও কি রে একা নড়ে?

ও কি রে একা নড়ে?
না রে কে গাছে চড়ে— ।

বুঝি সে পড়ে পড়ে
প্রাণটা নাহি ধড়ে!

একা কে শুয়ে ঘরে?
তড়াসে কাঁপে ডরে!

ঘাড়ে কে উঠে পড়ে?
হু-লো-টা··· হরে হরে!

ভয়েতে বুঝি মরে!
তাইত চালে চড়ে!

চাল কি নাহি ঘরে?
কিনে নে কমই দরে !

ছেলেরা নায়ে চড়ে—
ঘাটেতে এলো ওরে !

ভূলোটা নাহি সরে—
টেনে নে দড়ি ধরে-- !

আকাশে ও কি ওড়ে?
বাতাসে সে কি ঘোরে!

কে বুঝি গাছে চড়ে—?
তবে কি একা নড়ে ?

আমাদের সব

আমাদের টিয়া···
তাহারে নাচাই আমি রোজ শিস্ দিয়া!

মোদের বেড়াল—
দিন রাত মারে শুধু ইঁদুরের পাল!

মোদের কুকুর—
ভোক্-ভোক্ করে সে যে সকাল-দুপুর !

আমাদের গাই—
দশ সের দুধ দেয় ভাবনা ত নাই !

আমাদের হাঁস—
পুকুরে সাঁতার কাটে তোরা দেখে যাস্।

মোদের হরিণ—
আমাদের বাগানেই চরে রাত-দিন

মোদের ছাগল—
কাঁঠালের পাতা খায়, খায় তৃণদল!

মোদের চাকর—
দিন-রাত কাজ করে, নাই ভয়-ডর—।

আমাদের ঝি—
পুজোর দিনেতে তারে পার্ব্বণী দি!

আমাদের সব—
তাই নিয়ে সারা বাড়ী যত কলরব।।

খুব হয়েছে রাগ!

বড্ড আমি চটে গেছি—
খুব হয়েছে রাগ!
তোমরা সবাই
সামনে থেকে ভাগ!

ফেলবো যত বাসন হাঁড়ি—
ঠাকুরদাদার ছিঁড়বো দাড়ি—
গুলতি দিয়ে ভাঙতে মাথা
করবো রে ঠিক তাক।
খুব হয়েছে রাগ
সামনে থেকে ভাগ।

খেলনা যত ফেলবো ছুঁড়ে—
না হয় আমি ছুটবো দূরে—
আমার মতো দেখতে ভালো ?
খুব যে তোদের জাঁক— !
খুব হয়েছে রাগ
সামনে থেকে ভাগ।

ন্যাংড়া আম আর রাবড়ী-মালাই…
যদি থালায় ভর্ত্তিরে পাই
তবেই আমি শান্ত হয়ে—

রাগকে মানাই বাগ!
নইলে সবাই ভাগ
বড্ড আমার রাগ!

ঝিক্-মিক্ ঝিক্ !

আকাশে যে কোটি তারা
ঝিক্-মিক্-ঝিক্ !
এই ওঠে এই নেভ
আলো দেয় ঠিক।
কত দূরে দেখা যায়—
মিটি মিটি চোখে চায়-
সারা রাত জেগে রয়—
চায় অনিমিখ্!
ঝিক্-মিক্ ঝিক্।

মোরা যবে ঘরে ঘরে
থাকি ঘুমিয়ে—
তারাদল শিশুদের
যায় চুমিয়ে— !
সব ঘর চেনে ভাই—
সব দিকে চলে তাই —
তারাদল পথ ভুলে
হারায় না দিক !
ঝিক্-মিক্ ঝিক্!

কালো মেঘ যবে ছায়
সারাটা গগন—
বাজ শুনে মোরা কান চাপি প্রাণপণ—
তখনো যে তারা-দল
আকাশেতে ঝলমল
পিদিম জ্বালায়ে ওরা
দেখে চারিদিকে!
ঝিক্-মিক্ ঝিক!

বলাই শুধু খায়!

সকাল থেকে সারাটা দিন বলাই শুধু খায়—
দুই হাতে সব মুখে চালায়—আরো কেবল চায়।

ছোলা ভিজে আদা নুন
বলে তার কত গুণ!

শশা আর মুড়িতে
ঢালে শুধু ভুঁড়িতে

কাঁচা আম, লঙ্কা
নাই মনে শঙ্কা !

বীচি কলা পান্তো—
থালা ভরা আনতো!

ডিম-ভাজা আস্তো
খেলে প্রাণ বাঁচতো।

ঘৃত ভাতে তপ্ত—
করে নেবে রপ্ত!

দেখিলেই ঘুগ্‌নী
মুখে জাগে বুক্‌নি!

বুড়ী মাথে পাকা চুল
চেয়ে থাকে জুল্ জুল্!

সাঁঝের বেলা গণ্ডা দশেক ছাতুর রুটি নিয়ে!
মোহন ভোগের সঙ্গে চালায়— ঘরে কপাট দিয়ে!

মুখ খালি রয় না!
কথা তাই কয় না!

ঘড়ি চলে টিক্ ! টিক্!

ঘড়ি চলে টিক্ ! টিক্ !
টিক্‌টিকি বলে ঠিক!

ওড়ে পাখী সব দিক্
ছোলা-ছাতু খেয়ে নিক্!

চাম্‌চিকে চিক্ চিক্—
পোড়ো বাড়ী চেনে ঠিক !

বনে-বনে গায় পিক্ —
ভোম্‌রারা মধু দিক !

ভিখীরীরা মাগে ভিখ্—
আধ্‌লাটা তুলে নিক্।

জানলার ভাঙা শিক্
সব চোরে নেবে ঠিক!

দিদিমা যে করে, দিক্
এটা নয়, ওটা ঠিক !

ছুটবি দিক্-বিদিক্ ···
ঘড়ি চলে টিক্ টিক্ !

ঘুমের মাসি—ঘুমের পিসি

ঘুমের মাসি··· ঘুমের পিশি
চুপ্‌টি করে এসো—
ফোক্‌লা দাঁতে পানটি খেয়ে
কেবল তুমি হেসো!

সঙ্গে করে আসবে মাসী
সাত-রাজ্যের ঘুম!
পিশি এলো তোমার সাথে
হিমের দেশের চুম্‌!

পরীর দেশের গন্ধ মাখা
হাজার রকম গান—
সঙ্গে এনো, শুনে সবার
জুড়িয়ে যাবে প্রাণ।

চাঁদের মায়ের হাতেই বোনা
মিহি সুতোর সাড়ী—
আন্‌বে সাথে তারার হাসি—
ভর্তি যে এক হাঁড়ি।

তবেই মোরা মাসি-পিশি
ঘুমের দেশে যাবো—
নইলে সারা রাতটি জেগে
চাঁদের পানে চাবো।।

নেংটি ইঁদুর ভাই !

নেংটি ইঁদুর ভাই—
একটি আমার দাঁত পড়েছে··· চক্ষে যে ঘুম নাই !
মুখের কথা ফস্কে যে যায়—
খাবার খেতে সব পড়ে যায়
ঝগড়া আমাব জমতে না চায়—
কেবল কাঁদি তাই—
চক্ষে যে ঘুম নাই !

নেংটি ইঁদুর ভাই—
তোমার মত চক্‌চকে দাঁত একটি আমি চাই—।
তবেই আমি পড়তে যাবো—
তবেই আমি খাবার খাবো—
ঝগড়া করে আমোদ পাবে
নইলে তুমি ছাই ।
তোমার মুখ দেখতে নাই !
ডাণ্ডা নিয়ে ধাই ।

ছুটি ! ছুটি ! ছুটি !

ছুটি ! ছুটি! ছুটি!
আয় রে সবাই জুটি!

সকল মজা লুটি !
হেসেই কুটি কুটি !

ফুল যে ওঠে ফুটি
তুলবো মুঠি মুঠি !

আয়রে নিয়ে ঘুঁটি —
নইলে খেলায় ত্রুটি!

জ্যোছনা ওঠে ফুটি !
দেখছি তারা দুটি !

দাঁড়িয়ে কেরে উটি ?
চলনা গুটি-গুটি !

খোকার হাতের মুঠি
মাণিক আছে জুটি !

খুব ভোরেতে উঠি
ছুটি ! ছুটি ! ছুটি !

রবীন্দ্র জন্মদিনে

রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় কৃষ্টি ও সংহতির প্রতীক বলা যেতে পারে। তিনি নিজে ছিলেন বিশ্বকবি—তাই সব কিছু শুচিতা, শুভ্রতা আর সৌন্দর্য নিয়ে উৎসব করতে ভালোবাসতেন। শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে গাছের ছায়ায়, রবির আলোয় আর চাঁদের কিরণের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে নির্জ্জনে কাল কাটাতে তিনি আনন্দ পেতেন। না-জানা পাখীর গান প্রত্যহ তাঁর মনে প্রেরণা জোগাতো। তাইত বিভিন্ন ঋতুর এত অজস্র গান তিনি আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন।

ভারতের প্রাচীন প্রথা—উৎসব-অনুষ্ঠানে আল্পনা দেওয়া একরকম উঠেই গিয়েছিল। তিনি শান্তিনিকেতনে নতুন করে তার প্রবর্ত্তন করেন। এখন সব কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আল্পনা দেবার প্রথা আবার চালু হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুন্দরের পূজারী। অসুন্দরকে তিনি সইতে পারতেন না। তাই তাঁর জন্মদিন পালন করতে হলে তোমাদের সুন্দরকে আহ্বান করতে হবে।

২৫শে বৈশাখ তোমাদের মনোমন্দিরে অক্ষয় হয়ে আছে। তোমাদের মনের-মানুষ আর সারা বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন তোমরা কিভাবে পালন করবে—সবাই মিলে একটা পরিকল্পনা করি এসো।

সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি যাতে তোমরা সুন্দরেরই আরাধনা করতে পারো, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবে।

প্রথমেই তোমাদের ভেবে নিতে হবে—রবীন্দ্রনাথ কি ভালোবাসতেন, আর কি পছন্দ করতেন।

শুভ্র-সাদা জিনিসের ওপর রবীন্দ্রনাথের একটা ভারী আকর্ষণ ছিল। যেমন সাদা ফুল, সাদা মালা, সাদা পোশাক, সাদা জুতো ইত্যাদি।

সেইজন্যে রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি-উৎসবে যাতে শুভ্রের সমাবেশ হয়, সে বিষয়ে তোমাদের খুব যত্নশীল হতে হবে।

আর একটি কথা মনে রাখবে সবাই যে, সব কাজ নিজ হাতে করবে।

প্রথমেই ধরো, রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি-স্থাপন।

বাজারে তাঁর বহু রকম ছবি কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তোমরা সেদিকে মোটে যাবে না। তোমাদের মধ্যে যারা ভালো ছবি আঁকতে পারো—তারা নিজেরা কবির একখানা সুন্দর ছবি এঁকে নেবে। উৎসব-প্রাঙ্গণে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানে সেই প্রতিকৃতিটি টাঙিয়ে দেবে। তার আগে সাদা ফুল দিয়ে ছবির চারধার কলা-সম্মতভাবে সাজিয়ে দেবে।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে দুলিয়ে দেবার জন্যে আলাদা সাদা মালা তৈরী রাখবে এবং তা সভাপতির হাত দিয়ে যথাসময়ে পরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। ওই অনুষ্ঠানকে তোমরা বলবে "প্রতিকৃতিতে মাল্যদান।"

এইবার এসো, উৎসবের উদ্যোগ-পর্ব্ব সম্পর্কে আলোচনা করি। অনুষ্ঠানের দু'মাস আগে কর্ম্মসূচি ঠিক করতে হবে। সারাদিনের মধ্যে কখন কোন অনুষ্ঠান সম্পাদন করবে, তার একটা পাকাপাকি পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই হওয়া দরকার।

খুব সকালে পাড়ার বা আসরের ছেলেমেয়েরা সমবেত হয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে প্রভাত-ফেরীর ব্যবস্থা করবে। সেই গান যাতে ঠিক রবীন্দ্রনাথের সুরে গাওয়া হয়, তার জন্যে যত্নশীল হতে হবে। অনেক প্রতিষ্ঠান ভুল সুরে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে থাকে। এ কাজটি মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, বরঞ্চ সকল দিক দিয়েই নিন্দনীয়। রবীন্দ্রনাথের গানের কথাগুলি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা প্রয়োজন এবং সুরটিও খাঁটি হওয়া দরকার। দীর্ঘদিন ধরে গানের মহলা দেবে।

প্রভাত-ফেরীর পর তোমরা একটা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে পারো। কিভাবে এই রবীন্দ্র-প্রদর্শনী সাজাবে সেই সম্পর্কে আমি তোমাদের কয়েকটি কথা বলছি। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাকার ঘটনাগুলি পর পর সাজিয়ে নাও। এইভাবে সাজাতে গেলেই তোমাদের "জীবন-স্মৃতি" ও "ছেলেবেলা" বই দু'খানি পড়ে নিতে হবে। তা হলেই দেখতে পাচ্ছ যে, প্রদর্শনী খুলতে গেলেও পড়াশোনার প্রয়োজন।

ছেলেবেলাকার ঘটনাগুলি পরপর সাজানো হয়ে গেলে—তোমরা যার ছবি আঁকতে পারো, তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে—কে কটা করে ছবি আঁকবে। সবগুলো ছবি যখন আঁকা শেষ হয়ে যাবে—তখন দেখতে পাবে, "রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা" চমৎকার ছবির ভেতর দিয়ে ধরা পড়েছে। সেই ছবিগুলি পর পর সাজিয়ে দেবে প্রদর্শনী ঘরে। তলায় তলায় চিত্র-পরিচিতি নিজেদের হাতে লিখে দেবে।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের লেখা যতগুলি বই তোমরা সংগ্রহ করতে পারবে—সব সাজিয়ে দেবে এই প্রদর্শনীতে। নিজেদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের কাছে যে সব বই পাবে, তাও জোগাড় করে নিয়ে আসবে। বলবে, প্রদর্শনীর পর সবাইকার বই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যারা এই প্রদর্শনী সংগঠন করবে তাদের একটা উপকার এই হবে যে, এই অবকাশে রবীন্দ্রনাথের না-পড়া বইগুলি পড়ে নিতে পারবে। এটাও তোমাদের পক্ষে একটা কম লাভ নয়।

কোনো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে যদি রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি এই প্রদর্শনীতে দিতে পারো, তা হলে ত' কথাই নেই।

একজন নামকরা সাহিত্যিক কিম্বা কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এই প্রদর্শনী উদ্বোধনের

ব্যবস্থা করবে। তিনি তোমাদের ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন—প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য কি এবং জনশিক্ষার কাজে প্রদর্শনী কিভাবে সহায়তা করে থাকে।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন-পর্ব্ব সমাধা হয়ে গেলে সকলের জন্যে সেটা সারাদিন ধরে খোলা রাখবে। এই কাজ সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে ভুলবে না। যদি তোমরা অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করো যে, চার পয়সা করে প্রবেশমূল্য ধার্য্য করবে, তবে আগে থেকেই প্রবেশপত্র ছাপিয়ে রাখবে। এই উপলক্ষে যে অর্থ সংগৃহীত হবে, তা দিয়ে তোমরা পাঠাগারের জন্যে নতুন বই কিনতে পারবে। সে বই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এর পর হচ্ছে, তোমাদের সন্ধ্যাবেলাকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এই অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে উৎসবের আসরটি চমৎকার ভাবে সাজিয়ে নেবে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি কিভাবে সাজাবে, সেকথা তোমাদের আগেই জানিয়েছি। এইবার মণ্ডপ সজ্জার দিকে চলে এসো। পেছনে শ্বেত-শুভ্র একটি পর্দা ঝুলিয়ে দেবে। সাদা ফুলের গুচ্ছ আর রজনীগন্ধার ঝাড় দু'পাশের ফুলদানিতে শোভা পাবে। বেদীর সামনে মেয়েরা চমৎকার করে আলপনা দেবে। আগের দিন যদি আলো-চাল ভিজিয়ে রাখো, তাহলে তাই বেটে জল মিশিয়ে যে গোলা হবে, তাতে সুন্দর আল্‌পনা আঁকা চলবে। সেই আল্‌পনা শুকিয়ে গেলে একেবারে ঝক্‌ঝক্ করবে। আজকাল অনেকে জিঙ্ক্ অক্সাইড্ গুলেও আল্‌পনা দিয়ে থাকে। সে আল্‌পনাও দেখতে নেহাৎ মন্দ হয় না।

নানা রঙের মশ্‌লা ও ডাল দিয়েও চমৎকার আল্‌পনা দেওয়া যায়। পদ্ধতিটা অবশ্য আগে থেকে শিখে নিতে হবে। আমি একবার শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেই সময় ওখানকার ছেলে মেয়েরা যে অনুষ্ঠান করেছিল— তার ভেতর উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল পলাশ ফুলের আল্‌পনা। শান্তিনিকেতনের মেয়েরা সেই আল্‌পনা সাজিয়েছিল। সে যে কি চমৎকার হয়েছিল, নিজের চোখে না দেখলে লিখে বোঝানো শক্ত!

সাজানোর ব্যাপারে বেশী বাড়াবাড়ি কিছু না করাই ভালো। বাহুল্য-বর্জ্জিত একটা শুচি শুভ্র পবিত্র ভাব যাতে বজায় থাকে সেদিকে সব সময় দৃষ্টি রাখবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাঁচ ভাবে বিভক্ত করতে হবে: (১) যারা আবৃত্তি করবে, (২) যারা লিখিত রচনা পাঠ করবে, (৩) যারা গান করবে, (৪) যারা নৃত্য করবে এবং (৫) যার অভিনয় করবে। এই পাঁচটি বিষয়ই আগে থেকে বিশেষ আলোচনা করে ধার্য্য করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের লেখা যে সব কবিতা কেবলমাত্র ছোট ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত, সেগুলি খুব যত্ন করে আগে বাছাই করে নিতে হবে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, একটি ছোট ছেলে—চিৎকার করে আবৃত্তি করছে "ভুলি নাই,— ভুলি নাই—ভুলি নাই প্রিয়া।" কিম্বা একটি ছোট মেয়ে "দুঃসময়" আবৃত্তি করে সকলের হাততালি কুড়োবার চেষ্টা করছে। বলা বাহুল্য, এই দুইটি কবিতা রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্যে রচনা করেন নি। তিনি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের জন্যে দু'হাত উজাড় করে ছড়া, হাসির কবিতা, গাথা, কাহিনী, উপাখ্যান, গল্প, নাটক প্রভৃতি ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন। সেইগুলি আমাদের কুড়িয়ে নিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে হবে। কোন বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্যে কি-জাতীয় কবিতা রচনা করা হয়েছে, সেগুলি আগে থেকে ঠিক মতো বেছে নিতে হবে। সেই তালিকা-অনুসারে ছোটদের কবিতা শেখাতে হবে। আবৃত্তি শেখার সময় উচ্চারণের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। অকারণ টেনে টেনে আবৃত্তি করলে সেটা হাস্যকরই হবে। শিক্ষার চাইতে অশিক্ষাই সেখানে হবে বেশী। কাজেই এই ব্যাপারে অভিভাবকদেরও খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

আবৃত্তির সময় ছোট ছোট কবিতা নির্ব্বাচন করে নিতে হবে! তাতে যে আবৃত্তি করবে, সেও আনন্দ পাবে— আর যাঁরা আবৃত্তি শুনবেন, তাঁরাও খুশী হয়ে বাড়ী ফিরে যেতে পারবেন।

যারা লিখিত রচনা পাঠ করবে— তাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, অপ্রয়োজনীয় গুরু-গম্ভীর কথা যেন তারা ব্যবহার না করে। ছোট ছোট কথা দিয়ে ছোট ছোট বাক্য রচনা করবে। বক্তব্যটা নিজের ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করবে তা হলেই রচনা সুখপাঠ্য হবে।

যারা রবীন্দ্রনাথের গান গাইবে ও সেই সঙ্গে নাচবে, তাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। কেননা, রবীন্দ্র-সুরের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। খেয়ালমতো যে কোনো সুরে রবীন্দ্রনাথের গান গাইলে চলবে না। প্রত্যেকটি গানের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সুরের সেই 'টেকনিক' তোমাদের আয়ত্ত করতে হবে। প্রত্যেকের গলায় আবার রবীন্দ্র-গীতি ভালো শোনায় না। সেজন্যে যাদের কণ্ঠ রবীন্দ্র-গীতির সম্পূর্ণ উপযোগী, তাদের আগে থেকে নির্ব্বাচন করে নিতে হবে। গানের সঙ্গে সমতা রেখে নৃত্য-পরিকল্পনা করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপির বই কিনতে পাওয়া যায়। যে শিক্ষক তোমাদের রবীন্দ্রনাথের গান শেখাবেন, তাঁর কর্ত্তব্য হবে, এই সব স্বরলিপির বই অনুসরণ করে নির্ভুলভাবে গান শেখানো। রবীন্দ্রনাথের এমন বহু গান আছে যা নাকি সমবেত কণ্ঠে গাওয়া যেতে পারে। এই গানগুলি যদি তোমরা একযোগে গাইতে শেখো— তা হলে অতি সহজেই তোমাদের গানের গলা খুল্‌বে।

রবীন্দ্র-জন্মতিথিতে তোমরা যে গানগুলি গাইবে, সেগুলি আগে থেকে নির্ব্বাচন করে দীর্ঘকাল ধরে অনুশীলন করতে হবে। তা হলেই অনুষ্ঠান-কালে গান শুনে সবাই তোমাদের প্রশংসা করবে।

এর পর অভিনয়ের পালা।

রবীন্দ্রনাথ তোমাদের জন্যে কয়েকটি সুন্দর নাটিকা উপহার দিয়ে গেছেন। যেমন ধরো —মুকুট, ডাকঘর, অচলায়তন, তাসের ঘর ও হাস্যকৌতুকের ছোট ছোট নাটিকাগুলি। মেয়েদের জন্যে রয়েছে—চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের ছড়াগুলি দিয়েও সুন্দর নৃত্য-নাট্য তৈরী করা চলে। তোমরা একবার সাজিয়ে দেখো।

এই বিশেষ উৎসবে তোমরা কি নাটক অভিনয় করবে সেটা যথাসময়ে ঘরোয়া বৈঠকে ঠিক করে নেবে। নাটককে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে ভালো করে মহলা দেওয়া প্রয়োজন। যারা যত মহলা দেবে, তারা তত ভালো অভিনয় করতে পারবে—এবিষয়ে কোনো ভুল নেই।

রবীন্দ্রনাথের নাটক-অভিনয় করতে গেলে, চলতি 'সীন' ভাড়া করে তোমরা অভিনয় করবে না। নিজেরা নাটকের উপযোগী করে দৃশ্য সাজিয়ে নেবে। তা হলে ছোট বড় সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করতে পারবে। রবীন্দ্র-নাট্য অভিনয় করতে গেলে আর একটি কথা তোমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। সেকথাটি হচ্ছে— উচ্চারণ-ভঙ্গী। রবীন্দ্র-নাটকের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে—শুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ।

ইচ্ছে করলে তোমরা নিজেরাও নাটক লিখে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে অভিনয় করতে পারো। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাকার কোনো একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোমরা সবাই আলোচনা করে একটি নাটক রচনা করলে। তারপর সেই নাটকটি রবীন্দ্র-সাহিত্য-রসিক কোনো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌কে দেখিয়ে সংশোধন করে নিলে। তখন আর সেই নাটকটি অভিনয় করতে তোমাদের কোনো বাধা নেই। তবে একটি কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, নাটক যেন দীর্ঘ হয়ে না পড়ে। এই-জাতীয় উৎসবে একাঙ্ক নাটিকাই সকল দিক দিয়ে অভিনয়ের উপযোগী। তাতে দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারেও তোমারা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে প্রথম পুরস্কার পান তাঁর বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। একটি গান রচনা করবার জন্যে বাবা ছেলেকে এই পুরস্কার প্রদান করেন। এই ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। কে জানে, এই পুরস্কারের প্রেরণা লাভ করে রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী কালে "নোবেল পুরস্কার" পেয়েছিলেন কিনা। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমি একটি নাটিকা রচনা করে দিলাম। তোমারা ২৫শে বৈশাখে অভিনয় করতে পারবে।

প্রথম পুরস্কার

(চুঁচুড়োয় গঙ্গাতীরে একটি বাড়ীর ছাদ। দূরে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। ছাদের রেলিং ছাড়িয়ে কয়েকটি নারকেল গাছের মাথা আকাশে উঁচু হয়ে উঠেছে। ভোর বেলা। আকাশে সবে সূর্য উঠ্ছে। নানারকম পক্ষী-পাখালীর ডাক শোন যাচ্ছে। ভোরবেলার পরিবেশটি ভারী মধুর। কিশোর রবি আর তাঁর জ্যোতিদাদা ছাদে পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন)

রবি।। জানো জ্যোতিদাদা, চুঁচ্ড়োর এই গঙ্গার ধারের বাড়ীতে এসে আমার কী যে ভালো লাগছে তোমায় কি বলবো! মনে হচ্ছে, সারা পৃথিবী যেন আমার কানে কানে গান হয়ে ধরা দিয়েছে। মাথার ওপরকার আকাশটা অনেক নীচু হয়ে যেন আমার সঙ্গে মিতালী পাতায়। গঙ্গার ওপর দিয়ে যখন-তখন পাল তোলা নৌকো চলে যায়, আমার মনে হয় যেন ওদের সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা করি। আর এই যে সকাল বেলা নাম-না-জানা পাখীরা সব ডেকে যাচ্ছে—। আমার মনে হচ্ছে— ওরা যেন সবাই আমার কানে নতুন সুর শুনিয়ে যাচ্ছে—। কত সুর যে আমার হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে তোমায় কি বলবো, জ্যোতিদাদা! কেবলি মনে হচ্ছে, সারা জীবন আমি শুধু গান শুনিয়ে যাই—

জ্যোতি ।। চুঁচ্ড়োয় এসে নতুন কোনো গান্ বাঁধ্লি রবি ? তোর গানের সঙ্গে বাজাতে আমার খুব ভালো লাগে।

রবি ।। হ্যাঁ জ্যোতিদাদা। সেই যে খাতাটা তৈরী করেছিলাম জোড়াসাঁকোতে—এখানে এসে গানে-গানে একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে। একটু নিরিবিলি জায়গায় খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসলেই নতুন ছন্দের, নতুন সুরের গান তৈরী করে ফেল্ছি।

জ্যোতি ।। আমায় শোনাবি নে সেই সব গান, রবি ?

রবি।। নিশ্চয়। যে সব গানে সুর দিতে পারিনি— শুধু ছন্দটা মনকে দোলা দিয়েছে— সেগুলো ত' তোমার কাছেই তুলে ধরবো। তুমি বাজাবে, আমি নতুন করে তাতে সুর জোগাবো।

জ্যোতি।। ঠিক আছে। আজ দুপুর বেলা তুই আমায় গানগুলো শোনাবি, রবি। আমি পিয়ানো বাজিয়ে নতুন-নতুন সুরের সৃষ্টি করবো। তোর কথায় সুর জোগাতে আমার কিন্তু ভারী ভালো লাগে।

রবি।। কাল গভীর রাত্রে কি হয়েছিল জানো জ্যোতি দাদা?

জ্যোতি।। কি হয়েছিল রে রবি?

রবি।। অনেক রাত্তিরে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখন সারা বাড়ীতে কেউ জেগে নেই। দূর থেকে গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি আমার কানে যেন নতুন ছন্দ জাগিয়ে দিলে। এপাশ-ওপাশ করতে লাগ্‌লাম। ঘুম আর কিছুতে আসে না। ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম এই ছাদে—

জ্যোতি।। একা একা তোর ভয় করলো না, রবি ?

রবি।। ভয় ? ভয়ের কথা একবারও মনে হল না, জ্যোতিদাদা। অথচ তুমি জানো, জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আমার কি রকম ভূতের ভয় ছিল?

জ্যোতি।। তারপর, রবি?

রবি।। তারপর অনেকক্ষণ ধরে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আকাশে চাঁদের আলো, ভাঙা-ভাঙা মেঘগুলো সেই চাঁদের ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে—দেখে দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে। মনে হল—কত না-বলা গান এসে আমার বুকে বাসা বেঁধেছে। এই গঙ্গার স্রোতের মতো তারা মুক্তি পেতে চায়। নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হবে কবে? চাঁদের আলো গঙ্গার বুকে খেলা করে বেড়াতে লাগ্‌লো—আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

জ্যোতি।। সারা রাত ঘুমুলি না, রবি? শুধু গঙ্গার জল আর চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখলি?

রবি।। একটা রাত না ঘুমুলে কি হয়, জ্যোতিদাদা? কিন্তু তার বদলে আমি কি পেয়েছি জানো?

জ্যোতি।। কি রে রবি?

রবি।। ভোরবেলা একটি সুন্দর গান আমার মনে ধরা দিয়েছে।

জ্যোতি।। সত্যি ? সেই গানের প্রথম লাইনটি আমায় বলবি নে?

রবি।। কেন বল্‌ব না, জ্যোতিদাদা? প্রথম লাইনটি হচ্ছে···

"নয়ন তোমার পায় না দেখিতে রয়েছে নয়নে-নয়নে···"

জ্যোতি।। [উৎসাহিত হয়ে] বাঃ চমৎকার কথাটি তো ! "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে ···রয়েছ নয়নে-নয়নে···" এমন সুন্দর কথাটিকে হারিয়ে যেতে দিতে পারিনে ! আমি এক্ষুনি হারমোনিয়াম নিয়ে আসি। তুই গাইবি, আমি ধীরে ধীরে সুর তুলে নেবো।

রবি।। খুব ভালো কথা বলেছ, জ্যোতিদাদা। হারমোনিয়াম নিয়ে এসো, আমি গাইব।

[জ্যোতি হারমোনিয়াম নিয়ে এলো। ওরা দু'জনে ছাদের উপর বসল। রবি গান ধরল]

গান

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে-নয়নে—
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।।

জ্যোতি।। বাঃ ! সুন্দর হয়েছে। যেমন কথা তেমনি সুর।
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে-নয়নে—
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।।

রবি।। সত্যি জ্যোতিদাদা, আজ সারাদিন ধরে এই গান আমার মনে গুণ-গুণ ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে ফিরছে ।

জ্যোতি।। [আনন্দে রবিকে জড়িয়ে ধরল] আমারো রবি আমারো। [গানখানি গাইল]

[ক্ষণিক বিরাম। পর্দ্দা নেমে এল। আবার যখন যবনিকা উঠে গেল, দেখা গেল সেই ছাদে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। দু'জন চাকরের প্রবেশ]

ঈশ্বর।। জানিস শ্যামচাঁদ, রোজ সন্ধ্যাবেলা কর্ত্তামশাই এখানে ভগবানকে ডাকেন। তাই তাড়াতাড়ি মাদুর বিছিয়ে দিতে এলাম।

২য় ভৃত্য।। আমার আর কি করতে হবে , ঈশ্বরদা?

ঈশ্বর।। ধূপ-ধুনো দিবি— রেকাবিতে করে ফুল এনে রাখবি। কর্ত্তামশায় ফুল খুব ভালোবাসেন। নীচের বাগানে অনেক ফুল ফুটে আছে। ফুলের ত' আর অভাব নেই।

[ওরা দু'জনে ধূপ জ্বলে, মাদুর বিছিয়ে, রেকাবীতে ফুল রেখে চলে গেল। একটু বাদেই তানপুরা হাতে শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রবেশ]

শ্রীকণ্ঠ।। তাইত! কর্ত্তামশায় এখনো ছাদে আসেননি দেখতে পাচ্ছি। নীচে রবিকেও খুঁজে পেলাম না। খাসা গলা হয়েছে ওর। রবি যদি গান শেখে একদিন ওস্তাদ বনে যেতে পারবে।

[মাদুরে বসে তানপুরা নিয়ে নিজেই গান ধরলেন] কি আর করি আপন মনে নিজেই গলা সাধি—

"তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে—
কে সহায় ভব অন্ধকারে—

[এমন সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এসে ছাদে প্রবেশ করলেন ও ওঁর পাশে মাদুরে এসে বসলেন]

শ্রীকণ্ঠ ।। এই যে কর্ত্তামশায়, আপনি এসে গেছেন। আজকাল রবি কি চমৎকার গান বাঁধছে। আর এই বয়সে ওর গলাও হয়েছে ভারী মিষ্টি। মাঘোৎসবের জন্যে আজ সকালে একটি গান যা লিখেছে— শুনলে আপনিও খুশি হবেন।

মহর্ষি।। তাই নাকি শ্রীকণ্ঠবাবু? আমি ত' কিছু খবর রাখিনি। আচ্ছা, আমি ঈশ্বরকে দিয়ে ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি—। ঈশ্বর —ওহে ঈশ্বর—

[ঈশ্বরের প্রবেশ]

ঈশ্বর ।। আজ্ঞে কর্ত্তামশায়—

মহর্ষি ।। রবিকে একেবার নীচে থেকে ডেকে নিয়ে এসো। বলো, আমি ডেকেছি—

ঈশ্বর ।। যে আজ্ঞে কর্ত্তামশায়! [ঈশ্বরের প্রস্থান ও রবিকে নিয়ে প্রবেশ]

মহর্ষি ।। এই যে রবি ! শ্রীকণ্ঠবাবুর কাছে শুনলাম তুমি নাকি গান রচনা করছো। আমার উপাসনার আগে একটি শোনাও ত'।

[রবি মাদুরে বসে সকালবেলার গানটি শোনালো। মহর্ষির দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, তাঁর মুদ্রিত দুই চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। শুধু শ্রীকণ্ঠবাবু অতি আনন্দে মাথা দোলাচ্ছেন। একটু বাদে মহর্ষি সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন।]

মহর্ষি ।। শোনো রবি, তোমার গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানতো ও সাহিত্যের আদর বুঝতো, তবে কবিকে সে পুরস্কার দিত। রাজার দিক থেকে যখন কোন সম্ভাবনা নেই—তখন আমাকেই সেই কাজ করতে হচ্ছে। এই নাও কবি,— তোমার পুরস্কার।

[পকেট থেকে বের করে একটি পাঁচশ' টাকার চেক্ রবির হাতে দিলেন। রবি তার পিতৃদেবেরে পদধূলি গ্রহণ করলো।]

গান্ধীর জন্মদিন পালন

শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী হচ্ছেন মহামানব— মহাত্মা গান্ধী। ২রা অক্টোবর তাঁর জন্মদিন। তাঁর জন্মদিন পালন করতে গিয়ে তোমাদের সকল রকমে শুচিতা বজায় রাখতে হবে।

প্রথমেই তোমরা ভেবে নাও, মহাত্মা গান্ধী সারা জীবন ধরে কি আদর্শ প্রচার করে গেছেন ? সত্যের পূজারী হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর কাছে সত্যই হচ্ছে ধর্ম্ম। অন্য কোনো ধর্ম্ম নেই।

খুব ছেলেবেলায় 'হরিশ্চন্দ্র' পালা দেখে তাঁর সত্য-পালনে মুগ্ধ হয়ে তিনি মনে-প্রাণে সত্যকে ভালোবাসতে শেখেন। রামচন্দ্রের পিতৃ-সত্য-পালনও তাঁর চরিত্র-গঠনে সহায়তা করে। আর অহিংসা হচ্ছে মহাত্মাজীর মূলনীতি। অবশ্য মহাভারতের বুকে ইতিপূর্ব্বে বুদ্ধদেব, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অহিংসার বাণী প্রচার করে গেছেন। তবু বর্ত্তমান জগতে নতুন করে অহিংসার মূলমন্ত্র জনগণের মধ্যে বিতরণ করলেন— মহাত্মা গান্ধী। তাই মহাত্মাজীর জন্মদিন পালন করতে গিয়ে তোমাদের সকল কাজে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা রাখতে হবে।

গান্ধীজী আজীবন হাতে-কাটা সুতোর তৈরী খাদি ব্যবহার করে গেছেন। কাজেই তোমরা যদি উৎসব-মণ্ডপটি শুভ্র খদ্দরে মণ্ডিত করতে পারো, তা হলে জন্মদিনের শুচিতা ও নিষ্ঠা দুই-ই বজায় থাকবে। আর একটি কথা, মহাত্মাজী স্বাবলম্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজের হাতে সব কাজ করতে ভালবাসতেন। বেশ মনে আছে, একবার শান্তিনিকেতনে আমি একটি উৎসবে যোগদান করেছিলাম। মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বপ্রথম যে বিশেষ দিনটিতে শান্তিনিকেতনে পদার্পণ করেন— প্রতি বছর শান্তিনিকেতনের ছেলে-মেয়েরা সেই দিনটি পালন করে থাকে। এই বিশেষ দিনটিতে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা আশ্রমের বামুন-ঠাকুর ও চাকরদের ছুটি দিয়ে দেয়। সকাল থেকে সব কাজ নিজের হাতে সম্পন্ন করে। অনেকটা ঠিক ব্রতপালনের মতো। নিজেরা বাসন মাজে, রান্নার কাজ করে, আশ্রম পরিষ্কারের দায়িত্ব পালন করে, এমন কি সেইদিন তারা নিজেদের হাতে পায়খানা পর্যন্ত সাফ করে থাকে। এসবই হচ্ছে গান্ধীজীর শিক্ষা। গান্ধীজী যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন—সেই সময় নিজে উদ্যোগী হয়ে ছেলে-মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তুলেছেন। মহাত্মাজী নিজের স্থাপিত আশ্রমেও এই নীতি বরাবর মেনে চলতেন। কাজেই গান্ধীজীর জন্মদিনে তোমরা যদি সব কাজ নিজের হাতে নির্ব্বাহ করো, তাহলে তাঁরা আত্মার তৃপ্তিসাধন হবে।

তোমরা নিশ্চয়ই মহাত্মাজীর জীবনী পড়ে জেনেছ যে, রোগীর সেবা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কাজ ছিল। বহু কুষ্টরোগীর সেবা পর্যন্ত তিনি বিনা দ্বিধায় করতেন। সুতরাং তাঁর জন্মদিনে যদি দেশের ছেলেমেয়েরা "সেবা-সঙ্ঘ" প্রতিষ্ঠা করে এবং বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে রোগীর পরিচর্য্যা করে, তবে সকল দিক দিয়েই তা শোভন ও যোগ্য বলেই বিবেচিত হবে।

আগে থেকে ব্যবস্থা করে তোমরা নিজ নিজ অঞ্চলের হাসপাতালগুলিতে ফল, ফুল, খাবার ইত্যাদি উপহার হিসাবে প্রদান করতে পারো।

হরিজনের সেবা মহাত্মা গান্ধীর আর একটি আজীবনের ব্রত। তোমাদের অঞ্চলের আশেপাশে যেসব বস্তি আছে, কিম্বা যে সব দুঃস্থ, দরিদ্র, নিপীড়িত ছেলেমেয়ে থাকে-- তাদের তোমরা এই বিশেষ দিনটিতে আমন্ত্রণ করে আনবে গান্ধীজীর জন্মদিনে যোগদান করতে। তাতেও মহাত্মাজীর আত্মা তৃপ্তিলাভ করবে। তোমরা যদি দুপুরবেলা এইসব অনাথ আর অভাব গ্রস্ত বালক-বালিকাদের ভোজন করাতে পারো, তা হলে আরো সুন্দর হয়। এই সব অনুষ্ঠান করতে গিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার যে শিক্ষা হবে— জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তার দাম বড়ো কম নয়।

এই বিশেষ দিনটিতে তোমারা হরিজনদের জন্যে পাঠাগার ও নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করতে পারো। নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করা এক পক্ষে খুব সোজা। প্রথমে কোনো বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে যে, তোমরা সেখানে রাতের ক্লাশ বসাবে। স্থানীয় কয়েকজন অভিভাবকরে কাছ থেকে তেলের খরচাটা সংগ্রহ করবে। পড়ানোর কাজটা তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবে, তাহলেই বিদ্যালয়-পরিচালনার কাজ আর কোন অসুবিধা হবে না। এই নৈশবিদ্যালয়ের মাধ্যমে তোমরা নিরক্ষরদেরও শিক্ষাদান করতে পারবে। এই জাতীয় সংগঠনমূলক কাজে আজকাল ভারত সরকার সাহায্য করে থাকেন। তোমরা সে সর্ম্পকেও খবরাখবর নিতে পারো।

কিন্তু খুব সকালবেলাকার অবশ্যকরণীয় কাজটি ভুলে গেলে চলবে না সেটি হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের প্রভাত ফেরী বের করা। গান্ধীজীর গান গেয়ে তোমরা সকলে এই প্রভাত-ফেরীটি বের করবে।

তোমাদের অনুষ্ঠানের সুবিধের জন্যে আমি একটি গান প্রভাত-ফেরীর জন্যে রচনা করে দিলাম—

জয় মহাত্মা মহারাজ!

তোমার জনম-দিবসে গান্ধী,—এসো ফিরে ধরা মাঝ।
নুতন দিনের মশাল জ্বালাও সত্যের পথে চলি
যত পাপ আর অপমান-গ্লানি দুধারে চরণে দলি!

নিপীড়িত যত জনগণ লাগি নিজ মাথে নিলে বাজ—
জয় মহাত্মা মহারাজ!

আপোষ করোনি তুমি মহাত্মা, কভু অসত্য সনে—
অঞ্জলি ভরি কুসুম আনিয়া তাই পূজে জনে-জনে
হরিজনে তুমি দিলে নব-গীতা
যত ব্যাথাতুর সব তব মিতা—
তব অহিংসা-বাণীর প্রভাবে হিংসা যে পেলো লাজ!
জয় মহাত্মা—মহারাজ !

এই দিন বিকেলবেলা তোমরা ঘরোয়া-বৈঠক বসিয়ে মহাত্মা গান্ধীর জীবনচরিত পাঠ করবে। এই জীবনচরিত পাঠ করলে তোমরা অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

এই দিনটিতে তোমরা যদি পল্লী-উন্নয়নের কাজ খানিকটা করো, তা হলে সেই অঞ্চলের সকলেই অনুপ্রাণিত হবে এবং তোমাদের সঙ্গে এসে হাত মেলাবে।

সন্ধ্যেবেলায় মহাত্মাজীর জীবনচরিতকে কেন্দ্র করে রচিত একটি সুন্দর নাটিকা অভিনয় করবে। তোমাদের অভিনয়ের জন্য একটি নাটিকা আমি রচনা করে দিলাম। আগে থেকে ভালো করে মহলা দিয়ে তোমারা নাটিকাটি নিজেদের চেষ্টায় পাদ-প্রদীপের সম্মুখে উজ্জ্বল করে তুলবে। আশাকরি এই নাটকের অভিনয় দেখে ছোট-বড় সকলেই খুশী হবেন।

আগেই তোমাদের বলেছি—নাটকের সাফল্য নির্ভর করে উপযুক্ত মহলার ওপর! সে বিষয়ে যেন তোমাদের আন্তরিকতার অভাব না ঘটে। একথা ভুলো না যে, গান্ধীজীও ছেলেবেলায় 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের অভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

অনুশোচনা

[একটি শয়ন-কক্ষ। তের বছরের কিশোর গান্ধী চেয়ার-টেবিলে বসে পড়াশোনা করছে। ঘরের এক কোণে একটি খাট। তাতে কিশোর গান্ধীর বিছানা পাতা। মশারী ওপরে তোলা আছে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একমনে পাঠাভ্যাস করছে। ঘরের পিছন দিকে একটি জানালা। পথ দিয়ে লোক যাতায়াত করলে জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাবে। হঠাৎ জানালার ভেতর দিয়ে গান্ধীর সমবয়সী একটি ছেলেকে দেখা গেল]

বন্ধু ।। ওরে গান্ধী, একমনে এত কি লেখাপড়া করছিস? এবার পরীক্ষায় তুই নিশ্চয়ই প্রথম হবি—

গান্ধী।। [লজ্জা পেয়ে বই বন্ধ করল] যাঃ, কি যে বলিস তুই ! গতবার কোনো

রকমে একটা বৃত্তি পেয়েছিলাম! তাই বলে একেবারে প্রথম! যা হবে না— সে কথা বলে লাভ কি, ভাই?

বন্ধু ।। ওরে, তোর বাবা বাড়ী আছেন?

গান্ধী ।। না ত! বাবা কি কাজে যেন বেরিয়ে গেলেন।

বন্ধু ।। বেশ ! চমৎকার হয়েছে। জামাটা গায়ে দিয়ে চট্ করে বেরিয়ে আয়ত !

গান্ধী।। না রে! এখন বেরুবার যো নেই। [চারিদিকে একবার তাকিয়ে] এখন পড়াশোনা ছেড়ে উঠলে মা বড্ড বকবেন। তার চাইতে তুই কেন এই ঘরের ভেতরের চলে আয় না।

বন্ধু ।। কিন্তু যদি কেউ দেখতে পায়?

গান্ধী ।। পেলেই বা! সবাই মনে করবে, দুই বন্ধু পরামর্শ করে পড়াশোনা করছে। ওতে কোনো দোষ নেই। তুই চলে আয় না ভিতরে। ওই গলির ভেতর দিয়ে ঢোকবার পথ আছে।

বন্ধু ।। আচ্ছা, তুই বলছিস্ যখন, তাই আসছি। [একটু পরে বন্ধু এসে ঘরে ঢুকলো]

গান্ধী ।। বোস— এই খাটের ওপর আরাম করে! সকালবেলা তোকে যে বড় বাড়ী থেকে বেরুতে দিলে?

বন্ধু ।। হুঁ! আমায় রুখবে কে ? আমি ত' স্বাধীন। এখন ভারতবর্ষকে কি করে স্বাধীন করা যায়, সেই কথাই ভাবছি।

গান্ধী ।। অ্যাঁ! বলিস কিরে ? ওই ষণ্ডা সায়েবদের সঙ্গে তুই গায়ের জোরে পারবি?

বন্ধু ।। আরে, সেই ব্যবস্থাই ত' করে এলাম। ওঠ্,— চল দেখি তাড়াতাড়ি—

গান্ধী ।। [ভয় পেয়ে] কোথায়?

বন্ধু ।। একটা গোপন জায়গায়—

গান্ধী ।। অ্যাঁ! গোপন জায়গায়! ব্যাপার কি?

বন্ধু।। তবে সব কথা খুলে বলি শোন! সায়েবদের গায়ে অত শক্তি কেন জানিস ?

গান্ধী ।। না ত!

বন্ধু ।। ওরা রোজ মাংস খায় বলে। আমাদেরও মাংস খেয়ে গায়ের জোর করতে হবে। সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি—

গান্ধী ।। [ভয়ে ভয়ে] আমি ভাই-মাংস খেতে পারবো না!

বন্ধু ।। কেন? পারবি নে কেন, শুনি আমাদের গায়ে জোর করতে হবে। তবে ত' সায়েব ব্যাটাদের হারিয়ে দেবো।

গান্ধী ।। কিন্তু আমরা যে বৈষ্ণব। আমি মাংস খেলে মা-বাবা মনে বড় কষ্ট পাবেন। হয়ত মনের দুঃখে আর বাঁচাবেনই না।

বন্ধু ।। দূর বোকা! তোর মগজে কোনো বুদ্ধি নেই! তোর মা-বাবা জানতে পারবেন কি করে? একটা পোড়ো বাড়ীতে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। মাংস আর পাউরুটি। আজ রাত্তিরে সেইখানে চুপিচুপি যেতে হবে।

গান্ধী ।। অ্যাঁ! রাত্তিরে ! সেখানে ভূতের ভয় নেই ?

বন্ধু ।। দুর বোকচন্দর ! তুই একটা আস্তো ভীতু—

গান্ধী ।। সাপ যদি থাকে— ?

বন্ধু ।। হা— হা— হা ! এত ভয় পেলে কখনো শরীরে শক্তি হয়? আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলা খেলার মাঠে আসিস্, আমি সেখান থেকে তোকে নিয়ে যাবো'খন।

গান্ধী ।। কিন্তু মাংস? আমি যে কক্ষনো ওঁ সব খাইনি।

বন্ধু ।। খাস্নি বলেই ত' এমন প্যাকাটির মতো চেহারা। আজ যদি রাস্তায় একটা মারামারি হয়, তাহলে ওই সায়েব ব্যাটারা তোকে মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে। তুই ওদের একটারও গায়ে হাতে দিতে পারবি?

গান্ধী ।। না, তা পারবো না !

বন্ধু ।। তবে? শরীরে শক্তি করা চাই। আমার চেহারা দেখেছিস? মাংস খেতে হবে ! প্রোটিন ফুড,— বুঝলি? তবে ত' মাসল হবে! হাতের গুলি শক্ত করতে হবে।

গান্ধী।। [ভয়ে ভয়ে] আচ্ছা, আমি সন্ধ্যেবেলা খেলার মাঠে থাকবো। তুই আমায় ডেকে নিয়ে যাস্—

বন্ধু ।। এই ত' ভালো ছেলের মতো কথা ! বেশ, আমি এখন চললাম। তা হলে একেবারে পাকা কথা রইল। [বন্ধুর প্রস্থান]

[সঙ্গে সঙ্গে পর্দা পড়ে গেল। খানিকবাদে আবার সেই দৃশ্যের যবনিকা উত্তোলন করা হল। দেখা গেল, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চাকর ভূষণ এসে গান্ধীর পড়বার টেবিলের ওপর একটি আলো রেখে গেল। খানিকবাদে মোহনদাসের বাবা কাবা গান্ধীর প্রবেশ]

কাবা গান্ধী ।। একি ! সন্ধ্যে উতরে গেছে— এখনো মোহনদাস পড়তে বসেনি ! বাড়ী ফিরতে ওর ত' এত দেরী কখনো হয় না ! ভূষণ— ওরে ভূষণ— [ভৃত্য ভূষণের প্রবেশ]

ভূষণ ।। হুজুর—

কাবা গান্ধী । মোহনদাস এখনো পড়তে বসেনি? কোথায় গেল সে?

ভূষণ ।। [মাথা চুলকে] ছোটবাবু ত' রোজ এমন সময়ে পড়তে বসে যান। খেলার মাঠেই বোধ করি আছেন।

কাবা গান্ধী।। এত রাত্তিরে খেলার মাঠে ? তুই একটু এগিয়ে দেখ্‌ত'—

ভূষণ ।। আচ্ছা হুজুর, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি— [ভূষণের প্রস্থান]

কাবা গান্ধী।। তাইত! মোহন ত' বাড়ী ফিরতে কখনো এত দেরী করে না! আসুক ভূষণ ফিরে— খবরটা জানা যাবে— [প্রস্থান]

[একটু বাদেই মোহনদাসকে নিয়ে ভূষণের প্রবেশ]

গান্ধী ।। বাবা, বড্ড চটে গেছেন ? না রে ?

ভূষণ ।। না, ঠিক চটেন নি ! তবে ব্যস্ত হয়েছেন বলেই মনে হল। তুমি ত' ছোটদাদাবাবু কক্ষনো এত দেরী করো না! খেলার মাঠ থেকে কোথায় গিয়েছিল?

গান্ধী ।। চুপ্‌! ওকথা জিজ্ঞেস করিস্‌ নি!

ভূষণ ।। [অবাক হয়ে] সে কি কথা ছোটদাদাবাবু ? জিজ্ঞেস করবো না কেন ? এক্ষুনি যে হুজুর আমায় ডেকে পাঠাবেন। আমাকে ত' গিয়ে সব কথা বলতে হবে!

গান্ধী ।। না— না— আমার কিছু জিজ্ঞেস্‌ করিস নি ! আমি মিথ্যে কথা বলতে পারবো না।

ভূষণ ।। হা— হা— হা! এই এক ছেলে হয়েছে ! তোমাকে মিথ্যে কথা বলতেই বা কে বলছে ?

গান্ধী ।। শোন্‌, বলে দিস, আমি এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম। এক্ষুনি পড়তে বসছি—

ভূষণ ।। [হেসে] আচ্ছা, আচ্ছা কর্ত্তামশাইকে তাই বলব। তুমি এখন বই নিয়ে চট্‌পট্‌ বসে পড়ো দেখি। [ভূষণ চলে গেল]

গান্ধী ।। আর একটু হলেই ভূষণকে সব কথা বলে দিয়েছিলাম আর কি! আমি যে আবার বানিয়ে আর সব ছেলের মতো মিথ্যে কথা বলতে পারিনে! ওই হয়েছে এক মহামুস্কিল। [পায়চারী করতে লাগলো]

আচ্ছা মাংসটা এমন কি খেতে ভালো ? ঠিক যেন চামড়ায় মতো লাগলো! আরে ছিঃ— ছিঃ ! দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়তে পারিনে! সে এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড! এর চাইতে আমাদের বাড়ীতে যে নিরামিষ তরকারী রান্না হয়— তার স্বাদ অনেক ভালো। আর এই শক্ত পাউরুটিটা! আমার জিব আর তালুটা যেন একেবারে ছড়ে গেছে ! যেমন মাংস —ঠিক তেমন তরকারী! আমার যেন ঠেলে বমি আসছিল। পাছে বন্ধুরা কিছু মনে করে— এই ভয়ে সব খেয়ে নিয়েছি। পেটটা একেবারে ভার হয়ে রয়েছে! বাড়ীতে আজ আর কিছু খেতে পারবো না।

[ভূষণের প্রবেশ]

ভূষণ ।। ছোট দাদাবাবু, মা ডাকছেন— খাবে চলো—

গান্ধী ।। সর্ব্বনাশ !

ভূষণ ।। কেন— সর্ব্বনাশ কেন ? আমি নিজে হাতে চাপাটি তৈরী করেছি। আর মা রান্না করেছেন— তরকারী। যা গন্ধ বেরিয়েছে— তুমি খাবে চলো ছোটদাদাবাবু—

গান্ধী ।। মানে কি জানিস ? আমার পেট একেবারে ভার।

ভূষণ ।। কেন ? পেট ভার কেন? বিকেলবেলা ত' শুধু এক গেলাস দুধ খেয়েছ। তারপর খেলাধূলা করেছ অতক্ষণ ধরে। এখন ত' পেটে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলবার কথা।

গান্ধী ।। হ্যাঁ, তা ত' ঠিকই। কিন্তু কি জানিস ভূষণ, আজ একেবারে ক্ষিদে নেই । পেটটা একেবারে ভার হয়ে আছে। মাকে তুই তাই বলে দে। আমার জন্যে মা যেন আর বসে না থাকেন । খেয়ে নিতে বল্ সবাইকে—

ভূষণ ।। কি, তোমার কথা ছিরি যে কিছুই বুঝতে পারিনে ছোট দাদাবাবু— তুমি বলছ, যাই মাকে গিয়ে তাই বলি গে— [ভূষণের প্রস্থান]

গান্ধী।। [আপন মনে] কী রকম যেন লাগছে আমার! এ বাড়ীতে ত' আর মাছ-মাংস ঢুকতে পারে না। চিরদিন নিরামিষ খেয়ে এসেছি— তাই মুখে ভালো লাগে। মাংসটা পেটে পড়ায় সারা গা যেন গুলিয়ে উঠছে ! বমি হবে কিনা কে জানে ! তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে পড়ি। নইলে মা যদি আবার এসে খাবার জন্যে টানাটানি করেন— তাহলে আর জোর করে না বলতে পারবো না। মহাবিপদেই পড়ে যাবো। [বিছানায় শুয়ে পড়ে মশারীটা ফেলে দিলে]

যাক, এইবার একেবারে নিশ্চিন্দি। ঘুমিয়ে পড়েছি দেখলে মা আর কিছুতেই খেতে ডাকবেন না ![একটা অস্থিরতার ঐকতান বেজে চললো]

[হঠাৎ ভূষণের প্রবেশ]

ভূষণ ।। অ্যাঁ ! তাই ত! ছোটদাদাবাবু একেবারে ঘুমিয়ে পড়ল! মা বললেন, আর কিছু না খায়, শুধু দুধ আর সন্দেশ খেয়ে শুয়ে পড়ুক। সাত তাড়াতাড়ি আগেই মশারী ফেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।— সবই আমি বুঝতে পেরেছি ! নাঃ, ওর কাণ্ডই একেবারে আলাদা ! [চলে গেল]

[ভূষণ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই গান্ধী মশারীর ভেতর থেকে মাথা বের করে একেবার উঁকি দিয়ে দেখলে। বুঝলে, অনেক কষ্টে ফাঁড়া কেটে গেছে। এখন আর কোনো ভয় নেই। আবার তাড়াতাড়ি মাথাটা মশারীর ভেতর গলিয়ে দিলে। নেপথ্যে দ্রুত ঐক্যতান বেজে চললে। আপন মনে খানিক বাদে পা টিপে-টিপে কাবা গান্ধী ঘরে প্রবেশ করলেন। খানিকটা পায়চারী করলেন, তারপর আপন মনে বললেন]

কাবা গান্ধী।। তাই ত ! ছেলেটা কি করছে, কোথায় যাচ্ছে— কিছুই ত' বুঝতে পারছি নে। ও যেমন আলা-ভোলা ছেলে বদ্ ছেলেদের সঙ্গে মিশছে কিনা তাই বা কি করে বলবো? আজ আবার শুনলাম, রাত্তিরে কিচ্ছু খেলে না। জ্বর-টর হয়নি ত? কপালটায় হাত দিয়ে দেখি—

[মশারী তুলে কপাল স্পর্শ করে দেখলেন]

নাঃ, কপাল ত' গরম নয়। যাই হোক, কাল একবার ডাক্তার দেখাতে হবে। এই বয়েসে ছেলেরা লোহা খেয়ে হজম করে ! রাত্তিরে খিদে হবে না— এত ভালো কথা নয়। নাঃ, এ ভাবনার কথাই হল—

[গান্ধী আবার মশারীর ভেতর থেকে মাথা বের করল]

গান্ধী।। সর্ব্বনাশ! বাবা যদি কোনো রকমে জানতে পারেন যে, আমি মাংস খেয়েছি— তা হলে মনে বড় কষ্ট পাবেন। অথচ শরীর শক্ত করাও দরকার। ইংরেজদের তাড়াতে হবে—নাঃ, আর ভাবতে পারিনে। মাথা আমার ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে। এইবার সত্যি-সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ব।

[মশারীর ভেতর মাথা ঢুকিয়ে নিলেন। সেতারের একটা বাজনা বাজতে লাগলো । একটু বাদে ভৃত্য ভূষণ এসে ঘরে ঢুকলো]

ভূষণ ।। নাঃ, রাত্তিরে আর ছোটদাদাবাবুকে কিছু খাওয়ানো গেল না! মা বললেন, একবাটি দুধ খাইয়ে দে। কিন্তু খাওয়াবে কাকে? কাঁচা

ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে না। কিন্তু রাত-উপোসী রইল, দাদাবাবু ! কথায় বলে রাত-উপোসী থাকলে হাতীও কাহিল হয়। ঘুমুক তা হলে। আলোটা কমিয়ে দিয়ে যাই।

[টেবিলের ওপরকার আলোটা কমিয়ে দিয়ে চলে গেল। আবার নেপথ্যে সেতার-বাদ্য শোনা যেতে লাগলো। খানিকবাদে গান্ধী ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে কথা বলতে লাগলো]

গান্ধী ।। কি বলছ, বাবা? আমি অন্যায় করেছি ? বৈষ্ণব-বংশের ছেলে হয়ে মাংস খেয়েছি? কিন্তু আমাকে যে শরীরে শক্তি করতে হবে। ভারতবাসীর গায়ে জোর না হলে ইংরেজ পালাবে কেন? হ্যাঁ—হ্যাঁ—দেশকে স্বাধীন করতে হবে। —ওকি মা, —তোমার চোখে জল কেন? তুমি কাঁদছ! বৈষ্ণবের বংশের ছেলে হয়েও আমি মাংস খেয়েছি বলে তোমার এত কষ্ট? কিন্তু ওরা যে সবাই বললে, মাংস খেলে গায়ে জোর হবে। শরীরে শক্তি না হলে আমরা পেরে উঠবো কেন? ওকি— ওকি— ছাগলটা কি আবার বেঁচে উঠেছে? ছাগলটা অমন করুণ স্বরে ডাকছে কেন ? আমরা সবাই মিলে ওকে কেটে খেয়েছি— ও বড্ড কষ্ট পেয়েছে? না— না, আর আমি হিংসা করবো না। জয় রাম— জয় রাম— না— না, আর আমি হিংসে করবো না—

[চিৎকার করে উঠল। গান্ধীর চিৎকার শুনে ভূষণ এসে ঘরে ঢুকল]

ভূষণ।। একি ছোট দাদাবাবু, তুমি ঘুমের মধ্যে চিৎকার করছ কেন? দাদাবাবু— দাদাবাবু—ছোটদাদাবাবু— কি হয়েছে— ?

[গান্ধী মশারীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। শরীর ঘামে একেবারে ভিজে গেছে]

গান্ধী ।। উঃ! কি ভয়ানক স্বপ্ন দেখছিলাম। একটা ছাগল শিং উঁচিয়ে আমাকে টুঁ মারতে আসছে। ভাগ্যিস ভূষণ, তুমি আমায় ডেকে তুললে! নইলে আমার পেট ছ্যাঁদা করে দিয়েছিল আর কি।

ভূষণ।। [হেসে] অ্যাঁ ! ছাগল তোমার পেট ফাঁসিয়ে দিচ্ছিল? এ ত' ভারী হাসির ব্যাপারই হল! হা— হা—হা— ছাগল শিং দিয়ে পেট ছ্যাঁদা করে দিচ্ছিল— হা— হা— হা—

গান্ধী ।। ভূষণ, তুমি হাসছ? আমার বুকটা এখনো টিপ টিপ করছে। উঃ বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছে।

ভূষণ ।। ওই ত' টেবিলের ওপর খাবার জল ঢাকা আছে। আমি দিচ্ছি—

[ভূষণ জল এনে দিল, গান্ধী ঢক্ ঢক্ করে এক গেলাস জল খেয়ে ফেললে]

গান্ধী।। আঃ ! জল খেয়ে প্রাণটা ফিরে পেলাম। তুমি আমায় বাঁচালে,

ভূষণ। কিন্তু আজ আমি একলা ঘরে কিছুতেই শুতে পারবো না। আবার যদি ছাগলটা আসে?

ভূষণ ।। হা—হা—হা। আবার ছাগল আসবে? সত্যি ছোটদাদাবাবু তুমি ভারী মজার মানুষ। আমি ত' আমার দেশের বাড়ীতে কত ছাগল পুষেছি। ওরা কেউ ত' পেট ফাঁসিয়ে দিতে আসে না!

গান্ধী ।। কিন্তু আমি যে— থাক্ বলব না বাবা!

ভূষণ ।। ও! ভয় করছে— এই কথা ত' ? আচ্ছা, আমি আঁচল পেতে এই ঘরের মেঝেতেই শুয়ে থাকি। তোমার বড্ড ভয় দাদাবাবু, ভূতের ভয় আর সাপের ভয় ত' আগেই ছিল, আজ থেকে আবার হল ছাগলের ভয় ! পুরুষ মানুষ, ব্যাটাছেলে— এত ভয় পেলে চলে' কেন হা— হা— হা!

[গান্ধী মশারীর ভেতব গিয়ে শুয়ে পড়ল। ভূষণ ঘরের মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। নেপথ্যে মিঠে সুরে সেতার বাজতে লাগলো। ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এলো। পর্দ্দা আবার তোলা হলে দেখা গেল—সেই একই ঘর। জানালার ভেতর দিয়ে সোনালী সূর্যের আলো এসে পড়লো। হঠাৎ ভূষণের ঘুম ভেঙে গেল, সে আড়মোড় ভেঙে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। তারপর ডাকল]

ভূষণ।। ছোটদাদাবাবু, ও দাদাবাবু, শিগগির ওঠো— অনেক বেলা হয়ে গেছে। সারারাত আমারও ঘুম হয়নি। দেশের ছাগলগুলোর কথা মনে পড়ল কিনা। আমার পোষা ছাগল। আমি ওদের কত ঘাস খাওয়াই, কাঁঠালপাতা খাওয়াই। আমায় বড্ড চেনে। সারারাত শুধু এপাশ ওপাশ করেছি। শেষ রাত্তিরের মুখে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি— বুঝতে পারিনি! তাই ত' ঘুম ভাঙতে এত বেলা হয়ে গেল।

[গান্ধীও মশারীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো]

গান্ধী।। তাই ত' রে ভূষণ ! একেবারে রোদ্দুর উঠে গেছে। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসি! কাল রাত্তিরে কিচ্ছু পড়াশোনা হয়নি।

[গান্ধী মুখ ধুতে চলে গেল আর ভূষণ ঘর ঝাঁট দিয়ে, মশারী উঠিয়ে, টেবিলের উপর থেকে আলোটা তুলে নিয়ে চলে গেল। খানিকবাদে একটি তোয়ালে কাঁধে গান্ধী এসে ঘরে ঢুকলো। তারপর হাত-মুখ ভালো করে মুছে বইপত্তর গুছিয়ে নিয়ে পড়তে বসলো। গান্ধী খানিকক্ষণ একমনে বেশ পড়ে চললো। আরো কিছুক্ষণ বাদে ভূষণ এক প্লেট খাবার ও জল নিয়ে ঘরে ঢুকলো]

ভূষণ ।। কাল রাত্তিরে ত' কিচ্ছু খাওনি, ছোটদাদাবাবু। এই নাও, মা পাঠিয়ে দিলেন। আগে খেয়ে নাও। তারপর যত খুশী পড়ো।

[খাবার ও জল টেবিলের উপর রেখে চলে গেল। গান্ধী খেতে শুরু করলো, এমন সময় জানলার সে বন্ধুটিকেই দেখা গেল]

বন্ধু ।। ওরে মোহন, তুই একা— একাই সব খেয়ে নিচ্ছিস? আমায় একটুও ভাগ দিবি নে?

গান্ধী।। [লজ্জা পেয়ে] আয়— আয়— ওদিক দিয়ে ঘরের ভেতরে চলে আয়। দু'জনে একসঙ্গে ভাগ করে খাই—

[বন্ধু এসে ঘরে ঢুকল। দু'জনে একসঙ্গে খেতে লাগলো]

গান্ধী ।। কাল রাত্তিরে ভাই বড্ড ভয় পেয়েছি। স্বপ্ন দেখলাম— একটা ছাগল আমার পেটে ঢুঁ মারতে ছুটে আসছে। আমি এমন চেঁচিয়ে উঠেছি যে, ভূষণ তাড়াতাড়ি ছুটে এলো। ভাগ্যিস মা-বাবা শুনতে পাননি।

বন্ধু ।। তুই বড্ড ভীতু মোহন। ভূতের ভয়, সাপের ভয়, ছাগলের ভয়! এত ভয় পেলে কখনো ইংরেজকে তাড়ানো যাবে? ওরা একেবারে বেপরোয়া জাত। কাউকে গ্রাহ্য করে না। দেখছিস না— কেমন পা ফাঁক করে সিগারেট টানে। আমাদেরও সিগারেট খেতে হবে। ওতে শরীর খুব গরম হয়— উত্তেজনা বাড়ে মনে হয় সবাইকে গায়ের জোরে হারিয়ে দিই—

গান্ধী ।। অ্যাঁ! বলিস কি? সিগারেট ? না বাপু, আমার বড্ড ভয় করে। বাবা দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। কাল মাংস খেয়েই যা ভয়ে ভয়ে ছিলুম।

বন্ধু ।। তুই বড্ড ভীতু মোহন। অত ভয় পেলে কখনো চলে? জীবনটাকে হাউয়ের মতো উড়িয়ে দিতে হবে। তবে ত' রোশনাই হবে।

গান্ধী ।। আমার কাকা কিন্তু বিড়ি টানেন। এই যে, একটুকরো বিড়ি পড়ে আছে।

[ঘরের এক কোণ থেকে তুলে আনলো। বন্ধুটি পকেট থেকে একটা দেশলাই বের করে বিড়িটা ধরিয়ে ফেললো]

বন্ধু ।। এইবার টেনে দেখ্— ভারী মজা পাবি—

[গান্ধী একটা টান দিয়ে খক্ খক্ করে কাশতে লাগলো]

প্রথমটা ওই রকম হয় রে। তারপর ভারী আরাম। এই দেখ আমি টানছি—

[টেনে ধোঁয়া ছাড়লো]

গান্ধী ।। ভারী চমৎকার ধোঁয়া বেরোয় ত'—

বন্ধু ।। চল্ আমার সঙ্গে,— আজই তোকে ভালো সিগারেট খাইয়ে

আনছি। কী চমৎকার গন্ধ, —দেখবি তখন !

গান্ধী ।। কিন্তু বাবা যদি বকেন— ?

বন্ধু ।। দুর বোক্‌চন্দর— জানতে পারলে ত'। এত ভয় পেলে দুনিয়ার কোন কাজ হয় না। চল— চল—। কিন্তু কিছু পয়সা চাই যে—

গান্ধী ।। পয়সা? আচ্ছা দাঁড়া। পাশের ঘরে ভূষণের পকেটে নিশ্চয় আছে।

[দুজনে বেরিয়ে গেল, মঞ্চ খালি থাকল। নেপথ্য থেকে একটা সুর ক্রমাগত বাজতে লাগলো]

[ভূষণের প্রবেশ]

ভূষণ।। তাইত'! ছোটদাদাবাবু আবার এর মধ্যে কোথায় পালিয়ে গেল? আজকাল যে কী হয়েছে দাদাবাবুর— কিচ্ছু বুঝতে পারিনে! কালকে অত রাত করে বাড়ী ফিরল! আমি একেবারে ভয়ে মরি! পাছে কর্ত্তা কিছু বলেন! পাখী যেমন ছানাকে সব সময় ডানা দিয়ে আড়াল করে রাখে, আমিও তেমনি ওকে লুকিয়ে রাখতে চাই। কিন্তু তা কি হবার যো আছে? ছানার যে এখন পাখা গজাচ্ছে! সকালবেলা পড়তে পড়তে দাদাবাবু কখন ত' উঠে যায় না! দু'দিন থেকে কেমন যেন উড়ু-উড়ু ভাব দেখছি। সত্যি, ভাবনার কথাই হল।

[মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল। একটু বাদেই গান্ধীর প্রবেশ। চোখ দু'টি লাল। মাথার চুল উস্কু-খস্কু। কেমন যেন একটা উড়নচণ্ডী ভাব]

গান্ধী।। [খুব উত্তেজিত ভাবে] না—না, এ আমি কোন্ পথে চলছি! বাবার কাছ থেকে জীবনে আমি কোনো কথা লুকোইনি। এখন আমার সব কাজ লুকিয়ে-চুরিয়ে চলছে। কাল পালিয়ে গিয়ে মাংস খেয়ে এলাম। বৈষ্ণব বংশের ছেলে, —মাংস খাওয়া কি আমার উচিত হয়েছে? আজ আবার সকালবেলা বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সিগারেট টেনে এলাম। আমার মন বলছে, বাবা-মাকে লুকিয়ে এই সব কাজ মোটেই ভালো নয়। আমি অন্যায় করেছি—। সত্যি, অপরাধ হয়েছে আমার। এ পাপের কি প্রায়শ্চিত? কে আমায় বলে দেবে?

[গান্ধী উন্মাদের মতো ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো]

গান্ধী।। বাবা যদি কোনোরকমে জানতে পারেন যে, আমি বৈষ্ণববংশের ছেলে হয়েও তাঁকে লুকিয়ে মাংস খেয়েছি, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে চাকরের পকেট থেকে পয়সা চুরি করে বিড়ি কিনে টেনেছি— তবে তিনি লজ্জায়—ঘৃণায় কারো কাছে আর মুখ দেখাবেন না!

তাঁর উঁচু মাথা আমি হেঁট করবো? ছেলে হয়ে আমি তাঁর দুঃখের কারণ হবো? না—না, আমার বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই!

[আবার পায়চারি করতে লাগলো। নেপথ্যে মনের অস্থিরতাসূচক দ্রুত সেতারের ঝালা বাজতে লাগলো]

না—না, আর আমি বেঁচে থাকতে চাইনে। বাবার মুখের দিকে আমি চাইব কি করে? আমি আত্মহত্যা করবো। আমার মৃত্যুতে সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। [আবার দ্রুত পায়চারি]

কিন্তু আত্মহত্যা করতে গেলে ত' বিষের দরকার। আমাকে বিষ দেবে কে? শুনেছি ধুত্‌রো ফুলের বীজে বিষ আছে। সেইগুলো খেলেই ঠিক মৃত্যু হবে। ধুতরোর বীজ—কোথায় মিলবে সে বীজ?

[ভূষণের প্রবেশ]

ভূষণ।। এই যে ছোটদাদাবাবু, তুমি আবার কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিলে? কর্ত্তা তোমার খোঁজ করছিলেন—

গান্ধী।। অ্যাঁ! বাবা আমার খোঁজ করছিলেন? কি ব্যাপার বল ত' ভূষণ?

ভূষণ।। তুমি কখন বাসায় থাকো,—কখন হুট্ করে পালিয়ে যাও—কিছুই জানতে পারছেন না তিনি। পড়াশোনাতেও নাকি তোমার কোনো মন নেই! এই সব কথাই জিজ্ঞেস করছিলেন আমাকে!

গান্ধী।। তাই নাকি রে? তবে কি বাবা সব জানতে পেরেছেন?

ভূষণ।। কি জানতে পেরেছেন?

গান্ধী।। [আম্‌তা আম্‌তা করে] এই মানে—আমরা লুকিয়ে নাটক করছি কিনা—। আচ্ছা ভূষণ, ধুতরো ফুল কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারিস্?

ভূষণ।। ধুতরো ফুল দিয়ে আবার কি হবে?

গান্ধী।। এই কথাটা বুঝতে পারলি নে? ধুতরো ফুলের মালা মহাদেবের গলায় পরিয়ে দিতে হবে কিনা!

ভূষণ।। ও! মহাদেব সাজছ তুমি? তোমাদের ওই খেলার মাঠের পাশের জঙ্গলে প্রচুর ধুতরো ফুলের গাছ আছে। আচ্ছা, আমি এক সময় গিয়ে এনে দেবো'খন—

গান্ধী।। না—না, তোকে জোগাড় করতে হবে না। আমরাই খুঁজে-পেতে নেবো। সেজন্যে কোনো ভাবনা নেই।

ভূষণ।। তবে তাই নাও গে। এবেলা আমার মরবার সময় নেই। আমার

কত কাজ পড়ে আছে। চললাম আমি—

গান্ধী। ঠিক হয়েছে! ওই খেলার মাঠের পাশের জঙ্গল থেকে ধুতরোর বীজ জোগাড় করে নিতে হবে। আর একটা কথা। আত্মহত্যা করবার আগে কেদারজীর মন্দিরে গিয়ে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবো আর প্রার্থনা করবো। আমার মরণে মা-বাবার মনে যেন কোনো কষ্ট না হয়! ঠিক! আর দেরী নয়। এইবার তাড়াতাড়ি যাই—

[কাবা গান্ধীর প্রবেশ]

কাবা গান্ধী।। তাই ত' ছেলেটা আবার কোথায় পালিয়ে গেল? ভূষণের মুখে শুন্‌লাম ও ঘরেই আছে। তাই ত' ভাবলাম, নিরিবিলি ওকে দুটো কথা জিজ্ঞেস করবো। কেন ও এমন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে! মোহনের মুখের দিকে চাইলে আমার এমন মায়া হয় যে, ওকে কখনো শক্ত কথা বলতে পারিনে। না হয় ওর মাকে গিয়েই জিজ্ঞেস্ করি—ছেলেটার কি হল! ভাবনার কথা বলতে হবে।

[চিন্তিতভাবে প্রস্থান]

[খানিকবাদে এক থালা কাটা ফল নিয়ে ভূষণের প্রবেশ]

ভূষণ একি! ছোটদাদাবাবু আবার কোথায় পালালো? রাত্তিরে খায়নি। মা আমাকে দিয়ে ফল পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বাবু ত' একেবারে হাওয়া। নাঃ, একেবারে ভূতুড়ে বাড়ীর মতো কাণ্ড-কারখানা সুরু হয়েছে দেখছি। [ফলের থালা নিয়ে চলে গেল]

[একটু বাদে হন্তদন্ত হয়ে গান্ধী এসে ঘরে ঢুকল]

গান্ধী।। নাঃ, মরতে আমার বড় ভয় করলো। একটি ধুতরো বীচি মুখে দিয়েছি—অমনি বুকের ভেতর থেকে কে যেন ধমক দিয়ে উঠ্‌ল। বললে, এই কাপুরুষ! অন্যায় করেছিস্— বাবার কাছ থেকে শাস্তি চেয়ে নে। আত্মহত্যা করা মহাপাপ! অন্যায়ের জন্যে তোকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই ত' ধুতরোর বীচি মুখ থেকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে এলাম।

[পায়চারি করতে লাগলো]

ঠিক! কাপুরুষের মতো পালিয়ে বেড়াবো না। বাবাকে সব কথা খুলে বলবো। মাংস খাওয়ার কথা, ভূষণের পকেট থেকে পয়সা চুরির কথা, বিড়ি খাওয়ার কথা। তাঁর কাছে কিছুই আমি গোপন

করবো না। তারপর যে শাস্তি তিনি দেন— মাথা পেতে নেবো।

[আবার অস্থিরভাবে পায়চারি]

কিন্তু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কোন কথাই ত' বলতে পারবো না? তাহলে উপায়?

[আবার পায়চারি]

ঠিক হয়েছে। ঠিক হয়েছে। চিঠি লিখে সব কথা বাবাকে জানাব। কোনো কথাই গোপন করবো না।

[চেয়ার-টেবিলে বসে দ্রুত চিঠি লিখতে লাগলো। নেপথ্যে দ্রুত বাদ্যধ্বনি]

গান্ধী।। সব কথা গুছিয়ে লিখেছি। আমার সব অন্যায়, আর সব পাপের জন্যে শাস্তি দিতেও বলেছি। একি, বাবা যে ভূষণের কাঁদে ভর দিয়ে এই ঘরের দিকেই আসছেন। তা হলে কি বাবার অসুখটা হঠাৎ বেড়ে গেল?

[ঘরের এক কোণে পাথরের মুর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। ভূষণের কাঁধে ভর দিয়ে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে কাবা গান্ধীর প্রবেশ]

কাবা গান্ধী।। আমাকে মোহনের বিছানাতেই শুইয়ে দে ভূষণ। হঠাৎ শরীরটা খারাপ লাগছে। একটু শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে।

[ভূষণ অতি যত্নের সঙ্গে কাবা গান্ধীকে মোহনের বিছানায় শুইয়ে দিল]

ভূষণ।। আমি মা-ঠাকুরুণকে খবর দিচ্ছি—

কাবা গান্ধী।। না—না, তার কোনো দরকার নেই। তুই আমাকে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে দে ত'!

ভূষণ।। আন্‌ছি হুজুর।

[গান্ধী এইবার এক-পা, দু-পা করে অতি ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিঠিখানি এনে তার বাবার হাতে দিল। পিতা একবার পুত্রের দিকে তাকালেন। তারপর চিঠিখানি পড়তে লাগলেন। গান্ধী পিতার পায়ের কাছে মাটিতে বসে পড়লো। চিঠি পড়তে পড়তে কাবা গান্ধী উত্তেজনায় একবার বিছানায় উঠে বস্‌লেন। তারপর চিঠি পড়া শেষ হয়ে গেলে আবার শুয়ে পড়লেন। তাঁর মুখে কোনো কথা নেই। গান্ধী অবাক হয়ে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেখা গেল, পিতার দু'চোখ বেয়ে মুক্তোবিন্দুর মতো অশ্রু ঝরে পড়ছে। সেই চোখের জলে ছেলের চিঠি ভিজে গেল। পিতা একটি কথাও বললেন না। এইবার গান্ধী পিতার পায়ে মাথা রেখে গুম্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল]

গান্ধী।। বাবা, আমি অপরাধ করেছি। আমায় শাস্তি দিন, —শাস্তি দিন—

[কাবা গান্ধী চিঠিখানি ছিঁড়ে ফেললেন, তারপর ছেলের মাথার হাত রাখলেন। নেপথ্যে মৃদু বাদ্যধ্বনি শোনা যেতে লাগলো]

য—ব—নি—কা